

[illegible]

নদের নিমাই ।



আলোচনা সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।



প্রথম সংস্করণ ।

প্রকাশক কলিকতা সরকারি সংরক্ষিত ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র ।

প্রকাশক—

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।

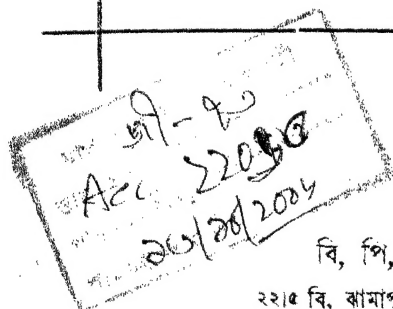
১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

গ্রন্থকার প্রণীত

ভক্তপ্রাণের অনিয়মিত উচ্ছ্বাস

“প্রাণের ডাক”

(যন্ত্রস্থ)



বি, পি, এমস্ প্রেস।

২২৫ বি, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীআশুতোষ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র ।

নে পবিত্র প্রাতঃস্মরণীয়

বর্দ্ধমান রাজবংশের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিদিত,
যে রাজবংশ ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য নিষ্কর-ভূসম্পত্তি দান করিয়া
ধন্য ও বরেন্দ্র হইয়া রহিয়াছেন ;—

মহামহিমার্ণব, মাননীয় মহারাজাধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ মহাশয় বাহাদুর

সেই পবিত্রতম রাজবংশ সমলঙ্কৃত করিয়া
আজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং যাঁহার গুণ-গরিমায়
বিমুক্ত হইয়া

প্রবল প্রতাপাধিত ভারত সম্রাট কে, সি, এস, আই, সি, আই, ই,
প্রভৃতি অশেষ সম্মানসূচক উপাধী-ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন,—
যিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও বাণী-সেবায় প্রাণপাত করিয়াছেন,
সেদিন বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে যিনি অসীম ত্যাগ স্বীকার
করিয়া মহাপ্রাণতায় পরিচয় দিয়াছেন,—

আমার

“নদের নিমাই”

তঁাহারই পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া

লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম ।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী ।

১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ।

শুভ ১লা আশ্বিন রাধাষ্টমী,

সন ১৩৩০ সাল ।

বিনীত—

শ্রী গ্রন্থকার ।

উপহার

আমার পরম.....

শ্রী.....

.....

করকমলে

নদের নিমাই

অর্পণ করিলাম।

.....
.....
তাং.....

শ্রী.....

নিবেদন ।

যিনি বাকালার নিজস্ব অবতার, ঐহার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ দেশ
ধন্য এবং নবদ্বীপ তীর্থে পবিগণিত হইয়াছে, আজ আমার সেই বড়
সাধেব—বড় আদরের গ্রন্থ “নদেব নিমাই” শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের
জীবনী উপন্যাসাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইল। শ্রীগোরাঙ্গের
অনেক প্রকার জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের
“নদের নিমাই” গ্রন্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহাতে আড়ম্বর
কিছুই নাই। কেবল ভগবান শ্রীচৈতন্যেব ভক্তিগাথা, অবতার-তত্ত্ব—
যাহা শুনিতে ভক্তগণ সতত ইচ্ছুক, কেবল সেই সকল বিষয়
প্রেম-ভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ভক্তগণেব মনোরম কবিতা ইহাতে লিপিবদ্ধ
কবিয়াছি।

ইহা সকল সম্প্রদায়েরই আদরের বস্তু করিতে কিছুমাত্র পরিশ্রমের
জটী করি নাই। এক্ষণে আমার অন্যান্য গুরুত্ব—তুলসীদাস,
রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধক-জীবনীর মত ইহার আদর হইলে
শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার “বর্ণাশ্রম”, “সাধন মন্দির” প্রভৃতি প্রায় ৩০।৪০ খানি,
ধর্মমূলক উপন্যাসও সাধারণের নিকট অতি প্রিয় হইয়া আসিয়াছে।

‘মধ্যেই চারি পাঁচ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার এই
 “নদের নিমাই” ভক্তগণের প্রাণে তিলমাত্র ভক্তিভাবের উদ্রেক
 করিয়া সমাদৃত হইতে পারিলে, লেখনী ধারণ সার্থক মনে করিব।
 নিবেদন ইতি—

ভূর্গাদাস লাইব্রেরী।
 ১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড,
 হাওড়া।

বিনীত—
 } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

४ मरकौठनामन्त्र ।



নদের নিমাই ।



সূচনা ।

ভাণ বিনা ভাবনা হয় না । ভগবানকে ভাবিতে হইলে, ধ্যান-ধারণা উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে, ভাবের ভগবানে বিভোব হইয়া ডাকিতে না পারিলে, তাহাতে কোন ফল হয় না । ভাবের ঠান্বকে সদয় করিয়া তাঁহা অচিরে সর্বোজের অমৃত ভক্তের পক্ষে দুঃস্থ হইয়া পড়ে, এই জন্য ভগবানের ভাবনায় তৎপ্রধান । পরা-ভক্তিতেই ইহার জন্ম হইয়া থাকে ।

ভক্তিশাস্ত্র এইজন্য শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুব এই পন্থা ভাবেব একভাবে মজিয়া ভক্তকে ভগবানের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন । একদিন শ্রীকৃষ্ণদামোদর ব্রজগোপ গোপীগণ এই পন্থা ভাবেব ভাব-সাগরে ডুবিয়াই পূর্ণব্রজ ভগবানকে, কেহ পুত্র ভাবে, কেহ বন্ধু ভাবে, কেহ বা স্বামী ভাবে, আবার কেহ বা দাসভাব হইয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করতঃ জগতে ধন্য ও বরেন্দ্র হইয়া গিয়াছেন । তাই শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাত্ত্বিকৈঃ ভজাম্যহং ।”

নদের নিমাই ।

ভগবানের লীলারসমাধুর্য্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেরূপ প্রকট হইয়াছিল, জগতে আর কোথাও তেমন হয় নাই । লীলারস-রসিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে যেরূপ ভাব-প্রমত্ত হৃদয়ে আপনার লীলাখেলা প্রচার করিয়া ব্রজবাসিকে তথা জগৎকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ঐ সকল ভক্ত যমন করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাদের ভক্তিডোরে যাবদ্ধ হইয়া যেরূপ বাঁধা পড়িয়াছিলেন, জগতের কোথাও কোন ভক্ত যার তেমন করিয়া ভগবানকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই । জগতের তিহাস আর কোনও দেশ বা জাতিকে তাহার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে পারিবে না ।

বৃন্দাবন ধামে ভগবানের এই প্রেম-লীলার মাধুর্য্য প্রকট করিবার হইয়াছিলেন—একমাত্র শ্রীরাধিকা । তাঁহার তুল্য ভাবময়ী চুড়ামণি বৃন্দাবনে আর কেহ ছিল না, কেবল একমাত্র তাঁহারই ঋ-সাধন, আপনা তুলিয়া কেবল তাঁহারই ভজন-সাধন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ মহাপ্রাণ বুঝিয়া মধুর ভাবে প্রেম-সাগরে তাঁহারই আত্ম-সর্জন কেবল শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে এত মধুময়, এত ভাবময়, এত প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল । নন্দ-যশোদা ও অন্যান্য ব্রজগোপী এবং রাখাল বালকগণের ভাব-সাধনা শ্রীমতীর আত্মভোলা ভাবের নিকট অতি তুচ্ছ ।

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তিনি জগতে আর কিছুই দেখিতেন না । শাণ্ডী-নন্দী, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধ একমাত্র সেই জগৎস্বামীতেই আরোপ করিয়া কৃষ্ণময় পুরুষ কেবল জগতে তিনি আর নিজেমাত্র রমণী ভাবিয়া । শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সাগরে অন্তিম হারাইয়াছিলেন । কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণই জীবন, শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্পর্শী বাণীর স্বর শুনিলে শ্রীমতী

নন্দের নিশীই ।

আব স্থির থাকিতে পাবিতেন না, উধাও হইয়া বাটার বাঁকিয়া করিয়া
পড়িতেন । শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশীও আর কোন বুল বলিতে জানিত
না, সেও কেবল রাধাসুত্রে বাঁধা থাকিয়া, যখন তখনই রাধা রাধা বলিয়া
বাজিয়া উঠিত । শ্রীবাধাও সকল বাধা-বিপত্তি, লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি
দিয়া ভগবানেব শরণাপন্ন হইতেন ।

শ্রীবাধা মহাশক্তি, শ্রীভগবানের স্ফাদনী শক্তি । অগ্নি আর তাহার
দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, তেমনি শ্রীরাধা ও শ্রীভগবানে অভেদ
আত্মা, কেবল লীলা বিস্তারের জন্য স্বভবরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন ।
তিনি শক্তি না দিলে তাঁহাকে বৃষ্টিতে বা জানিতে পারে কে ? এইজন্য
বাধা-শক্তিব দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন লীলা এত মধুময় হইয়াছিল । ভগবানের
ভাব সাগরে ডুবিয়া আপনানাহা হইয়া কেমন করিয়া সাধনা করি
হয়, শ্রীমতী তাহাই দেখাইয়াছিলেন । যাহারা বুঝেনা, সাধন-ভজ্ঞ
ক্রম-বিকাশ যাহাদের হৃদয়ে হয় নাই, তাহারাই কেবল এই অমৃত-ম
লীলাকে স্ত্রীপুরুষ প্রসঙ্গ বলিয়া নিন্দা করে ।

ভক্ত ভিন্ন ভগবানকে বাধিতে পারে না । ভক্তের ভক্তিতে রে
বাধা হইয়া তিনি নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছিলেন, আর শ্রীমতীর
প্রেম ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দাসত্ব লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—
“বৃন্দাবনং পরিত্যাগ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি” । বাস্তবিক ভক্তের হৃদয়
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বাইবার ক্ষমতাই কি, আর স্থানই বা
কোথা

২৫

‘‘ন এঁই শ্রীকৃষ্ণ লীলার
‘দখিতে ন’

ভক্ত বধন প্রাণের
ন প্রাণ ছুই কই করে,

নদের নিমাই ।

ভগ্ন শূন্যময় দেখে । একদিন শ্রীমতী তাঁহার প্রাণ পুতলীকে হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বাহিরে দেখিবার জন্য পুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে গোষ্ঠের পথে আসিলেন । প্রাণ যায় যায়, মন হু হু করিতেছে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। বিবশা শ্রীমতী বিভোর চিত্তে আনমনে পথপাশে দাড়াইলেন ।

ভক্তাধীন ভগবান পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীমতীর আবেগ-ভরা ভাব দেখিবার জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সোণার কমলকে নিভৃত গোষ্ঠের পথে তেমনি করিয়া ছুটিতে দেখিয়া প্রেমাকুলিত কর্তে আবেগ ভরে বলিলেন—কিশোরি! প্রেমময়ী! তোমার মত ভক্তকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি নিজেই পরীক্ষিত

হই । এখন বুঝিলাম—তোমার তুল্য ভক্ত এ ব্রজধামে আমার । কেহই নাই । তুমি মধুর ভাবে বিভোর হইয়া, নিজের নিষ্ঠুর লিঙ্গা আমাকে যেক্রপ ভাবে বাঁধিয়াছ, আমায় হইয়া আমাকে পভাবে আবদ্ধ করিয়াছ, এযুগে সে প্রেমের প্রতিদান করিবার কিছু

না । ভক্তের ঋণ অপরিশোধ্য হইলেও দারুণ কলিযুগে যখন জীব পাপে মগ্ন হইবে, ধর্মের প্রানী করিবে, তখন তোমারই নাম ইষ্টমন্ত্র করিয়া তোমারই স্বরূপে নব ব্রজধাম নদীয়ায় গৌরান্বিতাবে অবতার গ্রহণ করিয়া তোমারই মাহাত্ম্য কীর্তন করিব । একাধারে রাধাশ্রাম মূর্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজে ছয়ায় ছয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইব । হৃদয় তে নামন করিয়া বাহিরে তোমার ঐ মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে দেখি—
আরাধ্য হরি নাম বিহীন জীবের উদ্ধার সাধন করিলাম ।

নদের নি

দ্বাপরযুগে শ্রীমতীর নিকট এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত
তিনি যাঁহা বলিয়াছেন :—

পরিভ্রাণায় সাধুগাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যখন ভারতে হিন্দু
লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন মুসলমানগণের অত্যাচারে
বৈষ্ণবধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, খোল করতালের আওয়াছ
শুনিলেই যখন কাজীর কোটালগণ আসিয়া দারুণ অত্যাচার করিত, ভক্ত
বৈষ্ণবগণকে ধস্তবিধস্ত করিয়া তাহাদের নাম-সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করিয়া
দিত, অশেষ প্রকারে ধর্মের গ্লানি করিত; সেই সময় শ্রীভগবান মহাপ্রভু
নদীয়ায় গৌরাঙ্গরূপে অবতার গ্রহণ করতঃ মহাশক্তি শ্রীরাধার শক্তিতে
পূর্ণ শক্তিমান হইয়া কিরূপে ধার্মিকগণকে অভয় দান করিয়াছিলেন,
প্রেমময় হরি নামের প্রবল বন্যায় কিরূপে দিকদেশ প্রাবিত করিয়া
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আজ আমরা শ্রীভগবানের সেই অমিয় লীলামৃত
বিবৃত করিতে অগ্রসর হইতেছি ।

ত্রিলোকারাধ্য ভগবানের মহিমা কীৰ্ত্তন করি এমন ক্ষমতা ত
নাই । অতি দীন, ভক্তিধনে নিতান্ত হীন হইলেও আমার ভরসা আ
অকৃতি অধম, পতিত জনের প্রতি পতিত-পাবন ভগবানের রূপাঃ
নাই । তাঁহার রূপা-সিকুর বিন্দুমাত্র লাভ করিয়া যখন দুরাচারী ও
মাধাই সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া কত অসাধ্য সাধ-
গিয়াছে ; কত মহাপাপী তাঁহার কলিকলুষ-নাশন
যখন জগতীতলে ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইয়া

র নিমাই ।

বল তাঁহার । সেই মুক্তি-মুলাধার, ভক্তবাহ্নীকল্পতরুর পাদপদ্ম
। তাঁহারই চরিত-কথামৃত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছি ।
। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তথাপি যাহাব
গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, যাহার রূপায় মুখ বাচাল হয়,
এই রূপায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য লীলা “নদের নিমাই” চরিত্র
। চনা করিয়া ধন্য হইবার বাসনা করিয়াছি । শক্তি আমার নহে, সেই
মহাশক্তিরই শক্তি, আমি উপলক্ষ্য মাত্র । “অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু” ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মিশ্রের বিবাহ ।

নবদ্বীপ যখন ভারতের বিদ্যাপীঠ, যখন দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এই বিদ্যাপীঠের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান-গৌরব-সৌরভ মণ্ডিত হইয়া যখন ‘নবদ্বীপ’ ভারতের শিরোভূষণরূপে সমন্বিত, তখন শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা গ্রাম হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠার্থী হইয়া এখানে রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের টোপে শ্রায়শাস্ত্র পড়িতে আসিলেন ।

নবদ্বীপ তখন বিদ্বজ্জন সমাজের শিরোমণি ছিল । যিনি যেখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসুন না কেন, নবদ্বীপে আসিয়া পরীক্ষা না দিলে, তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন না, তাঁহার পাঠ পরিসমাপ্তিও হইত না । এসময় নবদ্বীপের যেরূপ অবস্থা ; যেরূপ উন্নতি, যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি ; সেরূপ অবস্থা, সেরূপ উন্নতি কোন দেশের কোন কাল বলিয়া শুনা যায় না । বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ উঠিয়াছিল ; বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ করা লাভের আর অন্য উপায় নাই । ইহাই তাঁহাদের তাই তাঁহারা উন্নত হইয়া মানবজীবনের প্রশংসা প্রাপ্যতা করিয়াছিলেন ।

২ নিম্নাই ।

বল বদ্বীপের চারিদিকে টোল, প্রত্যেক স্থানমধ্যাত অধ্যাপকেরই
এক চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতে দেশী ও বিদেশী ছাত্রগণ অধ্যয়ন
করিত। কত দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া এখানে বাসা
করিয়া থাকিত, অনেকানেক বৃদ্ধও আসিয়া এখানের পবিত্র মাটিতে
বাস করিয়া পূজনীয় অধ্যাপকগণের নিকট শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া ধন্য
হইত। সে সময় নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধবনিতা, শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর
কিছুই জানিত না, জীবনে যে আর কোন মুখ্য কার্য আছে, তাহাও
তাহারা বুঝিত না।

বিদ্যাশিক্ষা না করিলে জীবন ব্যর্থ। হাজার রূপবান, গুণবান ও
অর্থবান হইলেও বিদ্যাহীনের কোন প্রকার আদর ছিল না। বিদ্যাবান
হইলেই সে সকল গুণের আধার, তাই সকলেরই ইচ্ছা। তখন পুত্র পণ্ডিত
হয়, বিদ্যাহীন হইয়া অগ্ররূপ উন্নতি তখন কাহারও পছন্দ হইত না।
একজন দীন দরিদ্র পণ্ডিতকে ধনীগণ কণ্ঠাদান করিয়া কৃতার্থতা বোধ
করিত কিন্তু বিদ্যাহীনে কণ্ঠাদান করিতে কেহ রাজী হইত না, বিভ্র-
ভিন্নরশালী হইলেও সে জামাতা করিবার উপযুক্ত বলিয়া কাহারও বোধ
হইত না।

দ্বীপে লোক সংখ্যা অত্যধিক। পূর্বে বলিয়াছি দেশবাসী
বিদেশী ছাত্র আজ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে।
তখন ছাত্রগণ গঙ্গার ঘাটে আসিত, তখন অপর
এ হইত না। স্নানের পর ভিন্ন ভিন্ন টোল
খিলে বাস্তবিক মনে হইত, ভারত ভিন্ন বিদ্যাচর্চার
এই বিদ্যাযুদ্ধে এত বাক্যার্থ্য হইত

নদের নিমাই ।

যে সময়ে সময়ে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া যাঁইত। ত্রায়শাস্ত্র
শাস্ত্র, ইহার তর্কযুক্ত বড় ভয়ানক ; ইহার জটিল বিষয়ের
সহজে মীমাংসিত হইবাব নয়, কাজেই মনোমালিন্ত পদে পদে।
ত্রায়শাস্ত্র চর্চার জন্তই নবদ্বীপ তখন বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

অত্রায় শাস্ত্রও যে এখানে পড়া হইত না—এমন নহে। যখন
নানা শাস্ত্রীয় পণ্ডিত টোল করিয়া বসিয়াছেন, তখন অপরাপর শাস্ত্রও
সম্যাক্রূপ অবীত হইত। তবে ত্রায়শাস্ত্রের মর্যাদাই বেশী ছিল,
কাবণ তখন মিথিলা ভিন্ন অপরস্থানে ত্রায়শাস্ত্রের চর্চা হইত না।
পুঁথিও ছিল না। মিথিলাব পণ্ডিতগণ এদেশীয় ছাত্রকে পড়াইতেন
বটে, কিন্তু পুঁথি দিতেন না। রামভদ্রের চতুপাঠীতে সামান্যরূপ ত্রায়ের
অধ্যাপনা হইত বটে কিন্তু গ্রন্থাভাবে সময়ে সময়ে বহু বিষয় সমুপস্থিত
হইত। এই টোলে তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, বাসুদেব সার্কভোম,
জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি অনেক সুবিখ্যাত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তখন
মিথিলা ভিন্ন বিশিষ্টভাবে ত্রায় চর্চা আর কোথাও হইত না। এই অভাব
দূরীকরণার্থ বাসুদেব মিথিলায় গমন করিলেন। এবং ত্রায়শাস্ত্র কঠিন
করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে টোল খুলিলেন। বহু ছাত্র জুটিল বটে কিন্তু
বাসুদেব বেশীদিন নবদ্বীপে অবস্থান করিতে পান নাই। উড়িষ্যার স্বাধীন
বাজা শ্রীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি তাঁহাকে সমাদরে লইয়া নিজ দেশে টোল
স্থাপন করাইয়া বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বাসুদেব সার্কভোম পুরীধামে চতুপাঠী স্থাপন করিলেও নবদ্বীপের
প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হইল না, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, ভবানন্দ —
জগন্নাথ প্রভৃতি ছাত্রগণ স্থানমাহাত্ম্য সম্যাক্রূপে ব

২০ নিম্নারিহ :

বঙ্গভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তখন রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ, শিবশ্যারদ, নীলাশ্বর চক্রবর্তী ইহঁরাও পণ্ডিত বড় কম ছিলেন না।
করিয়া পর ভবানন্দ ও রঘুনাথের মত ন্যায়ের অধ্যাপক জগতে আর কেহ
ইহঁতে পারে নাই। স্বতির অধ্যাপক রঘুনন্দনের তুল্য স্মার্ত আর
কয় জন ছিল? ইনি স্বতিশাস্ত্রকে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভাগ
করিয়াছিলেন। ইহঁরাই ব্যবস্থা এখনও বাঙ্গালা দেশে একাধিপত্য
বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

নীলাশ্বর চক্রবর্তী বৈদিক ব্রাহ্মণ। টোলের দ্বারাই তাঁহার জীবিকা
নির্বাহ হইত, তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। কন্যা দুইটি বড় হওয়ায়
নীলাশ্বর বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ তাঁহাদের স্বঘর ও স্পাত্র
পাওয়া বড় কঠিন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহারই সমব্যবসায়ী রামভদ্রের টোলে
পড়িত, ছাত্রটি খুব মেধাবী, সামান্যদিন পড়িয়া সকল শাস্ত্রে অতিশয়
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পাণ্ডিত্যের জন্য পুরন্দর উপাধিও
লাভ করিয়াছে। যুবক বিদ্যাবুদ্ধিতে যেমনি গুণবান, রূপেও
তেমনি অতুলনীয় ছিল। নবদ্বীপে তাহার মত স্পৃহা আর কেহ
ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এবং তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে
জাত্যাংশে ভরদ্বাজ বংশীয় মহা কুলীন ছিলেন।

নীলাশ্বর এই পাত্রকেই নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীকে সম্প্রদান
করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট এই
স্বাভাব উত্থাপন করিলেন। তিনিও জগন্নাথকে ইহার জন্য অনুমোদন
রাজী হইলেন। কারণ নবদ্বীপে থাকিতে হইলে একটা
ব এখানকার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। সমাজে

নদের নিমাই ।

যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, কাজেই জগন্নাথ তাহাতে সন্মতি দান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ।

শুভদিনে শুভক্ষণে নীলাধরের জ্যোষ্ঠাকন্যা শচীদেবীর সহিত জগন্নাথ মিশ্রেঃ শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল । জগন্নাথ অপরাধা ভাৰ্য্যা পাইয়া মায়াপুৰ নানক ভিন্ন পত্নীতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন । তখন বহু শ্রীহট্টীয় নদীয়ার মায়াপুৰে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল । পত্নীসহ তাহাদের নিকট বাসস্থান নির্মাণ করিয়া জগন্নাথ সুখে সংসাব যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন নামক আর একটা সুপাত্রে তাঁহাব কনিষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন ।

এখনকার মত তখন খাওয়া পরার জগ্ন কাহাকেও ভাবিতে হইত না । সংসার কেমন করিয়া চলিবে—সে চিন্তা কাহারও ছিল না ; কারণ তখন মানুষ এত বাবু হয় নাই, বিলাসিতা দেশবাসীকে এত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরে নাই । তখন মোটাভাত, মোটা কাপড়ের লোক সন্তুষ্ট থাকিত, অভাব বলিয়া কিছু জানিতে পারিত না, তাই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি মন না দিয়া, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিত । বিদ্যা অধ্যয়নে অবিদ্যা নাশ করিয়া ভগবচ্ছিন্তায় কালাতিপাত করা তখন প্রায় অধিকাংশ মানবেরই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ।

জগন্নাথ মিশ্র ছন্দামুৰ্ত্তিনী পত্নী লাভ করিয়া মনের আনন্দে জ্ঞানামুৰ্ত্তিলনে এবং ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম্ম মনোনিবেশ করিয়া কাল্য়াপন করিতে লাগিলেন । দেশে পিতা মাতা সকলেই ছিলেন কিন্তু তিনি

নদের নিমাই।

করিয়া পুস্তকটি কপের আধার হইয়াছিল, এক্ষণে জন্মপত্রিকার গণনা য় নামও ঠিক হইল—বিশ্বরূপ। শিশু ক্রমণঃ বালক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, নানাবিধ সদৃশ্যে ভূষিত হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। অল্প বয়সেই বালক ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। তারপর ক্রমণঃ নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ তাহার উপনয়ন প্রদান করিলেন।

এই সময়ে নবদ্বাপে বৈষ্ণব সমাজকে হীনবল করিয়া তান্ত্রিকগণের প্রবল প্রতাপ স্থচিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে, বড় বড় পণ্ডিতের , প্রাদুর্ভাব হইয়া বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিকে টলাইয়া দিয়াছিল। তখন জ্ঞান ও কর্মকে অবহেলা করিয়া “সহজ ভজন” ও নারীসঙ্গ দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের ন সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এদিকে তান্ত্রিকগণের মধ্যেও পণ্ডিতের ক্ষমতা ছিল না; তাহারা এই সময় মাথা নাড়া দিয়া উঠিলেন। যাগ যজ্ঞ, মন্ত্র, মূর্তি প্রভৃতি দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী বাড়ী হুর্গোৎসব হইতে লাগিল। ভদ্রলোক মাত্রেই শক্তি-উপাসনায় মত্ত হইলেন। এই শক্তি-উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের পরাধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করা। অগ্ন্যন্ত উপাসক বাহারা ছিলেন, সংখ্যায় তাঁহারা অল্প, কাজে কাজেই তাঁহাদের প্রভুত্ব সমাজে খাটিল না।

ব্রাহ্মণগণই সমাজের কর্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহা পণ্ডিত, বাহারা গ্রামশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা তাহার কূটতর্কে, বিচার-বুদ্ধির বাক্যবিজ্ঞাসে সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিতে লাগিলেন। বেশী পণ্ডিত হইলে যুক্তিতর্কে প্রায়ই নাস্তিক হইয়া পড়িতে হয়। ধর্মকর্মে

নদের নিমাই ।

জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্র এবং জননী শোভাদেবী পরম রূপবান, শানন্দবর্দ্ধন পৌত্রকে পাইয়া পুলকিতচিত্তে মন্তুকাব্রাণ ও মুখচূষন কবিলেন, কোলে পীঠে করিয়া কত আদর করিলেন, বুকের ধন বুকে করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন । লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধুমাতাকে প্রাণেশ্বর শ্রীশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—“মা ! জন্মায়তী হইয়া ধর্মের সংসার হাপন কব ; স্বামীপুত্র লইয়া স্বর্গের সুখ মর্ত্তে অমুভব কর ।” তার-পব পুত্রকে ডাকিয়া বিচারশিক্ষায় তাঁহাব কৃতকার্য্যতাব সংবাদ লইলেন । পুত্র ভূষণ জন্মভূমিব পবিত্র ক্ষেত্রে, আবাহ্য জনক জননীর পদতলে শিক্ষার সাফল্য জ্ঞাপন করিয়া পদধূলি লইলেন ।

কয়েক দিন খুব আনন্দ-কোলাহলে কাটিল । উপেন্দ্রের পৌত্র ও পুত্রবধুকে দেখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই সুখী হইল, আশীর্বাদ করিয়া বলিল—“জগন্নাথ যেমনি, বধুটীও ঠিক তাহার অমুরূপা হইয়াছে, এতদিন পবে ভগবান স্বর্গের চাঁদ ধবিয়া তাদের কোল ঘোড়া করিয়া দিয়াছেন, আহা ! বিশ্বরূপ আমাদের বঁচে থাক, আমাদের চুলের মত পবমায় লাভ করুক !”

কি জগন্নাথ বহুদিনের পব দেশে যাইয়া বন্ধুবান্ধবের আনন্দ বর্ধিত করিতে লাগিলেন । শ্রীহট্টবাসী সকলেই জগন্নাথের পাণ্ডিত্য, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, তাঁহার জ্ঞান-গরিম। হৃদয়সী প্রাণসী না করিয়া থাকিতে পারিল না । সকলেই তাঁহার ধর্মকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তত্ত্বের প্রাধান্যই স্বীকার কর এবং আশু সিদ্ধি লাভের জন্য সকলকেই তত্ত্ব মতে দেবদেবী করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাঁহার উপদেশামৃত

নদের নিমাই :

সকলেই যার-পর-নাই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল । কিন্তু এ আনন্দপূর্ণ ভোগ তাহাদিগের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই ।

জননী শোভা দেবী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বধুমাতার গর্ভে শ্রীভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, সমস্ত রাত্রি আনন্দে তাঁহার নিদ্রা হইল না । পরদিন তিনি স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া জগন্নাথকে সঙ্গীক নবদ্বীপে যাইতে বলিলেন, কারণ এ গর্ভে যখন ভগবান স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নদীয়ার মত পবিত্র স্থানে প্রসব হওয়াই কর্তব্য । এখানে লোকজনের অভাব, তিনি একে বুদ্ধা, তায় রোগগ্রস্তা, পাছে গর্ভের কোন অনিষ্ট হয়, নদীয়ায় বধুর পিতামাতা সকলেই বর্তমান ; সেখানে লোকজনের অভাব হইবে না । আর রমণীগণের প্রসব কার্য্যটা জননীর নিকট হওয়াই ভাল, তাহা হইলে গর্ভিণী সমস্ত দুঃখকষ্ট জননীর নিকট খুলিয়া বলিতে পারে, সঙ্কোচের কোন কারণ থাকে না, তাই শোভাদেবী পুত্রকে নবদ্বীপে আসিতে সংপরামর্শ দিলেন । দেশ ছাড়িয়া এত শীঘ্র গম্মাথের আসিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পত্নীর এই সঙ্কট সময়ে জননীর পদে, তিনি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিমাইয়ের জন্ম।

১৪০৬ শকের মাঘমাসে পূণ্যপ্রতিমা, পরম সৌভাগ্য-শা।

গর্ভধারণ করিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূণ্যদা দে।
তিথিতে, যে দিন সুনীল অম্বরে পূর্ণচন্দ্র ঘোলকলায় আবিভূত
রূপেরহাটে আপনাপনি রূপের বিকিকিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, চান্দ্র
সুবিমল শোভায় সুশোভিত হইয়া, যখন ধরার শ্রামাকল
শোভা মণ্ডিত করিয়াছিল। আবার চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে যখন প্রা
হরি-নাম ধ্বনিত হইয়া গ্রামখানিকে আনন্দ মুখর করিতে
ঠিক সেই সময়ে, সদ্ধাসুন্দরী সুনির্মল পবিত্র বেশে মাটীতে নামিব
কিয়ৎক্ষণ পরে বিত্তজ্ঞান পরিশোভিত, পূণ্যতোয়া জাহ্নবী পুলিনস্থ নবদ্বীপ
নগরের মায়াপুর গ্রামে, পূণ্য-প্রবীণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত
করিয়া অকলঙ্ক গোরাঙ্গদেব ভূভার হরণ করিতে জননীর গর্ভচ্যুত
হইলেন। শ্রীরাধার কলঙ্ক মোচন করিয়া যিনি অকলঙ্ক করিয়াছিলেন
যিনি নিজে সকল পবিত্রতার আধার—নিষ্কলঙ্ক, তিনি স্বয়ং অবতী
হইয়া জীবের সমস্ত কলঙ্ক মোচন করিবেন, পৃথিবীর জীবকে নবজীবন দ
করিবেন। এইজন্ত জগতে সকলক চক্রে প্রয়োজন হইবে না বা
বুঝি দৈত্যধর্মী রাহু রোষ পরবশ হইয়া, সেদিন ক্ষিপ্ত আক্রমণে
ধবল জ্যোতিঃ শশধরকে আক্রমণ করিয়া তাহার গর্ভ ধর্ম করি

ার নির্দিষ্টকাল কিন্তু আদরের ছুঁহিতা
 হইল, তথাপি প্রসব হইলেন না দেখিয়া, সকলেই
 পিতা নিলাস্বর চক্রবর্তীও সাতিশয় চিন্তিত হইয়া
 তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। গণনা
 -ভাগ্যবতী শচীমাতার গর্ভে ভগবান জন্ম লইয়াছেন।
 ার সৌভাগ্যে পিতার আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনিও
 যত্নসেবন করিয়া জন্মতিথির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন এবং
 ার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নবপ্রসূত দৌহিত্রের অনুপম
 নশশাক দর্শন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইয়া জাতকফল গণনা করিয়া
 লেন—পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্রে, সিংহরাশিতে, দেবগণে শিশু ভূমিষ্ট
 হৈছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এমন শুভযোগ মহাপুরুষ না হইলে
 ার ভাগ্যে হয় না।

জগন্নাথ মিশ্রের আঙ্গিনায় একটা সূবৃহৎ নিম্ব বৃক্ষ ছিল, তাহার
 তলদেশেই আতুর ঘর নির্মিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ভূমিষ্ট হইয়াই
 অচৈতন্য হইয়াছিলেন। ধাত্রী ও উপস্থিত পরিপক্ষা গৃহিণী সকল
 শশব্যস্তে শিশুর জীবন সঞ্চারের জন্য দুই একটা সামান্য টোটকা প্রয়োগ
 করিবারাত্রি শিশুর চৈতন্যোদয় হইল। বৈশীদিন গর্ভে ছিলেন বলিয়া,
 শিশুর আকৃতি কিছু বড় এবং বর্ণ ঠিক কাঁচা সোনার মত দেখিয়া
 কলে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মৃতবৎসা জননীর পুত্র হইলে কত
 কতপ্রকার নাম রাখিয়া থাকে। জগন্নাথ আনন্দ-আপ্ত হৃদয়ে
 াবাহিত নয়নে, গদগদবচনে পুত্রের নাম রাখিলেন—বিষ্ণুন্তর, কিছু
 যতনে পত্নীকে কষ্ট দিয়া প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পুত্রের

১২০৬৫ নদের নিমাই।

এই নাম রাখিলেন এবং মনে মনে বিখস্তর নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার দাদা ও আত্মীয়গণ তাঁহাকে এই নামেই ডাকিত। শচীদেবী পুত্রের চন্দ্রবদন, তাহার সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া ~~স্বপ্ন~~ কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। সোণার শিশুকে কোলে লইয়া, পাছে তাঁহার সেই প্রাণকুমারের প্রতি কেহ নজর দেয়, হিংসা করে, এইজন্য নিম্নতিক্ষু আর সেই বৃক্ষ তলায়ই তিনি এই শিশু প্রসব করিয়াছেন, বলিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবাব জন্য পুত্রের নাম রাখিলেন,—“নিমাই”। নবদ্বীপে প্রভু এই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

প্রতিবেশী রমণীগণ শিশুর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া নাম রাখিলেন—“গৌর”। মাতামহ নীলাশ্ব চক্রবর্তী এই সুলক্ষণযুক্ত শিশুর নাম রাখিলেন—“শ্রীগৌরানন্দ”। যে ছেলে বাপমায়ের যত আদরের, তার নাম তত বেশী হয়। কখন যে কি নামে ডাকিলে তাঁহাদের আশা মেটে, প্রাণে আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহার স্থিরতা নাই। শিশুর সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধুর্য, তাহার সেই অল্পম সৌম্য মুক্তি দেখিয়া মনে যখন যে আকাঙ্ক্ষা উদয় হইত, তখন তাঁহারা সেই অল্পরূপ একটা প্রতি বাক্য দিয়া ডাকি আনন্দ অল্পভব করিতেন, সেই বিশ্বাসের সদৃশ গুণাধরে আপন গুণা স্থাপন করিয়া স্বর্গের সুখানুভব করিতেন। মাতৃদত্ত নাম “নিমাই” বলিয়াই সকলে পুত্রটিকে ঐ নামে ডাকিত এবং আদর করিত।

কোলের ছেলেটার উপর জননীর স্নেহ কিছু বেশী হয়। এই ছেলে
শাচী দেবী শিশুকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। এই শিশুটির
বাল্যকাল হইতেই অনেক অলৌকিক গুণ দেখা গিয়াছিল। তাহার
মধ্যে এসময়কার একটি বিশ্বয়কর গুণ এই যে, শিশু অত্যন্ত যোদন

নদের নিমাই ।

করিতেছে, কোন প্রকারে তাহাকে থামাইতে পারা যাইতেছে না, এমন সময় হরি নাম করিলেই বা রাধা নাম করিলেই শিশু ক্রন্দন ভুলিয়া যাইত, হাশু আশু ছোট ছোট হাত পা গুলি ছুঁড়িয়া খেলা করিত। এইভাবে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইত। শচীদেবী আহালাদির পর পুত্র কোলে লইয়া আদর করিতেন। জগন্নাথ ও বিশ্বরূপ কাছে বসিয়া “ঘশোমতি” কোলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সহিত নিমাইয়ের জন্মের সৌদাদৃশ্য অনেক। পুত্র গর্ভকোষে থাকিবার সময়, যখন ভূমিষ্ট হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইতেছিল, সেই সময় জগন্নাথ কোন কোন দিন ভাবিত হইলে, শচীদেবী স্বামীকে সম্ভষ্ট করিবার জন্ত ঠিক দ্বাপরে কংশ কারাগারে দেবকীর গর্ভসঞ্চারের মত অলৌকিক কাহিনী সকল চূপে চূপে বিবৃত করিতেন। সময়ে সময়ে নিদ্রোস্থিতা হইয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিতেন—“দেখ, আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, স্বপ্নে দেখিলাম—যেন কে চতুর্মুখ, কে পঞ্চমুখ, কে সড়মুখ, কে গজমুখ প্রভৃতি পুরুষমূর্তি অপরূপ প্রভাজালে মণ্ডিত হইয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া শিশুর স্তুতি-পাঠ করিতেছেন। শুধু কি পুরুষ, শচীদেবী ত দেবীস্বরূপিনী রমণীগণ কেহ অষ্টভূজা, কেহ দশভূজা, কেহ চতুর্ভূজা, তাঁহারা যেন স্তন বাড়াইয়া আমার গর্ভস্থ শিশুর মুখে দিয়া ধন্য হইতেছেন। আর একটি পরমা সুন্দরী চম্পকবরণী দ্বিভূজা রমণী আমার গর্ভকোষে অনন্তশয়নে নারায়ণের মত পদ্মাসনস্থ শিশুর পদযুগল হাসি হাসিমুখে নয়নের জলে ভাসিয়া সেবা করিতেছেন। স্বামীন্! প্রভু! এই সকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে (অভাগিনী আমি) ভয় হয়, পাছে গর্ভস্থ শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়?” পত্নীর মুখে জগন্নাথ শিশুর এই সকল

নদের নিমাই ।

অপূৰ্ণ লক্ষণ শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অমুভব কবিতেন,
আপনাকে পবন সৌভাগ্যবান মনে করিয়া, ভূমিষ্ট হইয়া জন্ম সার্থক
কবিবাব প্রার্থনায় ভগবানেব চরণে কোটি কোটি মানসীক প্রণাম
কবিতেন এবং ভাক্ষস্বভাবা পত্নীকে সাস্তুনা করিয়া বলিতেন—“ও সকল
অমূলক চিন্তামাত্র, ইহাব জন্ত তুমি কিছু ভেবোনা বা ভয় কবো না।”,
শচীদেবী এই স্তোত্রবাক্যে সন্তোষ লাভ করিয়া কিছুদিন পদ্ম,
নবদ্বীপ চন্দ্র নিমাইচাঁদকে পাঠিয়া, এক কালে সকল শোক, সকল সন্তাপ
বিস্মৃত হইলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বাল্যলীলা ।

কে নিমাইয়ের বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত রকমের ছিল । সাধারণ বালকের
সরূপ দেখা যায় না । নিমাই দিন দিন শশীকলার ত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া
পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল । যখন করচরণে শিশু
হামাগুড়ি দিতে শিখিল, তখন তাহাকে আটকাইয়া রাখা দায় হইল ।
শচীদেবী গৃহে রন্ধন করিতেন, শিশু আঙ্গিনায় খেলা করিয়া বেড়াইত ।
একটু চক্ষের আড়াল হইলেই সে বাহির হইয়া পলায়ন করিত, জননী সমস্ত
কাজ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে আটক করিতেন, বলিতেন—
“রক্তছেলে, এখনও তোমার পা হয় নাই, তবু এত প্রতাপ, চলিতে পারিলে
জানি কি করিবে, বলিয়া কোলে করিতেন এবং আদর করিয়া মুখচুষন
করতঃ ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিতেন । শিশু মধুর অধরে মুদুহাস্ত
করিয়া মায়ের প্রাণে স্বর্গের সূধা ঢালিয়া দিয়া গৃহ মধ্যে খেলা করিত ।
সে খেলা বড় বিষম প্রকারের, জননী একটু সরিয়া যাইলেই, সে ঘটি
গেলাস ফেলিয়া দিত, বড় বড় জলপূর্ণ কলস, গাড়ু ফেলিয়া ঘর জলময়
করিত, জননী পুত্রের দুঃস্থপনা দেখিয়া মাথা কুটিতেন । শিশু তাহাতে
অতিশয় আনন্দানুভব করিয়া খল খল হাস্ত করিত, দেখিয়া জননী যখন
তাহাকে আদরের তাড়না করিতে যাইতেন,—অমনি দাদা বিশ্বরূপ
আসিয়া “মা মেরোনা, মেরোনা,” নিমাই চীৎকার করিলে থামান দায়

নদের নিমাই ।

হইবে, এখনি হরি নাম করিয়া তাহার বোদন থামাইতে হইবে । তুমি স্থিৰ হও, আমি দেখিতেছি” বলিয়া, তিনি কনিষ্ঠ ভাতাটিকে কোলে লইয়া বলিতেন—“নিমাই, দাদা আমার, অত অন্ধ্যায় করিয়া কি বাপমাকে জ্বালাতন করিতে হয়, তা’হলে যে তোমাকে সকলে নিন্দা করিবে ?” নিমাই এই অল্প বয়সেই দাদাকে বড় ভয় করিত—ভালও বাসিত, বিশ্বরূপ কোলে করিলে শিশু আর কোন প্রকার দুৰত্তপনা করিত না, দাদার কোলে উঠিয়া, কত অঙ্কভঙ্গি করিয়া খেলা করিত । বিশ্বরূপ বাড়ীতে থাকিলে নিমাই অনবরত দাদার কাছে কাছে ঘুরিত, আদৌ দোরাণ্ডা করিত না কিন্তু বিশ্বরূপ ত আর সকল সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিতেন না । তিনি সমস্ত দিন টোলে পড়িতেন, তারপর বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত শাস্ত্র-চর্চায় দিন কাটাইতেন, বাড়ীতে মাত্র আহারের সময় আসিতেন । বিশ্বরূপ নিমাইকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন ।

পূর্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ের বাল্যলীলা অতি আশ্চর্য্য । ছয়মাসে যখন নিমাইয়ের অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য্য হইল, তখন আত্মীয়স্বজন নিমজ্জিত হইয়া জগন্নাথের বাড়ী আসিলেন । সকলে নানা প্রকার সামগ্রী আনিয়া শিশুর খেলার জন্ত বাখিয়া দিলেন । উত্তম বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত নিমাই শয্যায় উপবেশন করিল, মাতামহ নীলাধর তাহার নাম-করণ করিলেন—“গৌরহরি” । সকলে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বালককে বসাইয়া তাহার নিকট ঐ সকল খেলনা দিলেন । সেই খেলনার মধ্যে একখানি “শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রন্থ ছিল । সকলে দেখিতে লাগিল,—শিশু ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যটা গ্রহণ করে । সেই ক্ষণেই সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া অগ্রে “ভাগবত” গ্রন্থখানি লইয়া নাড়া চাড়া করিল,

২. নিমাই।

খুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহা দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর এই কাণ্ড দেখিয়া পিতা-মাতা ও উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক হইলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাবুদ্ধিও ধৰ্ম্মনিষ্ঠার বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শিশু চলিতে শিখিল। জননী শচীদেবী প্রতিদিন যশোমতীর মত পুত্রের বেশভূষা করিয়া দিতেন, পুত্র স্নানব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ টিকভাবে থাকিত, তার পব ধূলা মাটি মাখিয়া সৰ্ব্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত করিয়া ফেলিত, দেখিয়া জননী আপুশোষে মূঢ় তিরস্কার করিতেন।

ক পূর্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ের সমস্তই অলৌকিক ছিল। তাহাব রূপ অতি অপকণ, হস্ত ও পদতল হিজুলের স্তায় রক্তবর্ণ, চলিবাব সময় যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িত। নযনেব দৃষ্টি, মুখেব হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব জ্যোতিঃ সমস্তই মধুময়, দেখিলে নয়ন কিরাইতে পাবা যাইত না। যে তাহাকে একবার দেখিত, সেই অবাক হইয়া ভাবিত—মিশ্রের এ শিশুটা মানুষ না দেবতা?

ক নিমাই মাতাকে গ্রাহ্য কবিত না, মাতা ধম্কাইলে সে হাসিব চোটে কঁহা উড়াইয়া দিত, তবে পিতাকে একটু ভয় করিত আর ভয় কবিত—মোদাকে। এইজন্ত শচীদেবী তাহার দুঃস্বপ্ননা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত প্রায়ই তাহাকে স্বামীব কাছে, না হয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে শয়ন করিতে দিতেন। পুত্রের প্রতি শচীর বড় মায়া, এমন স্নন্দর শিশুটির পাছে কোন অমঙ্গল হয়, পাছে কোন অপদেবতায় আক্রমণ করে, এই জন্ত শচীদেবী রাত্রে পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতেন না। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণেব নিকট ত কোন অপদেবতার প্রভাব খাটিবে না,

নদের নিমাই :

এই জন্ম প্রায়ই স্বামীব নিকট পুত্রকে শুইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেন। পুত্র যখন উঠিয়া পিতাব নিকট যাইত, তখন তিনি পুত্রের শৃঙ্গপায়ে হৃদযুব হৃদযুব-ধ্বনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, অপব দিক হইতে জগন্নাথ পুত্রকে লইতে আসিয়া একপ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন এবং নিমাই নিদ্রিত হইলে স্বামী-স্বাভে পুত্রের কথা কহিতেন; জগন্নাথ বলিতেন—“তোমাব স্বপ্ন দেখাব বিষয় চিন্তা করিয়া এখন বোধ হইতেছে, নিমাইয়ের দেহে গোপালের আবির্ভাব হইয়াছে।” এ কথায় শচীদেবী আপনাকে গোববাসিতা মনে না কবিয়া পুঃস্নেহে অধীবা হইয়া বলিতেন—“যিনিই দয়া ককন, তাহাব দেহে যিনিই বিবাজ ককন—আমাব বাচাব যেন কোন অনিষ্ট না হয়। গাচা যেন আমাব সকল দেবতাব দাস হয়ে ‘হাডান্তি গোডান্তি’ হয়ে বেঁচে থাকে।”

বয়সেব সঙ্কে সঙ্কে নিমাইয়ের দৌবাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। সে কাহাবও শাসন মানে না, প্রতিবেসী সকলের বাড়ীতে যাইয়া অত্যাচার করিতে লাগিল। পাভাব সকলে বিবক্ত হইয়া পিতামাতার নিকট অভিযোগ কবিলে, শচী ও জগন্নাথ তাহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়া পুত্রকে শাসন কবিতেন। কিন্তু “চোব না শুনে ধর্ম্মেব কাহিনী” যখনকার তখনি—তাব পবই নিমাই সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আবার স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইত।

নিমাইয়ের বাটীব কাছেই গঙ্গার ঘাট। সকলেই প্রাতঃস্নান করিয়া গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যাত্তিক করিত, স্ত্রীলোকেবা শিবপূজা করিত; নিমাই সেই সময় তাহাদের কাছে গিয়া পূজার দ্রব্যাদি নষ্ট করিত, কুল-কুলসী

নদের নিমাই ।

বিশ্বপত্র লইয়া আপনি মাথায় দিয়া বলিত—“তোমরা আমার পূজা কর, আমি তোমাদের ঠাকুর।” সকলে বিরক্ত হইয়া মারিতে যাইলে—নিমাই এমন দৌড় দিয়া বাড়ী আসিত যে, কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না। মাতা শুনিয়া পুত্রকে শাসন করিতেন—নিমাই কাঁদিয়া অধীর হইলে শচী কোলে তুলিয়া মুখ চুসন করত বলিতেন—“হারে নিমাই! তোর কি প্রাণে ভয় নেই বাবা, ঠাকুর দেবতার জিনিস কি অমন করে উচ্ছিষ্ট কর্তে আছে, তাতে যে অমঙ্গল হবে, তুই প্রাণে ঝুঁচবি না?” বলিয়া মধুব বচনে বুঝাইয়া দিতেন। পুনর্ব্বার যাহাতে হার না কবে, তাহার জন্ত কত ভয় দেখাইতেন, প্রতিবেশীর বাড়ীতে রূপে নিষেধ করিতেন। ইহাতেও আবার বিষম বিপদ হইত, নিমাইকে ছুই একদিন দেখিতে না পাইলে পাড়াব সকলে জগন্নাথ ও শচী দেবীর নিকট বলিত—“কইগো, নিমাইকে যে আর খেলাতে দেখি নাই—তার কোনও অস্থখ করে নাই ত?” সকলে নিমাইয়ের অত্যাচারে যেমন বিরক্ত হইত—ছুই একদিন না দেখিলেও তেমনি আবার আশ্বস্ত হইয়া বাড়ীতে দেখিতে আসিত। নিমাইয়েব দর্শন, স্পর্শন, সঙ্গলাভ সকলের এমনি স্বখকর, এমনি আনন্দদায়ক ছিল। সেই দেব শিশুকে দেখিলে সকলের প্রাণই আনন্দে নাচিয়া উঠিত—তাহার স্তম্ভকথা শুনিলে কর্ণকুহর পবিত্র হইত, তখন সকলেই বলিত—ছেলেটা ছরস্ত হউক, কিন্তু দেখলে প্রাণ শীতল হয়, সে বাটীতে না আসিলে যেন সব ফাঁকা বোধ হয়,—এবাব সে বাড়ীতে আসিলে আদর করো—আর তাড়না করো না। ছরস্তপনা করলে সকলে একটু সাবধান হইলেই সব গোল চুকিয়া যায়—হৃদয়ের ছেলে, বড় লোকের উপর কত বল

নন্দেন নিমাই !

প্রকাশ করিবে ? এইরূপে সকলে আসিয়া আবার নিমাইকে আদর করিয়া ঘবে লইয়া যাইত ।

একদিন একটা বিদেশী ব্রাহ্মণ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া আতিথা গ্রহণ করিলেন । জগন্নাথ ও শচী দেবী এ সকল বিষয়ে বড়ই আগ্রহা-
বিত ছিলেন । ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া সাদবে ঘরে তুলিয়া
লইলেন এবং তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রাহ্মণ বলি-
লেন—“আমি বহু দূরদেশ হইতে আসিতেছি ; দুই তিন দিন কিছু
আহার হয় নাই ; আমি স্বপাকে আহার করিব—তোমরা তাহার
উদ্যোগ করিয়া দাও ।” শচী দেবী তাঁহার প্রাণকুমারের মজল কামনা
ব্রাহ্মণের আহাবের আয়োজন করিয়া দিলেন—তিনি গঙ্গাঅন্ন করিয়া
আসিয়া স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতঃ ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন
করিয়া দিয়া নিমৌলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইয়াছেন । এমন সময়ে শচী-
নন্দন নিমাই অতি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহা উদরস্থ করিতে লাগিলেন ।
ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—নিমাই সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়াছে । তিনি
জগন্নাথকে সমস্ত কথা বলিলেন—জগন্নাথ পুত্রকে তিরস্কার করিয়া
পুনরায় ঠাকুরের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন । ব্রাহ্মণও বালকের
সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া পুনরায় রন্ধন করিলেন—সেবারেও
নিবেদনের সময় নিমাই আসিয়া তাহা উচ্ছিষ্ট করিল । এইরূপে তিনবার
অন্ন প্রস্তুত হইল, নিমাই তিন বারই তাহা নষ্ট করিল, দেখিয়া জাপক
ব্রাহ্মণ ধ্যানস্থ হইয়া বৃষ্টিতে পারিলেন—এ বালক সামান্য নহে,
তাঁহারই ইষ্টদেবতা আজ জগন্নাথের গৃহ আলোকিত করতঃ “বালক
বেশে তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন । বারবার তিনবার শ্রীতিপূর্বক

নদের নিমাই ।

অন্ন ভোজন করিগা তাঁহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণ ভগবানের চরণে অশেষ মিনতি-প্রণতি জানাইয়া সেই দেবদুর্লভ প্রসাদ ভক্ষণ করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন।

জগন্নাথের গৃহে শালগ্রাম শীলা ছিলেন। প্রতিদিন তিনি তাহার পূজা করিতেন। তখন যে গৃহে নারায়ণ শীলা, চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসী বৃক্ষ এবং গোশালা না থাকিত, তাহা হিন্দুর গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত না। পূর্বে হিন্দুগৃহস্থালীর এইরূপ নিয়ম ছিল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের গৃহে এ সকল থাকা চাই—নতুবা সমাজে তাহার সম্মান রহিত হইত। প্রতিদিন জগন্নাথ গৃহ-দেবতার পূজা-ভোগ সমাপন করিলে—শচী দেবী গাত্র ধোত করিয়া অতি পবিত্র ভাবে আসিয়া পূজা-গৃহে ইষ্টজপ করিতেন, পুত্রের মঙ্গল কামনায় কত প্রার্থনা করিতেন। শচী দেবীর অত্যন্ত শুচিবাঁহ ছিল—তিনি একস্থান দশবার ধোত করিতেন—গোময় দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা পরিষ্কার করা, তাহার প্রাত্যহিক কাজ ছিল। তারপর ঠাকুর ঘর তিনি এমন প্রাণপণ যত্নে পরিষ্কার করিতেন—যাহা দেখিলে অতি বড় নাস্তিকেও সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজা না করুক, কিছুক্ষণ বসিয়া প্রাণ জুড়াইতে ইচ্ছা করিত।

আজ স্বামীর পূজার পর শচীদেবী অতীব পবিত্র হইয়া দেবগৃহে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। এমন সময় নিমাই চূপে চূপে তথায় আসিলেন এবং শালগ্রাম শীলাটাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া আপনি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। জননীর ধ্যানভঙ্গ হইলে পুত্রের এই কাণ্ড কারখানা দেখিয়া তিরস্কার ও তাড়না করিতে গেলে নিমাইয়ের সেদিনকার ভাব দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া তাহার

নদের নিমাই।

গায়ে হাত তুলিতে বা কোনরূপ তিরস্কার করিতে পারিলেন না, তাহাও এক দৈব শক্তির আকর্ষণে তিনি অভিজ্ঞতা হইয়া স্বামীকে সংপরিচয় দিলেন।

নিমাই
জগন্নাথ আসিয়া পুত্রের ভাব দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।
তাহার এইভাব দর্শনে তিনি মনে মনে কত কি চিন্তা করিয়া পূর্ব ঘটনা স্মরণ কবতঃ আশ্বস্ত হইলেন, নিমাইকে কিছু না বলিয়া পুনরাথ দেব-শিলাকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান কবাইয়া, নানাবিধ স্তুতি-মিনতির দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পুত্রের দোষ প্রশমনেব জগ্ন আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন।

বিশ্বরূপ বাটীতে আসিয়া ছোট ভাইয়ের ঐশ্বরিকতার আভাসে ব্যাকুল হইলেন, তাহাকে কোলে কবিয়া বলিলেন—“নিমাই ভাই! তুমি এমন দুবস্ত হচ্ছ কেন, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই? ঠাকুর দেবতার কাছে কি অমন দুষ্টামী করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পাপ দিবেন—তোমার কষ্টের একশেষ হইবে।”

অগ্রজের কোলে উঠিয়া নিমাই যেন চোরটীব মত শাস্তভাব ধারণ করিল, নীববে দাদার কাঁধে মাথা রাখিয়া যেন কত লজ্জা অনুভব কবিতে লাগিল। পূর্বে বলিয়াছি—নিমাই কেবল দাদাকেই অতিশয় ভয় করিত, আর বিশ্বরূপ প্রাণের ভালবাসায় অগ্রজের এই অমাহুযিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া বিশ্বয় বিক্ষারিতনেত্রে তাহার সুন্দর বদনের মধুর ভাব মগ্নিত সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া আপনহারা হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছদ ।

বিদ্যারম্ভ ।

নিমাই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ যথারীতি তাহার হাতে ঋড়ি দিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে নিযুক্ত কবিতা দিলেন । বাল্যকালে যে বালক যত চঞ্চল হয়, বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেধাশক্তির পরিচয় তত বেশী পাওয়া যায় এবং চঞ্চলতা কমিয়া ক্রমশঃ শান্ত শিষ্টভাবে পরিণত হইতে থাকে ।

নিমাইয়ের ও সেইরূপ হইয়াছিল । সংস্কৃত শিক্ষার নিয়মানুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে ব্যাকরণ কর্তৃস্থ কবিতা হয় ; নিমাইয়েব বিদ্যারম্ভ হইবার কিছু দিন পরে তাহার অলোক সামান্য প্রতিভার প্রকাশ হইতে লাগিল । সে এই অল্প বয়সে এই নীরস ব্যাকরণ, এমন সুন্দর ভাবে কর্তৃস্থ করিতে লাগিল—যাহা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না ।

গৌরান্দের স্বাস্থ্য খুব ভাল । একদিনের জন্তও তাহার শরীর কোন প্রকার অসুস্থ হইত না—এইজন্য সে প্রতিদিন প্রফুল্লচিত্তে পাঠাভ্যাস করিত—পাঠের সময় তাহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না । জগন্নাথ ও শচী দেবী পুত্রকে লেখা পড়ার জন্ত তত বিরক্ত করিহেঁলে না ;—নিমাই বাঁচিয়া থাকুক, লেখা পড়া শিখিবেই—এই তা'গেন দুধের ছেলে ।

নদের নিমাই :

অগ্রজ বিশ্বরূপ অঙ্ককে লইয়া সময়ে সময়ে বসিতেন—তাহার পাঠের পরীক্ষা করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য মনে বলিতেন—এই দুর্কোধ্য কঠিন ব্যাকরণ শাস্ত্র নিমাই এত ছোট বয়সে কেমন করিয়া এরূপভাবে আয়ত্ত করিল ? আশীর্ব্বাদ সহকাৰে বলিতেন—নিমাই নিরোগ হইয়া বাচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে যে একজন বড় পণ্ডিত হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । সাধারণ মৃত্যু-শিশু এত অল্প বয়সে এরূপ কঠিন বিষয় সমাধান করিতে পারে না—নিমাই কি তবে ক্ষণজন্মা ?

পিতামাতা পুত্রকে হাতেখড়ি দিয়া পাঠাবন্ত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন । তাহার জ্ঞান যে কিছু চেষ্টা করা—নিমাই পড়িল কি না, বিদ্যালয়ে যাইতেছে কি ফাঁকী দিতেছে, সে বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না । কেবল বিশ্বরূপ সময়ে সময়ে বালককে কাছে বসাইয়া একটু আধটু নাড়া-চাড়া করিয়া বিশেষ সুখবোধ করিতেন, কোনরূপ জোর জবাবদণ্ডি করিতেন না । এত ছোট বেলায় পাঠের জ্ঞান বেশী পীড়াপীড়ি কাবলে বালক বিগড়াইয়া যাইবে, হয়ত কোমল মস্তিষ্ক গুজনের ঋতিবিক ভার সহ্য করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, স্বাস্থ্যহানী হইয়া শরীর নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নহে । এইজন্য নিমাই অহরহঃ দাদাকে পড়াইতে বলিলেও, তিনি বলিতেন—“সমস্ত দিন পড়া ভাল নয়,—তুমি খেলা করগে।” দাদার অনুমতি পাইয়া নিমাই সঙ্গীগণের সহিত খেলাইতে যাউত ।

এদিকে পিতামাতাও নিমাইকে অতিরিক্ত আদর দিতেন—কিছু খাতিয়ে নেন না । কাজেই নিমাই আর তত পাঠে মন দিত না, সময়কাল

নন্দের নিমাই।

বালকগণের সহিত আনন্দে নানা প্রকার খেলা করিয়া সময় কাটাইয়া দিত। নিমাইয়ের রূপ কাঁচা সোণার মত, গঠন প্রণালীও নিখুঁত। তাহার উপর তাহার জননী আঁটিয়া সাঁটিয়া কাপড় পরাইয়া, পূর্ণচন্দ্রের গ্রায় বদনখানি অলকা-তিলকাবৃত করিয়া দিতেন এবং বড় বড় কেশগুলির সংস্থার করিয়া তাহাতে চূড়া বাঁধিয়া দিতেন।

বালক এইরূপে যখন নাচিয়া নাচিয়া বয়স্কগণের সহিত গান গাহিতে গাহিতে আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইত, শচীদেবী তখন সমস্ত কাজকর্ম তুলিয়া অস্ত্রাস্ত্র রমণীগণের সহিত হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেন। নিমাই হেলিয়া তুলিয়া উন্নতের গ্রায় নৃত্য করিত, আর সকলেই মুগ্ধ নেত্রে দেখিত—জগন্নাথের আঙ্গিনায় একটা অপূর্ব সোণার পুতুল নাচিতেছে, যেন ব্রজধামে নন্দের বাটীতে নন্দ-নন্দনের মধুর নৃত্য! তাহা দেখিয়া সকলে ভাবাবেসে চক্ষের জলে বুক ভাসাইত।

কখনও কখনও বয়স্কগণের সহিত এই ননীর পুতুল হরিবোল বলিয়া উদ্যাম নৃত্য করিত, শেষে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া রুদ্ধশ্বাস হইবার উপক্রম করিত। শচীদেবী গুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া মুছ মধুর তিরস্কারে বৃকে তুলিয়া লইতেন, শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া মুখচুষন করিতে করিতে ঘরে লইয়া যাইতেন।

নিমাই বড় আবদারে ছেলে—বড় এক্ষণ্ডয়ে। একবার যাহা আবদার ধরিত—তাহা না পাইলে আর রক্ষা রাখিত না। ননী দে, ননী দে, বলিয়া মায়ের আঁচল ছিঁড়িত—সময়ে সময়ে রাগে মাথার হৃন্দর চাঁচর-চিকুর ছিড়িয়া রক্তপাত করিত। মাতা বলিতেন—“থোকা

নদের নিমাই :

করিস্ কি বাবা ! তোব একদণ্ড তব্ সয় না, কাপড় চোপড় ছাড়ি দাঁড়া ?” শচী চিরদিন বিষম শুচিবাই গ্রস্তা, নানা প্রকাৰে শুচি না হইলে, তিনি কোন কাজ বৰিতেন না । কিন্তু ছুবন্ত পুত্ৰেব জ্বালায় অস্থির হইয়া, আঁচড় কামড় খাইয়া শৰণ্যন্তে তিনি সেই ননৌৰ পুত্ৰলী নিমাইয়েব হাতে নবনী প্রদান করিতেন । দিতে বিলম্ব হইলে, কোন বাধা না মানিয়া নিমাই স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করতঃ ব্ৰজ্বেব গোপালেব ত্ৰায় ছুটিয়া পলাইত এবং এক একবাব পাছু দিবিয়া দেখিত—জননী ধৰিতে আসিতেছেন কি না ।

পুত্ৰ হাঁড়ি ছুঁইল—কোন বাধা মানিল না দেখিয়া, শচী বিষম বাগান্বিত হইয়া বলিতেন—“আচ্ছা যাও, একথা হয় কৰ্ত্তা আসিলে, না হয় তোমাব দাদা আসিলে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিব, তখন তোমাব কি শাস্তি হয় দেখিও ।” নিৰ্ভীক শিশু মধুব অধবে লজ্জা-ভয়-মিশ্ৰিত একটু মুচ্ৰ্ক হাসিয়া পলায়ন কৰিত । নিমাই বাডীতে যেমনি, পাড়ায়ও তেমনি কাহার হাব্ দাব মানিত না, সকল গৃহস্থকেই জ্বালাতন কৰিত । কিন্তু তাহাবা এখন আব শচীদেবীৰ কাছে কোন প্রকাৰে অভিযোগ উপস্থিত কৰিত না, কাৰণ তাহা হইলে যদি জগন্নাথ তাহা, শ্ৰীঅঞ্জে সাট মাবেন, আব শচীদেবী বিবস্ত হইয়া যদি তাহাকে বাঁধিয়া বাখেন—তাহা হইলে ত নিমাই বিষম কষ্ট পাইবে—আর এমন কৰিয়া তাহাদেব আঙ্গিনায় নাচ-গান কৰিয়া খেলা করিতে আসিবে না । এইজন্ত প্রতিবাসীবাও নিমাইয়েব অত্যাচাব যে অবোধে সহ্য কৰিত না—এমন নহে ।

পড়া শুনাৰ আব কিছুমাত্ৰ মন নাই—কেবল খেলা । নিমাই

নদের নিমাই :

গঙ্গাতীরে বালক বালিকাদিগের সহিত কেবল খেলা করিত। এই সময় বল্লাভাচার্য্যের কণ্ঠা লক্ষ্মীদেবীও তাহার সহিত খেলাইতে আসিতেন—দুইজনে বড় ভাব হইয়াছিল।

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিত জগন্নাথের সহিত পথে দেখা হইলে বলিলেন—“নিমাই আর পড়িতে আসে না কেন? আজ প্রায় মাসাবধি হইল সে এদিক মাড়ায় নাই। পিতা যদিও পড়ার জন্য পুত্রকে বেশী চাপ দিতেন না—তথাপি তিনি জানিতেন, নিমাই প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়, কামাই করে না। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ে অল্পপস্থিত হওয়াটা বড় দোষ। বালক যত পড়ুক আর নাই পড়ুক, বিদ্যালয়ে যাওয়া চাই, তাহাতে আন্তরিক্তি বাড়ে এবং উত্তর কালে পাঠে মনোযোগ দিবার সুবিধা হয়।

পিতা যখন শুনিলেন—পুত্র আজ একমাস অল্পপস্থিত—বিদ্যালয়ে যায় না, তখন তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া বাড়ী গেলেন এবং পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নিমাই কোথায়? শচী দেবী কৃত্রিম রাগে বলিল—আমি ঘরের কাজ করিতেছি—কেমন করে জানবো? ছেলে উদ্যোগি বেলা বেরিয়েছে, হয়ত পাড়াব কার বাড়ী, নয় গঙ্গাব ঘাটে আছে, তোমরাত আব কেউ দেখ বে না?

জগন্নাথ শুনিয়া বড়ই রাগিয়া গিয়াছেন—একটা মাট লইয়া পাড়াঘ দুই এক বাড়ী ঘুরিলেন। হাতে মাট দেখিয়া সকলে বুঝিল—জগন্নাথ যেক্রপ রাগিয়াছে, তাহাতে নিমাইকে আজ মারিয়াই ফেলিবে। তাহাও ভিন্ন পথ দিয়া গঙ্গাতীরে নিমাইকে সংবাদ দিল। নিমাই পিতার ভয়ে ভীত হইয়া অল্প দিক দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। একজন

নদের নিমাই ।

বালক বলিল—নিমাই গঙ্গাতীরে নাই, ঐ যে ঘরে দোড়াইতেছে ।
জগন্নাথ সাট লইয়া অগ্রসর হইলেন—নিমাই ছুটিয়া ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করিতে লাগিল । শচী দেবী গৃহের মধ্যে রন্ধন কাণ্ডে ব্যাপ্ত
ছিলেন, প্রাণের নিমাইকে এমন ভয়চকিত নেত্রে উদ্ভাসে গৃহে
আসিতে দেখিয়া বাহির হইলেন, দেখিলেন—স্বামী সাট লইয়া পুত্রের
প্রতি ধাবিত হইয়াছেন । নিমাই ভয়ে জননীর কোলে গিয়া লুকাইল,
শচী স্বামীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—ই্যাগা ! তুমি কর কি,
ছেলে ডরাইয়া মরে—তুমি হাতের ছড়ি ফেলে দাও ; দেখ দেখি
ছেলে ভয়ে কেমন হয়ে গেছে । নিমাই পিতার মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া
ফেলিল—জগন্নাথের হাতেব ছড়িও অমনি ভূপতিত হইল, গৌরাজ
হৃদয়ের সেই শুষ্ক বদন দেখিয়া জগন্নাথ কাতর প্রাণে কোলে করিয়া
বলিলেন—হাঁ নিমাই, তুমি এত ছুট হলে কেন ? একদিনও
বিদ্যালয়ে যাও না ; পণ্ডিত মহাশয় তোমার কত নিন্দা করলেন—
তাই শুনে আমার প্রাণ বড় খারাপ হয়েছে ।

নিমাই কোন উত্তর করিল না, কেবল হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে
লাগিল । নিমাইয়ের চাঁদমুখ মলিন দেখিলে পিতা মাতার মাথা
বুরিয়া যাইত—কাঁদিতে দেখিলে ত কথাই নাই—তখন তাহাকে দাঙ্ঘনা
করা দায় ! ফুকারিয়া কাঁদিতে দেখিয়া শচী শশব্যস্তে বাহু প্রসারিত
করিয়া আসিয়া নিমাইকে কোলে করিলেন, চাঁদ মুখে শত চুষন
দিয়া স্বামীকে বলিলেন—তোমার কি একটুও মায়া নেই—কৈদে কৈদে
ছেলের মুখ কত শুকিয়ে গেলো দেখ দেখি, ছুধের ছেলেকে এত
তাড়না করা ভাল নয় ।

নন্দর নিমাই ।

জগন্নাথ বুঝিলেন—আজিকার তাড়নাটা বড় বেশী হইয়াছে, নিমাই আমার ভয় পাইয়াছে, ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি রাগে এতটা করা ভাল হয় নাই। তিনি দ্বার জোড় হইতে পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুষন করতঃ বলিলেন—খোকা, আর তোমাকে মারবো না, তুমি চুপ কর। বালক পিতার স্নেহমধুর সাস্বনায স্থগ্ধ হইয়া তাঁহাদের আসেপাশে ঘুবিয়া খেলা করিতে লাগিল। সেইদিন হইতে তিনি আর পুত্রকে কিছু বলিতেন না, কাজেই নিমাই সেইদিন হইতে নিশ্চিন্তচিত্তে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিমাইয়ের অতিরিক্ত জ্বালাতনে সময়ে সময়ে পাড়াব কেহ কিছু বলিলে, শচীদেবী মনে করিতেন—ছেলে আমার তেমন নয়। তবে পাড়ার কুলোকেব সঙ্গে এই রকম কবে, তাঁহাব আরও বিশ্বাস—নিমাই খুব সুছেলে, নিমাইয়ের কোন দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না।

পুত্র জননীকে কত জ্বালাতন করিত। শচীদেবী শুচিবাইগুণ্ডা ছিগেন বলিয়া নিমাই আশ্বাস করিয়া যখন কিছু পাইত না, তখন যে দ্রব্য ছুঁইলে মাতা রাগিবেন, নিমাই তাহাই স্পর্শ করিত। শচীদেবী অমনি রাগে জলিয়া উঠিয়া পুত্রকে তিবস্বার করিতেন, বলিতেন—“তোর জন্ত সমস্ত আচার-বিচার নষ্ট হ’লো দেখছি, হাঁরে, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—এ কি করিস্? সব মজালি দেখছি।” তখন পুত্রকে ধরিয়া স্নান করাইয়া বলিতেন—“ছি বাবা, অমন কর্তে নাই”, বলিয়া নিজে আবার স্নান করিয়া আসিতেন। শচীদেবী নিমাইয়ের যেকপ আশ্বাস সহ্য করিতেন, আর্জকালকার জননী হইলে যে কি হইত, তাহা বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ।

জগন্নাথের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না, কাজেই অল্পের চিন্তায় তাঁহাকে বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত । তাঁহার দুইটি পুত্র বিশ্বরূপ ও নিমাই কিন্তু একটিও উপযুক্ত হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে সংসার চিন্তার জগ্ন শিশু-বজমানের বাড়ী নানা প্রকার কাঙ্ক্ষা করিয়া না বেড়াইলে চলিত না । এই জগ্ন পুত্র দুইটির বেশী তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, তথাপি নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ, এই সবোমাত্র ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়া বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছেন । আর নিমাই ত অতি শিশু, হাসিখেলায় দিন কাটায় । পিতা নিজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, কাজেই পুত্রদের সহিত সম্বন্ধ বড় কম, যাহা করেন—জননী শচীদেবী ।

বিশ্বরূপের সহিতও পিতার দেখা হয় না । তিনি টোলে পড়িতেন, তাঁহার পাঠে একাগ্রতা অত্যন্ত অধিক ছিল । তিলমাত্র সময় তিনি বুঝা কাজে নষ্ট করিতেন না । কেবল সময়ে সময়ে তাঁহার মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত ধর্ম চর্চা করিতেন, ইহাদের দুইজনে বড় সন্তোষ ছিল । নিজের কোন ভ্রাতা-ভগ্নী ছিলনা বলিয়া বিশ্বরূপ মাতুলপুত্রের প্রতি বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন । তারপর যখন নিমাই জন্মগ্রহণ করিল, তখন বিশ্বরূপের আনন্দের সীমা রহিল না । -

পূর্বে বলিয়াছি—এই সময় নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা বড় কম ছিল,

নন্দে নিমাই।

। ছিলেন, তাঁহারাও শাস্ত্রমতে কোন কাজ করিতেন না, অনেক সময়ে অনাচার কবিতা ফেলিতেন। এইজন্য তাত্ত্বিকের দল খুব প্রবল হইয়াছিল।

এই সময় শান্তিপুবে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম কমলাক্ষ মিশ্র, ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন কৃষ্ণভক্ত গুরুব নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, যোগবাগে তিনি অশেষ শক্তিমন্ত্র হইয়া যথার্থ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কমলাক্ষ শেষে ভক্তিবলে শ্রীগুরুর নিকট অষ্টৈত্যাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়া শান্তিপুরে অবস্থান করিতেন।

অষ্টৈতের নিবাস শান্তিপুরে হইলেও নবদ্বীপে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া অবস্থান করিতেন, এইমূত্রে বিশ্বরূপের সহিত তাঁহার মিলন হয়। বিশ্বরূপ অতুলনীয় যুবা, রূপগুণের আধার, এইজন্য অষ্টৈত্যাচার্য্য এবং তাঁহার ভক্তগণ বিশ্বরূপকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন, এই অল্প বয়সে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিশ্বরূপ কখন তস্ততত্ত্ব লইয়া, কখন বেদান্তের মায়াবাদ লইয়া আলোচনা করিতেন। এই কঠোর শাস্ত্র আলোচনায় তিনি অদ্বিতীয় হইলেও তর্ক-যুক্তিতে সেবল অশাস্তি ভোগ করিতেন, প্রাণের একটা যথার্থ শাস্তি তিনি একদিনের জন্তও উপভোগ করিতে পারেন নাই। এই সময় বৈষ্ণবচূড়ামনী অষ্টৈত্যাচার্য্যের সভায় প্রবেশ করিয়া, তিনি ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। কঠোর মায়াবাদের অসার যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া, তিনি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে

নদের নিমাই ।

এব' সাধুভক্ত অঈত্যাচায্যের উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ প্রাণে এক অপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অঈত্যাচায্য যখন গঙ্গাজলে, তুলসীদলে ভক্তি-চন্দন মিশ্রিত করিয়া প্রেমাশ্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে পূজা করিতেন, আর ভক্তিবর্জিত কণ্ঠে প্রাণেব ডাক দিয়া বলিতেন—
“হে দীনবন্ধু! পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ, আমাদের অধোগতির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর কেন ঠাকুর! আমাদেরকে উদ্ধার কর।” এক একদিন তিনি স্বয়ং আশ্বাস দিয়া বলিতেন—“প্রভু আনিয়াছেন, আর জীবের কোনও চিন্তা নাই। আমি স্বপনে তাঁহার রূপ দেখিয়াছি, তিনি মহাশক্তি শ্রীরাধার শক্তিতে শক্তিমন্ত হইয়া, তাঁহারই স্বরূপে মর্ত্তে আসিয়াছেন, আর কোন চিন্তা নাই।” এই কথা শুনিয়া বিশ্বরূপের মনে হইত, আমার ছোট ভাই নিমাই কি তবে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মাইল? তাহারই ত কাঁচা সোণার পারা রূপ, শক্তিও অসীম, রাধা ও কৃষ্ণ নামেই ত সে এই বয়সে মাতোয়ারা; মনে মনে এই চিন্তা করিতেন, আবার পাছে কনিষ্ঠের অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ষাট্ ষাট্ করিয়া, সে ভাব ভাবের তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেন।

এদিকে পিতা, পুত্রের প্রতি নজর রাখিতেছেন না। বড় ভাইও সর্বদা শাস্ত্রপাঠ লইয়া ব্যস্ত থাকায়, নিমাই যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে এখন আর কাহার শাসন মানে না, মাকে = ই করে না—পিতাকে একটু করে, তবে তিনি সংসারের

সর্বদাই বাড়ী ছাড়া, কে তাহার পাছু লাগিয়া থাকে?

গুরু ভয় ও মাতৃ করে বটে কিন্তু তিনিও নিজের

খ লইয়াই ব্যস্ত, কাজেই বালক শাসনাতীত হইয়া

নদের নিমাই ।

উদ্ভাস্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার দৌরাণ্যে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। বোধহীন বালককে ভাল মন্দ বুঝাইয়া শিক্ষা না দিলে, বেরূপ হয়, নিমাইয়ের তাহাই হইল।

একদিন অনধ্যায়, টোলে পড়া বন্ধ, অষ্টৈতাচার্য্য সেদিন কোথায় গিয়াছেন, বৈষ্ণব সভায় কেহ নাই, কাজেই বিশ্বরূপ আজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে লইয়া বাড়ীতেই আছেন, নিমাইকে লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, এই বয়সে তাহার বুদ্ধির প্রার্থ্য্য দেখিয়া মনে মনে কতই আনন্দিত হইতেছেন। পিতা জগন্নাথও আজ কোথাও যান নাই, বাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সহিত সংসারের নানা কথাবার্তা কহিতে কহিতে বলিতেছেন—“খেটে খেটে তোমার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হচ্ছে দেখছি, একা এত পরিশ্রম কর, কাজেই এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে।”

শচীদেবী বলিলেন—“দেখ, আমি খাটুনিতে ভয় পাই না, নিজের সংসারে খাটছি, টানাটানির সংসার কি হবে বল, কিন্তু দুরন্ত নিমাইয়ের জন্ত খাটুনি যে বড় বেশী, উহাকে আর পারিয়া উঠি না; যদি তুমি বা বিশ্ব একজন ঘরে থাক, তা হলে নিমাই আর অত দৌরাণ্য্য করিতে পারে না।”

জগন্নাথ বলিলেন—“নিমাইয়ের দুরন্তপনার কথা পাড়ায় খুব শুনাচ্ছে, কিন্তু কি করি, ছেলের জন্ত বাড়ী বসে থাকলেও ত চ... আর বিশ্বরূপের এই পড়ার সময়, ও ভগবানের রূপায় ক্রম হুয়ে উঠছে, এখন পাঠ বন্ধ করে ঘরে বসিয়েও ত রা...

শচীদেবী বলিলেন—“তাকি হয়, ছেলেকে ম...

নদের নিমাই ।

এতে যদি খেটে খেটে মবে যেতে হয় তাও ভাল ; তবে এক কাজ কর না ?”

জগন্নাথ । কি কাজ তুমি কর্তে বল ?

শচী । বিশ্বরূপ ত বড় হয়েছে, এইবার একটা বিয়েব খোঁগাড কব না ? তা হলে ঘবে একটা ঠাতুডকুং ছোট বউ হয়, বাহিরেব ফাই ফবমাইস্ অনেক সে খাটতে পাবে, কিছু না পাবে, নিমাইকে নিয়ে ঘবেব মধ্যে খেলা কবলেও আমাব অনেকটা নির্ভাবনা হয়, পবিশ্রমও কম হয় ।

বহুদিন পিতাপুলে দেখা হয় নাই । জগন্নাথ উপাঙ্কনের চেষ্টায় অতি প্রত্যাষে বাটাব বাটাব হইয়া দববন্তী গ্রামে শিশুবাড়ী খাইতেন । বিশ্বরূপ তাহার পব শয্যাভ্যাগ কাবয়া গুরুগৃহে খাইতেন, কোনদিন মধ্যাহ্ন সময়ে আসিতেন, কোনদিন আসিতেন না । অঈত্যাচাষ্যক বাটতে আহার কাবয়া অনেক বাত্রে গৃহে আসিতেন, জগন্নাথ তখন আহাৰাদি করিয়া ছবস্ত নিমাইকে লইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অতিবিক্ত পরিশ্রমেব পব স্বভাবতঃই অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে তন্দ্রাময় করিত । বিশ্বরূপ আসিয়া আহাৰাদি কাবিতেন, পবিশ্রান্ত পিতাকে আর লাগাইতেন না, এইরূপে পিতাপুলে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হইত না । আজ তিনি বিশ্বরূপের সেই সৌন্দর্যময় ব্রহ্মচর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নিটোল শরীর দেখিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন ; পত্নীর অভিপ্রায় মত কাৰ্য্য করিতে রাজী হইয়া জগন্নাথ মনোমত পাত্রীর অনুসন্ধান্ন করিতে লাগিলেন ।

পিতামাতাব মনোগত ভাব জানিতে বিশ্বরূপের বিলম্ব হইল না ।

নদের নিমাই।

বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিশ্বরূপ সংসারেব অনিত্যতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব বহুদিন হইতে জাগরিত ছিল, গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। এক্ষণে পিতামাতা যদি তাঁহাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ কবেন, তাহা হইলেত সর্বনাশ হইবে? পিতৃমাতৃ ভক্ত পুত্রত কিছুতেই তাঁহারদে কথা অবহেলা করিতে পারিবেন না, অথচ শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া চিরদিন সংসারে বাধা থাকিতে হইবে। তিনি জানিতেন—বংশে একজন ভগবন্তুক্ত সন্ন্যাসী হইলে তাহার সপ্তম পুত্র উর্দ্ধগতি লাভ করে। পুত্র হইয়া পিতৃপুত্রুষের একাধ্য কবা বিশেষ কর্তব্য বোধে, তিনি অচিরে গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং একদিন জননীর হস্তে একখানি পুঁথি দিয়া বলিলেন—“মা, নিমাই বড় হইলে এই পুঁথিখানি তাহাকে দিয়া বলিও, তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়িতে দিয়াছেন।” জননী বলিলেন—“বাবা, আমি কেন দিব, তুমিই দিওনা।” পুত্র বলিলেন—“কি জানি মা, জীবনের কথাত কিছু বলিতে পারা যায় না, যদি বেঁচে থাকিত আমিই দিব, নতুবা তোমাকে বলিয়া রাখিলাম, তুমিই দিও।” জননী কি করিবেন, পুঁথিখানি লইয়া একস্থানে তুলিয়া রাখিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি—বিশ্বরূপের মাতুলপুত্র লোকনাথের সহিত তাঁহার বড় সম্ভাব ছিল। লোকনাথও একদণ্ড বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, তাহাকে সে গুরুর মত ভক্তি ও মান্য করিত। যখন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় তাহার কর্ণগোচর হইল, তখন সেও তাহার সঙ্গে বাইতে সম্মত হইল।

নদের নিমাই ।

সবেমাত্র ষোল বৎসর বয়স, বিশ্বরূপ বালক বলিলেই হয়, ইহার মধ্যে তাঁহার হৃদয় জ্ঞান-বৈরাগ্যে এতদূর বিব্রত যে সংসারধর্ম তাঁহার আন্দো ভাল লাগিল না। একদিন শীতকালেব গভীর রজনীতে লোকনাথের সঙ্গে কেবলমাত্র পথের সম্বল একখানি পুঁথি লইয়া বিশ্বরূপ প্রাঙ্গনে আসিয়া প্রথমে নিদ্রাতুর পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। তারপর প্রাণের নিমাইকে গৃহদেবতা রঘুনাথের পদে সমর্পণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রাণ যখন উদাস হয়, মন যখন সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, ভগবদ্ প্রাপ্তির বলবতী ইচ্ছা যখন মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, তখন বালক-বৃদ্ধ বলিয়া কোন পার্থক্য থাকে না, তখন কি এক মহাকর্ষণে জীব উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে। এই আকর্ষণ-বলেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দ্রব, মাতৃকোড ছাড়িয়া বনে ছুটিয়াছিল। আর আজ সেই আকর্ষণবলেই পরম সুখে লালিত পালিত বিশ্বরূপ এই অল্প বয়সে সংসার ছাড়িয়া কঠিন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। ভগবান যাহাকে আপনাব ভাবিয়া পাদপদ্ম দানে ধন্য করেন তাহার মনের গতি বাল্যকাল হইতেই ফিবিয়া পড়ে, বয়সের বশে কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

যখন দুই ভাইয়ে গঙ্গাতীরে আসিলেন, তখন পার্ব্বাট তরঙ্গবিহীন। পরপারে যাইবার কোন উপায় নাই কিন্তু প্রাণের এমনি আগ্রহ, মনের এমনি তেজ, তাঁহার। সেই স্রোতসঙ্কুল গঙ্গা পার হইতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। পাছে কেহ দেখে, তাহাদের গমনে বাধা দেয়, এই ভয়ে বামহস্তে পুঁথিখানি উত্তোলন করিয়া তাঁহার। সত্তরগে নদী পার হইলেন।

নদের নিমাই :

পরপাবে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে একদিন এক সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবিলেন। এই সন্ন্যাসী ইতিপূর্বে একদিন নবদ্বীপে মায়াপুর গ্রামে জগন্নাথের বাটী অতিথি হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সেইদিন হইতে ভাবে বিভোব হইয়া থাকিতেন। সন্ন্যাসীর উপদেশে তাহার প্রাণ আকষণ কবিয়াছিল। আত্ম আবার সেই সন্ন্যাসী এই অপকৃপ বালকের পাণ্ডিত্য, তাহার একাগতা দেখিয়া তাহাকে দীক্ষা দান কবিলেন। লোকনাথও অবশেষে বিশ্বরূপের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উভয়ে গুরুব আদেশে তীর্থ ভ্রমণ করণে অগ্রসব হইলেন।

মন্ত্র গ্রহণের পব হইতে তাঁহাদের মনের বল যেন চতুঃশুণ বৃদ্ধি হইল, তাহারা একান্ত মনে তীর্থ ভ্রমণ কবিত্তে লাগিলেন। দুইজনে একত্র কার্য্য করিলে সুবিধা হয় না, কারণ বিশ্বরূপ ধর্ম্মবশ্মে অনেক অগ্রবর্তী হইয়াছেন। শুনা যায়—প্রায় দুই বৎসব উভয়ে একত্র ভ্রমণ করিয়া পুনা নগরের নিকটে একটা গ্রামে আসিয়া বিশ্বরূপ এমন অলৌকিক ভাবে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, যাহা মানব ধাবণার অতীত। লোকনাথও তখন ভক্তিবলে বলীয়ান—ত্রেজাদৃশ্য সন্ন্যাসী; গুরুদেবের অদর্শন আর তাহাকে কাতর কবিত্তে পারিল না। তিনি দুই একদিন তথায় অপেক্ষা করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে আপনার গন্তব্য পথে ধাবমান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পূজাশোক ।

পরদিন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি বিশ্বরূপ গৃহে আসিল না দেখিয়া জগন্নাথ নিমাইকে অদ্বৈত সভায় পাঠাইলেন । পিতা জ্ঞানেন—বিশ্বরূপ হয় অদ্বৈত সভায় কোন ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবে গদ গদ হইয়া আহার নিত্রা ছুলিয়াছে, নয় অস্ত্র কোথাও গিয়াছে, যাইলেই সংবাদ পাওয়া যাইবে । নিমাই তখন বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিল । সে দাদাব সহিত একত্র ভোজন করে, তাই জননী বলিলেন—“বাবা, তোমার দাদা এখনও ঘরে আসে নাই, একবার খোঁজ করে এসতো ।” পিতাও পূজা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাই আদেশ করিলেন । নিমাই দাদার অনুসন্ধান চলিয়া গেল ।

নিমাই কোন কোন দিন বিশ্বরূপের সহিত অদ্বৈত সভায় গমন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্য এই বালকটির ভাব ভক্তি দেখিয়া কি যেন কি মনে করিতেন । একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিতেন—এই কি আমার প্রেমের ঠাকুর নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ? সাধারণ মানব-শিশুর এমন আকৃতি প্রকৃতি, এমন রূপত দেখা যায় না ? হায় ! ভগবান, তবে কি তুমি তোমার বাক্য সত্য করিতে নদীয়ায় আসিয়া শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীকে ধন্য করিয়াছ, দেখো ঠাকুর ; আমার অনুমান যেন সত্য হয় ?

নন্দীর নিমাই।

আজ বিশ্বরূপের অতুসন্ধানে নিমাইকে আসিতে দেখিয়া অষ্টভাচার্য্য পূর্নকিত প্রাণে বলিলেন—“নিমাই, তোমার দাদার জন্ত এত অতুসন্ধান করছো কেন, জান নাকি সে কোথায় গিয়াছে? একটু ভাল কবিতা আশ্বস্ত হও না, তাহা হইলে আর খুঁজিতে হইবে না। বিশ্বরূপে এমন স্থান কোথায়, যাহা তোমার অজানিত? এই বলিয়াই তিনি নিমাইকে বুকে তুলিয়া লইলেন, আচার্য্যের সমস্ত অঙ্গ কি এক মধুন ভাবে ভরিয়া গেল।

নিমাই বলিল—“আপনাবা কি দাদাব কোন সংবাদ জানেন ন + তবে আমাকে আর ধরিয়া রাখিবেন না, ছাড়িয়া দিন. আমি বাবা-কে গিয়া বলিগে?”

আচার্য্য মনে মনে বলিলেন—তুমি ধরা না দিলে তোমাকে ধরে রাগে জগতে এমন মাধ্যম কার? কৃপা করিয়া ধরা দিয়েছ, তাই একবার বুকে লইয়া প্রাণ শীতল করিলাম। তারপর ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—“নিমাই তোমার দাদাত আজ এখানে আসে নাই।”

নিমাই তাড়াতাড়ি মাইয়া পিতাকে সংবাদ দিল। জগন্নাথ বিশেষ চিন্তিত হইয়া বেলপুথুরিয়ায় তাঁহার শস্তরবাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। লোকনাথের সতীত তাহার বড় ভাব, যদি সেইখানেই শিলা থাকে।

লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“সেখানেও মহা বিভাট, লোকনাথ হাড়ীতে নাই। তাঁহার লোক পদস্পরায় শুনিয়াছেন—লোকনাথ ও বিশ্বরূপ মল্ল্যাদী হইয়া গত রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অতুসন্ধানেও অন্য তাঁহারাদি চাৰিদিনে লোক পাঠাইয়াছেন।”

নদের নিম্নে :

এই বজ্রসম সংবাদ শুনিয়া শচীদেবী বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারাইয়া তিনি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন। আমার পুত্র অকৃতজ্ঞ নহে—সে পণ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানী, নবদ্বীপের রত্নস্বরূপ, সে যে আমাদের কাছে কাদাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, সংসারের এ অতুল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহা নহে। আমাদের উপর রাগ করিয়া বা অকৃতজ্ঞতার জন্য সে গৃহত্যাগ করে নাই, বৈরাগ্যের বিষম আকর্ষণে সে এই সকল ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে। বিশ্বরূপের বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহার বৈরাগ্যত্রয় অবলম্বনের সময় নয়, তাহাকে কোন প্রকারে ফিরাইয়া আনা উচিত, জগন্নাথের মনে এরূপ কোন ভাবের উদয় হইল না। তিনি জ্ঞানী, তিনি বেশ বুঝেন—ঈশ্বর ভাবে বিভোর হইবার সময়-অসময় নাই; সৌভাগ্যশালী হইলে অতি অল্প বয়স হইতেই মানবের প্রাণে এতাব জাগা অসম্ভব নহে। পুত্র ঘরে ফিরিয়া আসুক, জগন্নাথ ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করিলেন না, বরং প্রার্থনা করিলেন—দয়াময়, আমার বালক পুত্র তোমার জন্য পাগল হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

স্বার্থপর পিতা হইলে তাহার প্রাণ হইতে স্বতঃ বাহির হইত—ছেলেটা আমাদের প্রতি তাকাইল না, ধর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু জগন্নাথ পুত্রের গৃহত্যাগে, সম্যাস ধর্ম অবলম্বনে, আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। তবে শচীদেবী স্ত্রীলোক, পুত্রগতা প্রাণা, বিশেষতঃ বিশ্বরূপ প্রায় উপযুক্ত হইয়াছিল, লেখাপড়ায় এবং চরিত্রগুণে সে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সকলেই বলিত—মিশ্রের পুত্রটি

নিমাই নিমাই।

নবদ্বীপের রত্ন, ঘেরুপ রূপ, গুণও তেমনি, এহেন পুত্রকে আর দেখিতে পাইব না, ভাবিলে কোন জননী নীরবে সে শোক সহ্য করিতে পারেন ? শচীদেবী হৃদয় বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিমাই এত তত্ত্ব কিছু বুঝে নাই; সে আব্দার করিয়া আহ্বাদি করতঃ পাড়ায় খেলাইতে গিয়াছিল। যখন জননীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল, পাড়ার লোক যখন বিশ্বরূপের জন্ত হায় হায় করিতে লাগিল, তখন সে বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিল, পিতাকে বিষম এবং মাতাকে তদবস্থ ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া সে প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর সকলের মুখে দাদার সম্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল, দাদার অদর্শনজনিত দুঃখে সে একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

বিশ্বরূপ ত গিয়াছে, শেষে কি তাঁহাদের সবে ধন নিলমণি নিমাইকেও হারাইবেন ? সদা সর্বদা তাঁহাদিগকে মুহূমান দেখিলে পাছে নিমাই দাদার শোকে আরও কাতর হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে, এইজন্য জনক জননী অন্তরে গুমরিয়া মরিলেও বাহ্যিক আর কোনও প্রকার শোক প্রকাশ করিলেন না। মুচ্ছিত নিমাইকে শুশ্রূষা করিয়া সাস্থ্য করিতে লাগিলেন, প্রগাঢ় ভ্রাতৃবৎসল নিমাই বাহাতে আর শোকাভিভূত না হয়, তাহার জন্য নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের বয়স এখন ছয়-সাত বৎসর। ইহার মধ্যে নিমাই অতিশয় লেখা পড়া শিখিয়াছে, ছেলে ঠিক তোতাপাখী, একবার যা শুনে তাই-শিক্ষা করে; পুস্তক একবার পড়িলে আর দ্বিতীয়বার পড়িতে হয় না, সমস্তই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়।

নদের নিমাই

নিমাই যেন জাতিশ্রম, পূর্বজন্মের কথা সমস্ত তাহার মনে উদয় হয়, তাই এই অল্প বয়সে বাহা-পড়ে, যাহা শুনে, তাহা একেবারে পাষাণে অঙ্কিত হইয়া যায়। নিমাইয়ের মেধাশক্তি দেখিয়া অধ্যাপকেরা আশ্চর্য্য হন, বলেন—এমন বুদ্ধির প্রাথবা, এমন মেধাশক্তি, তাঁহারা মাহুষে কখনও দেখেন নাই। এই অল্প বয়সে নিমাই অনেক বয়স্ক পণ্ডিতকে হার মানাইয়া দিয়াছে। বিশ্বরূপের বুদ্ধি বৃত্তিও প্রায় এইরূপ ছিল, সেও অল্প বয়সে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। নিমাইও কি আবার তাই হইবে, এ যে তাহা অপেক্ষাও মেধাবী! পণ্ডিত জগন্নাথ পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন—ইহাকে আর বেশীদিন লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে এও আমাদিগকে কঁাদাইবে।

একদিন বহিবাটীতে আসিয়া জগন্নাথ নিমাইকে ডাকিলেন, পুত্র কাছে আসিলে পিতা তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুষন করতঃ বলিলেন—“বিশ্বস্তর! আমি তোমারই বাড়ীতে থাকি না, তোমাকে আর বিদ্যালয়ে গেলে চলিবে না; পাঠ বন্ধ করিয়া তোমার গর্ভধারিণীর কাছে ঘরে থাক, আমার মাথার কীরে বাবা, তুমি একথা অবহেলা করো না।”

পিতৃভক্ত নিমাই পিতার কথা এড়াইতে পারিল না। সে বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়িয়া দিল, ঘরে রহিল কিন্তু খেলায় উন্নত; জননীর নিকট বসিয়া থাকি, কি জননীর কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, কি শোকে সাহসনা দেওয়া, তাহা হইত না। প্রথম প্রথম জুই একদিন সে বাড়ীর নিকট সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করিত, তারপর

মাদের নিমাই।

যতদিন ঘাইতে লাগিল, নিমাই ততই এ পাড়া সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এমন জলকেলী করিত যে, অন্যান্য স্নানার্থীগণ অস্থির হইয়া পড়িত। সে জলে ডুবিয়া কাহারও পা ধরিয়া টানিত, কাহারও কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিত, কাহারও পূজার দ্রব্য কাড়িয়া নিজে খাইত, অপর বালককে দিত। কেহ আসিয়া সে বিষয় জননীর নিকট অভিযোগ করিলে, শচী বাৎসল্যভাবে বলিতেন—“হাঁরে নিমাই, একে জলে মরছি, তার উপর তোর জন্য লোকের কত কথা শুনবো, হাড় যে কালী হলোরে” এই বলিয়া বেত লইয়া যেমন মারিতে আসিতেন, নিমাই অমনি দৌড়িয়া গিয়া ছুতা হাঁড়ির উপর বসিত, গায়ে ভাত মাখিয়া জননীকে আরও জ্বালাতন করিত। নিমাই জানিত—তাহার জননী গুচিবাঈগ্রস্তা, কিছুতেই তাহাকে ছুঁইবেন না।

নিমাইয়ের এই সকল অত্যাচার দেখিয়া শচীদেবী বলিতেন—“এতদিন পরে একটা পাগুলা ছেলে হয়ে, আমার হাড় কালী কল্লে, হাঁরে নিমাই! তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, পণ্ডিতের ছেলে, তোর এমন আচার—ছি ছি, লোকে কি বলবে, তুই জাতিকুল খেতে এসেছিস্ বুঝি? নেমে আয়, চল গঙ্গায় ঘাটে স্নান করে আসবি।” নিমাই জননীকে কিছু নরম হইতে দেখিয়া বলিত—“তুমি হাতের বেত আগে ফেল, তবে যাব।”

শচীর ইচ্ছাত নয় যে পুত্রের কোমল অঙ্গে আঘাত করেন, ও শোণার অঙ্গে কুসুমঘাতই সহ্য হয় না—তা বেত্রাঘাত; তবে ভয় না দেখাইলে ছেলে বশ হয় না, আর প্রতিবেশীরাও শাসন দেখিতে পায়

নদের নিমাই ।

এই জন্য । জননী বেত ফেলিয়া দিলে নিমাই গঙ্গাভিমুখে দৌড়াইত, পাচী সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া গায়ে কোথায় ভাত লাগিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিতেন, নিমাই তাহা খুঁটয়া স্নান করিয়া উঠিলে, পাচী নয়নানন্দ পুত্রকে মুছাইয়া দিয়া কোলে লইয়া মুখচুষন করতঃ বলিতেন—“এত দুবস্তপনা কেন কর বাবা । দেখছ না, শোণাব অঙ্গ ক্রমশঃ ফালামাথা হচ্ছে ।” জননীও এইরূপ স্নেহেব তিবঙ্গাব শুনিয়া শিশু অভিমান হইবে স্বপ্নে শিবঃসংস্থাপনপূর্বক ক্রন্দন স্ববে বলিতেন—“তোমরা ঘবে বসিয়ে বেখেছ, পড়তে যেতে দাও না, আমি মূর্থ হচ্ছি, তাই তাব মত কাজ করছি ।” প্রতিবেশী বয়সীগণ শোণাব ঙাদ নিমাইয়ের মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া বলিত—“ঐ দেখলো শচী ছেলেকে কি তোব যে সে, তবে তোবাই ওব মাথা খাচ্ছিস্, সত্যি তো, ছলে যবে বসে থাকলে দৌবাঙ্গি কর্কে নাত কি ? ও যখন পড়তে চাইছে, তখন তোদের পড়তে না দেওয়া ভাল নয় ভাই ।”

“হাবে, যদি এত পড়বাব ঝোক, তা কর্তাকে বলনি কেন বাবা”, শ্রীয়া জননী পুত্রের ছল ছল নেত্র অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া বলিলেন—‘আচ্ছা, আজ তিনি আসুন, আমি পুনরায় তোমার পড়ার বন্দোবস্ত করছি, তাহা হইলে দুবস্তপনা ছাড়বে ত ?’ নিমাই সেই কাদ কাদস্ববে বলিল—“ছাড়ি কিনা দেখ না !”

জননী পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন । সমস্তদিন দৌদাদৌড়ি করিয়া নিমাই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল । জননীর স্নানীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল । বাৎসল্য প্রতিমা সৌভাগ্যবতী শচীদেবী, নিমাইয়ের সেই অতুলনীয় মুখচক্ষুমা

নদের নিমাই ।

দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতেন। এইজন্য জগন্নাথ তাহাকে পড়া ছাড়াইয়া পত্নীর সান্ত্বনার জন্য ঘরে রাখিয়াছিলেন, কোলের ছেলে কাছে কাছে থাকিলে শচী বিশ্বরূপের শোকে অধীর হইবেন না। কিন্তু একি সেই ছেলে, এ ছেলের যে চিরকালই পিতা-মাতাকে জ্বালাতন করা অভ্যাস। অভ্যাস কি সহজে ভুলা যায় ?

নিমাইয়ের মুখ দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হইত, সেই মুখের মধুর বুলি শুনিলে কথাই নাহি। শচী যখন রাগাইয়া চাঁদ বদনের মধুর বুলি শুনিবার সাধ করিতেন, নিমাই তখন মুক হইয়া থাকিত, কিছুতেই কথা কহিত না। চাঁদ দেখিয়া প্রাণের আকাজক্ষা মিটাইবার সাধ ও মিটিত না, পুত্র ধরা দিত না, কেবল এ পাড়া, সে পাড়া করিয়া বেড়াইত, তাই কতক্ষণে সে নিদ্রা যায়, শচী তাই প্রার্থনা করিতেন। নিমাই ঘুমাইয়াছে, জননী পুত্রের অতুলনীয় মুখ খানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বিশ্বরূপের শোক হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলেই শচীদেবী যেমন করিয়াই হউক নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া এইরূপে ঘুম পাড়াইতেন। অনলে জলসেকের তায় তাঁহার পুত্রশোক ও ক্ষণিকের জন্ত নির্বাপিত হইত।

পুত্র বলিয়াছে—“বিদ্যালয়ে দিলে আর সে দুরন্তপনা করিবে না, শাস্তশিষ্ট হইয়া ঘরে থাকিবে।” আশা পাইয়া শচীদেবী স্বামীর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, যাহাতে পুত্র পুনরায় টোলে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিলেন।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে জগন্নাথ নিজকে ধন্য মনে করিলেও বাৎসল্য স্নেহের নিমিত্ত দারুণ শোকের আবেগ তাঁহার হৃদয়কে সময়ে সময়ে

নদের নিমাই।

এমন যজ্ঞা প্রদান করিত যে, তাহা তিনি সহ্য কবিতেন পারিতেন না। গৃহবহিঃগমন কবিতা, বন্ধুবান্ধবগণের নিকট যাঁইয়া, নানা প্রকার শাস্ত্র-চর্চায় কাল কাটাঁইয়া আসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া জগন্নাথ প্রাণেব পুত্র নিমাইকে লইয়া শচীর সহিত কত সুখ দুঃখের কথা কহিতেন।

আজও সেইরূপ সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়া প্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন কবতঃ নিমাইকে ডাকিলেন। পিতার ডাক শুনিয়া নিমাই আনন্দের পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ কবিতা নাচিতে নাচিতে নিকটে গমন কবিল, শচীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিতা বলিলেন—“ছেলের কথা শুনেছ?” জগন্নাথ নিমাইকে বকে তুলিয়া বলিলেন—“না কি বলে পাগলা ছেলে?”

শচী। নিমাই বলে কি, আমাকে পড়িতে দিলে আর কোন বদমায়েদী কর্কে না, নতুবা আরও বাড়াবে।

জগন্নাথ। সত্যি, হাঁরে নিমাই, এইজন্য এত দৌরাভ্যা কর বাবা?

পুত্র পিতার বকে মুখ লুকাঁইয়া নীরব রহিল। শচী বলিলেন—“আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি, কাল সকালে তোকে বিদ্যালয়ে পাঠাব, তাই আজ বৈকালে আর কিছুই করে নাই, কোথাও যায় নাই, বাড়ীতেই ছিল।

জগন্নাথ। যদি তাই একান্ত ইচ্ছে, তবে কাল থেকে আবার পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে যেও। পিতার আজ্ঞা পাইয়া বালক আশ্বস্ত হইল; যেন কত সুখীর ছেলেটির মত রাত্রে পিতামাতার কোল আলো কবিতা অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

উপনয়ন ।

পূর্বদিন হইতে নিমাই আবাব পড়িতে আবস্ত করিল। এইবাব নিমাই প্রাণপণ যত্নে পাঠে মনোযোগ প্রদান করিয়া অতি সামান্য দিনেব মধ্যে এক অসাধারণ ব্যাপ্তিশালী পণ্ডিত হইয়া উঠিল। নিমাইযেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া নদীয়াব পণ্ডিতমণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই নিমাইয়ের প্রতিভা এত সুন্দর ভাবে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিলে, কালে যে সে একজন দিক্‌গজ পণ্ডিত হইয়া নবদ্বীপ উজ্জল করিবে, সে বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল। পুন্নেব স্বয়শ-মহত্বে পিতামাতাবও প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া গেল।

এইরূপে আবও তিন বৎসব অতীত হইয়া নিমাই যখন নবম বৎসরে পদার্পণ করিল, সেই সময় জগন্নাথ তাহাব উপনয়ন দিবাব ব্যবস্থা করিয়া পূজনীয় শ্বশুর নীলাধর চক্রবর্তী মহাশয়কে নিজের অভিপ্রায় অবগত করাইলেন। জগন্নাথ সমাজে হাজার প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেও নীলাধরকে না জানাইয়া কোন কার্য করিতেন না, কাবণ নবদ্বীপধামে তাঁহার এ প্রভাব প্রতিপত্তির মূল একমাত্র নীলাধর ভিন্ন আর কেহ নহে।

নীলাধর দৌহিত্রের উপনয়নে কিছু ব্যয় বাহুল্য করিবেন—কারণ তিনি এই সোণার খোকাটিকে বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

নদের নিমাই ।

তবে উভয় পক্ষে নানাপ্রকার মনোকষ্টের জন্ম তিনি জামাতার নিকট এ কথা উপাধন করিতে সাহস করেন নাই । এখানে জগন্নাথ যখন নজেই পুত্রের উপনয়ন দিবাব জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন “তনিইবা এই শুভ ঘটনায় আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িবেন কেন ? হাহাব অবস্থা ত অসচ্ছল নহে ?

দেখিতে দেখিতে আবার মায়াপুবে জগন্নাথের পবিত্র প্রাঙ্গণে আনন্দের তলুধরনি পড়িয়া গেল । শচীদেবী দুই একবাব জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকে মূহমান হইয়া শোকাক্রান্ত বিসজ্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু যখন প্রতিবেশী বমণীগণ “নিমাইয়ের এ স্নুথের দিনে চক্ষের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিতে নাই” বলিয়া নিষেধ করিল, তখন শচীদেবী সমস্ত শোকছুঃখ ভুলিয়া প্রাণের পুত্র নিমাইয়ের উপনয়নোৎসবে যোগদান করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ।

যথা সময়ে আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়া এ আনন্দে যোগদান করিল । গুরুদেব বিষ্ণু শর্মা ও পুত্রোহিত স্মদর্শন ভট্টাচার্য আসিয়া এ মাতুলিক বাঘ্যেব অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের মাতামহ এবং মাতুলদ্বয় যজ্ঞেশ্বর ও হিবণ্য পূর্ব হইতেই আসিয়া কাজকর্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ।

জগন্নাথ পুত্রের উপনয়ন দিবাব মনস্থ করিয়া পিতামাতার নিকট গ্রীহষ্টে গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু সাতিশয় বার্কক্য হেতু তাঁহারা এ দূবদেশে আসিতে রাজী হন নাই, কায়মনে আদরের পৌত্র নিমাইকে আশীর্বাদ করিয়া জগন্নাথকে এ শুভকার্য্য সমাধা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন ।

নদের নিমাই।

আদরের দোহিত্র নিমাইয়ের উপনয়নে নীলাশ্বর খুব জাঁকজমক, উৎসবামোদের খুব ঘটা করিয়াছিলেন। যখন নিমাইয়ের গাত্রহরিদ্রা হইল, পাড়ার পাঁচজন স্ত্রীলোকে যখন নিমাইকে অঙ্গনে আলিঙ্গিত দেওয়া পীড়ির উপর বসাইয়া শ্রীঅঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখাইতে লাগিল, তখন সেই কাঁচা মোগার মত গৌর অঙ্গ, নিমাইয়ের রূপের যে কি ওজ্জ্বল্য বুদ্ধি পাইয়াছিল—তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা অসাধ্য। চারিদিকে বাদ্যোদ্ধম হইতে লাগিল, তারপর কর্ণবেদ ও উপনয়ন দানের নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুগুন করতঃ রক্তবস্ত্র পরিধান করান হইল। নবীন ব্রহ্মচারীর সেই অপূর্ণ রূপ যে দেখিল, সেই বিমুগ্ধ চিত্তে বার বার দেখিবার জন্ত এদিক ওদিক উঁকি মারিতে লাগিল। যেন সে সুষুম্নাগণ্ডিত অপূর্ণ রূপ নয়নের অন্তরাল করিতে কাহার ইচ্ছা হইতেছে না। এ ভুবনমোহন রূপ যে দেখিল—সেই মজিল, গৌরচন্দ্রের এ রূপ সাগরে ডুবিয়া আপনহারা হইল।

“শাক্তএব ঘেজা সৰ্ব্ব” তারপর যখন গলদেশে উপবীত প্রদান করিয়া ঋগ্নাথ পুত্রের কর্ণে মহাশক্তি স্বরূপা বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন কি জানি কি ভাবাবেশে নিমাই বিভোর হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শক্তিমন্ত্রের প্রবল শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বুকি তাঁহার পূর্বকথা স্মরণ হইল, মহাশক্তি শ্রীরাধার প্রেমশ্রবণ সুধিবার জন্য তাঁহার এ জন্মের জন্মবৃত্তান্ত বুকি মনে পড়িয়া গেল? এই শক্তিমন্ত্রই যে তাঁহার এ জন্মের প্রধান আরাধ্য ধন, ইহাইত তাঁহার ইষ্ট, ইহাইত তাঁহার জপমালা। অসীম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নিমাই তর্জন

নদের নিমাই ।

গৰ্জ্জন করিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন । এই ভাব দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল ।

নিমাই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ ছুটী একবার “ভবতী ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি অবলম্বন করিলেন । সেই সময় দেশের লোক আসিয়া এই অতুলনীয় নবীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া ধন্য হইল । এইবার জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে কোলে করিয়া একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন । তখনকার নিমাইয়ের মুখভাব দেখিয়া নিমন্ত্রিত অধ্যাপক গুণ্ডলী আশ্চর্য্য হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—আমরা ত অনেক উপনয়ন দিয়াছি, কিন্তু উপনীত বালকের এমন ভাব ভঙ্গি ত কখনও দেখি নাই ? আজ যেন কশ্যপের গৃহে বামনদেবের উপনয়ন দেখিয়া জন্ম সার্থক করিলাম ।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই রাধা ভাবে গড়া বালকটার দেহে রাধাশক্তির অপূৰ্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া, সেই শ্রীঅঙ্গে শ্রীমাদ্ভক্তের পূর্ণ মিলন দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে, কেহ “রাধাশ্যাম”, কেহ গৌরহরি, ইত্যাদি নানাপ্রকার রুচিপ্ৰদ নামকরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ আনন্দে আত্মহারা হইতে লাগিলেন । অদ্বৈতাচার্য্যত বহুদিন হইতেই এই অনুমান করিয়া নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিতেন । ভগবান যে তাঁহার প্রাণের ডাক শুনিয়া নববৃন্দাবন নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বালককে দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সেইরূপ ভাবোচ্ছাস হইত, আবার সময়ে সময়ে দিশাহারা হইয়া সঙ্গিহীনভাবে বলিতেন—সত্য কি তাই ?

উপনয়নের পর নিমাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেদমাতা গায়ত্রী

নদের নিমাই ।

মন্ত্রজপে অসীম শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন—তাহার ব্রহ্মতেজ কুটিয়া বাহির হইতে লাগিল । মহাশক্তি গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও মহাশক্তি শ্রীরাধার ধ্যান এবং ইষ্টরূপে ঐ মন্ত্র জপ করিয়া নিমাই বিভোর হইয়া পড়িতে লাগিলেন ।

পুত্র এখন খুব সং হইয়াছে । তাহার সে পাগলামী, সে দুরন্তপনা আর নাই দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীর দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল । পুত্রের যশে নবদ্বীপ ভরিয়া গিয়াছে, আজকাল আর নিমাইয়ের সুশশ-সুনাম ব্যতীত, কুশ-কুনাম কেহ কীর্তন করে না । সকলেই বলে—নিমাই ছেলে বেলায় যেমন দুরন্ত ছিল—এখন তেমনি মাটির পুতুল হইয়াছে ; সাত চড়ে একটি কথাও কয় না ।

নিমাই গুরু-পুরোহিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । অত্যন্ত ছাত্র বাহা ছয় মাসে শিখিতে পারে না, নিমাই কয়েকবার দেখিবামাত্র তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে । অধ্যাপকগণ সকলে তাহার এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে বলিতে লাগিলেন—আমরা জীবনে কখন এমন ধীশক্তি সম্পন্ন ছাত্র দেখি নাই—নিমাই নিশ্চয়ই কোনও শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ । অসীম কষ্ট সহ করিয়াও পিতামাতা যদি পুত্রের সুখ্যাতি শুনিতে পান—তাহা হইলে স্বর্গস্থও তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ । পুত্রের এমন হিতকারী বন্ধু জগতে আর কে আছে ?

শচী-জগন্নাথের আনন্দের সীমা পরীসীমা নাই । পুত্রের প্রস্তুতিত পদ্মের মত রূপ, চুয়া-চন্দন ব্রক্ষিত গাত্রের আভ্রাণ ও অমাহুষিক বুদ্ধি ও তেজপ্রভা দেখিয়া জগন্নাথ প্রতিদিন গৃহদেবতা রথুনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেন—“ঠাকুর ! পুত্রটিকে সংসারী কর—তাহাকে

নদের নিমাই ।

দীর্ঘজীবী কবিয়া বংশের মান বৃদ্ধি কর—যেন তাহাকে কোন অপদেবতায়
স্পর্শ কবিয়া আমাদের এ সাথেব নন্দনে, জীবন-প্ৰীতিকর এ শোভন
উদানে বিষেব বাতি জালিয়া না দেয় ।” নিমাই এক একদিন অলঙ্কিতে
পিতাব এই কাতব প্রার্থনা শ্রবণ কবতঃ লজ্জাব হাসি হাসিষা চুপে
চুপে স্থান ত্যাগ কবিতেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

পিতৃবিয়োগ ।

মানবের ভাগ্যে সুখ চিরকাল থাকে না । চক্রবৎ পরিবর্তনে সুখের স্থান দুঃখের দাক্ষণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মর্মদাহের করুণ আর্ন্তনাদ মুখরিত করিয়া ফেলে ।

নবদ্বীপে নিমাইয়ের প্রগাঢ় যশঃপ্রতিষ্ঠায় শচীদেবী যখন জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের শোক-যন্ত্রণা একরূপ বিম্বৃত হইতেছিলেন, কনিষ্ঠের যশসৌরভ যখন তাঁহার হৃদয় হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনজনিত শোকানল ধীরে ধীরে মন্দীভূত করিতেছিল । ঠিক সেই সময়ে এক বিষম দুর্দ্দৈব আসিয়া শচীর অন্তর কন্দর দাক্ষণ তমসচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সকল উজ্জ্বল, সকল উৎসাহ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল—সে দুর্দ্দৈব জগন্নাথের মৃত্যু ।

যখন নিমাইয়ের বয়স প্রায় একাদশ বৎসর এবং শচীদেবী পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়াছেন—জগন্নাথের বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইবে । এই সময়ে তাঁহাদের সংসারে আবার বড়ই অভাব—অনাটনের সূত্রপাত হয় । বিশ্বরূপের সম্যাস গ্রহণের পূর্বে এতটা ছিল না, কারণ গ্রামে কোন কাজ পড়িলে তিনি দেখিতে পারিতেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও হইত কিন্তু বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলে জগন্নাথকে নিজ গ্রাম ও ভিন্ন গ্রাম এবং দূরবর্তী স্থানে কোন কাজকর্ম

নদের নিমাই।

পড়িলেও করিতে হইত ; কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, সময়ে স্নানাহার হইত না ; বিশ্রাম করিবারও তত সময় পাইতেন না।

এক হিসাবে পরিশ্রম যেমন স্বাস্থ্যেরও উপকারী, আর এক হিসাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমও তেমনি অতুপকারী—ইহাতে অকালে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহার উপর চিন্তার আধিক্য থাকিলে ত কথাই নাই। “চিন্তা জরো মহুস্থানাম্” চিন্তা যেমন মৃত দেহকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে—চিন্তা তেমনি জীবিত দেহকে ধীরে ধীরে অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া কালের কোলে তুলিয়া দেয়।

ভাবিয়া ভাবিয়া জগন্নাথের দেহ ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে ভীষণ জরাস্বর তাঁহার সুন্দর বপু আশ্রয় করিয়া দিন দিন ক্ষয় করিতে লাগিল। জগন্নাথ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক ডাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অকালে জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিল, শচীদেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই তখন একপ্রকার মুখধরা হইয়াছেন ; ভালমন্দ, কৰ্ত্তব্য অকৰ্ত্তব্য সে এখন বেগ বুঝিতে পারেন—পিতার এই শেষ সময়ে তিনি জননীকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অন্তিমের মঙ্গল কামনার জন্য পরামর্শ দিলেন, বলিলেন—“মা ! কাঁদিতে ত হইবেই—যাহা যাই-তেছে, তাহার বিহনে কান্না ত সঙ্গের সাথী ; তবে পিতা যে আমাদের জন্ম আজীবন পরিশ্রম করিলেন, এত করিয়া আমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান করিলেন, এখন তাঁহার এই অসুখে কিছু পথের সম্বল দাও,

নদের নিমাই।

কাঁদিবার সময় এ নয়—চল, তাঁহার পারত্রিক শুভকর্মের আয়োজন করি।” এই বলিয়া নিমাই পিতার রোগজীর্ণ দেহ বক্ষে করিয়া খাটের উপর তুলিলেন; তার পর মাতা-পুত্রে ধরাধরি করিয়া পরকাল সম্বল হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত পাবনী সুরধুনীর কুলে আনয়ন করিলেন।

পরম পণ্ডিত ধার্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথের অন্তিম ক্রিয়া সমাধা করিতে লোকজনের অভাব ছিল না। যে শুনিল, সেই মম্বাহত প্রাণে জগন্নাথের মহাযাত্রার অনুগমন করিল কিন্তু নিমাই সে পবিত্র দেহ আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেন নাই। জননীসহ নিজেই তাহা সুরতরঙ্গিনী গাঙ্গিনী তীরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

তখন নদীতে জুয়ার আসিয়াছে, গঙ্গা কুলে কুলে ভরিয়া যেন জগন্নাথের পবিত্র দেহ বক্ষে করিবার জন্য তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। পরম জ্ঞানী জগন্নাথ মায়ের কুলে আসিয়া করবোড়ে সেই যোগীজন নিদেবিত পদে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রয়াণের কথা ভাবিয়া, এ মায়াময় সংসারের এমন পতিব্রতা স্ত্রী, এমন কুলপাবন পুত্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া জগন্নাথের কিছুমাত্র মালিঙ্গ নাই, বদন সেইরূপ পূর্ণ দীপ্তিমান, হাস্যাস্যযুক্ত। পরম জ্ঞানী জগন্নাথ জানেন—মৃত্যু জীবের অবস্থান্তর মাত্র, বাল্য যৌবন-প্রৌঢ় যেমন অবস্থা—এক যায়, এক আসে; আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন করে—ইহাও সেইরূপ।

গতধারিণী জননীর কোলে নিদ্রা আর পরম পাবনী প্রকৃতি জননীর কোলে চিরনিদ্রা। জননীর কোলে নিদ্রার জাগরণে এই আকাশ,

নদের নিমাই !

এ বাতাস, এই দেহ, এই গেহ, এই সব দেখা যায় ; আর বিশ্বপ্রকৃতির নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে নূতন আকাশ, সে দেশের নূতন বাতাস—আর মণিময় গৃহে পরম প্রকৃতি বিশ্বপ্রসূতির কোটা পূর্ণচন্দ্রসম প্রভামণ্ডিত বদন দেখিয়া জীব ধ্বংস হয়। যাহার হৃদয়ে এ পরম জ্ঞানের দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, যে বুঝিয়াছে—মৃত্যু নবজীবন লাভ ব্যতীত আর কিছুই নয়—তবে সে তাহার ভয়ে ভীত হইবে কেন ? ক্রমশঃ দ্বিতীয় প্রহরের সময় জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিল। তিনি প্রাণের নিমাইকে চক্ষের সম্মুখে বসিতে বলিলেন—স্নেহের আলিঙ্গন দান করিয়া—তাহার হাতটী নিজের বুকে রক্ষা করিলেন। নিমাই পিতার অবস্থা দেখিয়া আর শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পার্থিব দেবতা, পরম গুরু পিতার চরণ দুইটী ধারণ করিয়া সজোরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন—“বাবা ! সত্য সত্যই যদি অভাগাকে ফেলিয়া চলিলেন, তবে আমার দশা কি হইবে ? আমি যে এত দুঃস্থপনা করিয়াছি, আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্ত স্নেহ অভিজুত হইয়া আমাকে একটি দিনের জন্তও শাসন করেন নাই—কেবল ভয় দেখাইয়াছেন মাত্র। পাছে আমার কিছু অমঙ্গল হয়, তজ্জন্ত দেবতার স্থানে কত প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এখন আপনার সেই দুঃস্থ নিমাইকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন ?”

শেষ নিশ্বাস পড়িতে আর বেশী বাকী নাই, তথাপি জগন্নাথ অতি ধীরে ধীরে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন,—“অশান্ত বালক অশান্ত হইয়াছে, নিজের জননী, জন্মভূমি বুঝিয়াছে, তাই তাহাকে গৃহদেবতা রঘুনাথের পদে সমর্পণ করিয়া চলিলাম, বাবা ! তুমি আমাকে বিশ্বত

নদের নিমাই ।

হইও না ।” তাবপর পতিব্রতা সতী শচীদেবী এখন পদে ধবিয়া অশ্রুনাঁবে শেষ অভিষেক করিতে লাগিলেন, জলভরা নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া যখন স্বামীর বদনেব প্রতি চাহিয়া স্বামা চাহিতে লাগিলেন, তখন জগন্নাথ প্রণয়পূত সাস্তনাচ্ছলে বলিলেন—“সতী, আমি আজীবন তোমাব সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কখন কোনও দোষ দেখি নাই, তোমাব পবিত্র সহবাসেই আজ আমাব স্বর্গ লাভ হইবে, ভয় কি দেবী, জগতের দুর্লভরত্ন নিমাই রহিল ।” এই বলিয়া ধার্মিক জগন্নাথ সবলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ কবিত্তে কবিত্তে ইহধাম ত্যাগ করিলেন ।

জগন্নাথের বিয়োগে নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা শোক-সমাচ্ছন্ন হইল । স্বামী বিয়োগে পতিব্রতা পত্নীৰ অবস্থাব বিষয় বর্ণনা কবা দুঃসাধ্য । শচীদেবী চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । তিনি বহু শোক পাইয়াছেন, পুত্রকণ্ঠার শোকে তিনি জর্জরবিভূতা হইয়া রজনীগন্ধা পরমবল স্বামীর বলে একপ্রকার দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু আজ এই দুর্কিসং স্বামীশোক তাঁহার অমন সুন্দর দেহ ভাঙ্গিয়া চূড়ম্বাব করিল, শচীদেবী একপ্রকার কুজ্জভাব ধারণ করিলেন । তথাপি পাছে দুঃখেব বালক নিমাই এই দারুণ পিতৃশোকে অধীর হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে, এইজন্য অন্তবে বিষম আঘাত পাইলেও তিনি বাহ্যিক কিছু প্রকাশ কবিলেন না । স্বামীর আজ্ঞায় নিমাইকে বুকে লইয়া শোকজ্বালা জুড়াইতে লাগিলেন ।

বাট বাঘাট বৎসবে মৃত্যু তখনকার খুব অকাল মৃত্যু ধবিত্তে হইবে । জগন্নাথের এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই মর্দাহত, তাঁহার

নদের নিমাই ।

ত বয়োজ্যেষ্ঠ এখন বর্তমান, কাজেই জগন্নাথের অস্তেষ্টিক্রিয়া বড় স্থখের হইল না । তবে শচী ও নিমাইকে গুচি করিবার জন্ত সামান্য রকম বৈদিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইল । নিমাই ও শচী তাহার পরলোকগত আত্মার সঙ্গতি প্রার্থনা করিয়া দশম দিবসে অশোচান্ত করিলেন, অবস্থানসারে রুমোৎসর্গের ব্যবস্থা করিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজন কার্য্যও যথাসম্ভব সমাধা করা হইল ।

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধার পৰ শচী পিতৃভক্ত পুত্রকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন । কোথায় তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া হৃদয়ের দারুণ ব্যথা নিবারণ করিবেন, না নিমাইকেই দারুণ শোকে মুহমান দেখিয়া, হৃদয়ের দ্বারা তাহার হৃদয় চাপিয়া অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন ; কোমল হৃদয় নিমাইকে নানা প্রকার সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পিতার স্মৃতিভিষিক্ত হইয়া পুত্রের সেবা করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না ।

তখনকার কালে তাঁহাদের সংসারের ব্যয় অতি অল্প ছিল । জগন্নাথের মৃত্যুর পর অতিথি অভ্যাগত বড় কেহ আসিত না, কাজেই এক প্রকার দুঃখে কষ্টে কাল কাটিয়া যাইত । তবে নিমাইকে আর ঘরে বসাইয়া রাখা হইবে না, তাহা হইলে শোক আরও বেশী হইবে ; কিন্তু তিনি পত্নীহীনা নিঃসহায়া স্ত্রীলোক কি করেন, একদিন অধ্যাপক মহাশয়কে অগ্নয় বিনয় করিয়া ধরিলেন । অধ্যাপক গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য অতীত আত্মাদের সহিত পুনরায় পিতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করিলে স্বদনী নিশ্চিন্ত হইলেন ।

নিমাই এখন খুব অমায়িক প্রকৃতির বালক হইয়াছে । তাহার

নদের নিমাই !

ছাত্রকে পড়াইতে পারিলে অধ্যাপকের খোন্স নাম হইবে, নিমাই এখন পড়ায় বেকরপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ; তাহাতে শীঘ্রই সে সৰ্বশত্রু বিশারদ হইবে, অধ্যাপকের মুখোজ্জল করিবে। জননী আজ্ঞা নিমাই গঙ্গাদাসের নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন, গঙ্গাদাস তাঁহাকে অভয় দিয়া “তুমি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হও” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য ।

বাগযুক্ত হইয়া কাব্য কবিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যস্বার্থ । নিমাই পিতৃবিয়োগেব পব জননীৰ সাহায্যে পুনৰায় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রতিষ্ঠ হইয়া এমন মনোযোগ সহ পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, শ্বতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত লইয়া উঠিলেন ।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে গঙ্গাদাসের মত পণ্ডিত আব কেহ ছিল না, কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে নিমাইয়ের তর্ক-যুক্তিতে বিপন্ন হইয়া পড়িতেন । নিমাইয়ের বয়স সে সময় ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, টোলে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ছিল । অলঙ্কারে কমলাকান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রে কৃষ্ণানন্দ বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । নিমাই ইহাদের সচিত তর্ক কবিত্তে অগ্রসর হয়েন কিন্তু তাঁহারা নিমাইকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেও তিনি ছাড়িতেন না । রঘুনন্দন স্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বয়সে কিছু ছোট বলিয়া নিমাই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, মুরারিগুপ্ত নামক আর একজন ছাত্রের সচিত নিমাইয়ের অহরহঃ তর্কযুদ্ধ চলিত, মুরারি তাঁহার সচিত পারিয়া উঠিতেন না : লজ্জিত হইয়া হার মানিলে নিমাই সাধনাচ্ছলে তাহার গাজে শাত বুলাইলে মুরারির দেহ কণ্টকিত হইত, কি এক স্বর্গীয় প্রেমপুলকে

নন্দের নিমাই ।

মন প্রাণ পুলকিত হইত । কত লোকের কত কোমল হস্ত তাহার দেহে স্পর্শিত হইয়াছে ; অধ্যাপকগণের কত সুন্দর হইত, কত সুখানুভব তিনি করিয়াছেন, কিন্তু কই এমন শাস্তি, এমন আনন্দ, প্রাণে এমন একট উন্মাদনা ত কাহার স্পর্শে পান নাই ; তবে এ বালক কে ? বালাকানন্দে নিমাইয়ের সহিত তাহার সময়ে সময়ে কত কলহ, কত বিবাদ হইত, এখনও তাহাই হয় । মুরারি ভাল করিয়া বুঝিলেন, ভাল করিয়া দেখিলেন, নিমাইয়ের সেই অগ্নান সরোজ সন্নিভ বদনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ভাবিলেন—একি মাতৃষের মুখ ? এত সুন্দর, এত মনোরম !

যে দিন হইতে মুরারি নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন । সেইদিন হইতে নিমাই মুরারিকে আর কোন কথা বলিতেন না বা তাহার কাছে কোন তর্কযুক্তির বিষয় উত্থাপন করিতেন না । তিনি এখন অহোরাত্র অধ্যয়ন করেন, কোন শাস্ত্রই বাদ দেন না, দেখিতে দেখিতে তিনি সকল শাস্ত্র বিশারদ ও সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন । নবদ্বীপে এত অল্প বয়সে আব কাহাকেও এমন সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে দেখা যায় নাই ।

বৈকালে নিমাই স্বরধুনীর তীরে পদচারণা করিতেন, বহু পণ্ডিতেব সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইত, সকলেই সুন্দর বালকটির সৌজন্তে, তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রীতিলাভ করিয়া প্রাণের আশীর্বাদ প্রদান করিতেন । তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন, নিমাই হিন্দুর সকল শাস্ত্র এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, লোকের মনোমধ্যে ধর্মের ভাব এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল, যাহা অপরাপর কোনও পণ্ডিতের ছিল না । সমপাঠী ছাত্রগণেব সহিত তিনি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন, তর্কেরহলে কোনপ্রকার

নদের নিমাই।

দোষ করিলে বারাস্তরে তিনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। বৈষ্ণবগণের সহিত নিমাই কেবল তর্কযুদ্ধ করিতেন, তান্ত্রিকদের সহিত বয়সের অধিক্য বশতই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, তর্কযুদ্ধ বা কলহ করিতে যাইতেন না। কৃষ্ণানন্দ, কমলাকান্ত, মুরারি প্রভৃতি তাহার সচপাঠী কিন্তু মুরারি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তিনি শাস্ত্রের কুটতর্ক করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না।

নিমাই যখন ঘরে বসিয়া থাকিতেন, কাজকর্ম বেশী কিছু থাকিত না ; তখন তিনি ব্যাকরণের একখানি টিকা রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়িয়া তিনি যে বিশেষ বৃৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন—এই টিকাই তাহার নিদর্শন।

নবদ্বীপে কাহারও কোন পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করা কঠিন ব্যাপার হইলেও নিমাইয়ের এই টিকা অতি অল্পদিনের মধ্যে টোলসমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচনী হইয়াছিল। তাহা এত সরল ও সুন্দর হইয়াছিল যে, ছাত্রগণ সহজে তাহা বোধগম্য করিয়া ব্যাকরণের কঠিন সমস্যার সমাধান করি পারিত।

সকল শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। মিথিলা প্রত্যাগত ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্কভৌম সেই সময় নদীয়ার বিদ্যানগর গ্রামে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিমাই আপনার অসাধারণ প্রতিভার প্রোঞ্জল মহিমায় ব্যাকরণ, কাব্য, নৃত্য, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি বাবতীয় শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাসুদেবের

নদের নিমাই।

টোলে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অঙ্কশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইকে অতিশয় বালক দেখিয়া সার্কভোম প্রথমে কিছু অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন—নিমাই বালক, এত অল্প বয়সে সে গ্রামের কুটতর্ক কি উপলব্ধি করিবে? কিন্তু টোলের ছাত্রগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গ্রামের প্রধান ছাত্র রঘুনাথ এই বালকের অসাধারণ ক্ষমতা, তাহার মধুর চরিত্রের অমায়িকতা দেখিয়া মুগ্ধিয়াছিলেন, নিমাই সামান্য ছাত্র নহেন। জগতে সর্বপ্রধান হইবার জন্য তাঁহার যে আশা এতদিন হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, নিমাইকে দেখিয়া, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া সে আশা তিরোহিত হইল, চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে সকলে বিশ্বস্তর বলিয়া ডাকিত, মনের আশা মনে লয় হইলেও রঘুনাথ বিশ্বস্তরকে প্রাণেব সহিত ভাল বাসিতেন।

ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের উপর সার্কভোমেব নজর পড়িল, তিনি কাদেন তাঁহাকে পাঠ দিতে আসিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা য়া বুঝিলেন—বিশ্বস্তর সামান্য বালক নহে, সেইদিন হইতে বাহুদেব বিশ্বস্তরকে নিয়মিত পড়াইতে লাগিলেন। এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে নিমাই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এমন পরিপক্বতা লাভ করিল যে, সময়ে সময়ে সার্কভোমও তাঁহার সহিত যুক্তিতর্কে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন।

নিমাই তখন টোলের প্রধান ছাত্র মধ্যে গণ্য হইয়া অধ্যাপকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথও বহুদিনের পুরাতন ছাত্র, জ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দুইজনে অত্যন্ত প্রণয় হইল। নিমাই জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নের

নদের নিমাই :

সময় তাহার একখান টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মনেব ইচ্ছা, এই বিষয় কঠিন শাস্ত্র সবল কবিতা বাখ্যা করতঃ তাহার ব্যাকবর্ণের টীকাব গ্রন্থ সমাজে চালাইতে পাবিলে ছাত্রবর্গেব অনেক উপকার হইবে। কিন্তু ইহার পূর্বে বঘুনাথ দখিতি নামে গ্রন্থেব একখানি সবল ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

যখন তিনি শুনিলেন—বিশ্বস্তব ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতেছেন, তখন তাঁহার প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল, বিশ্বস্তব ইহাতে মনোযোগ দিলে গ্রন্থের পবিশ্রম যে ব্যর্থ হইবে, তাঁহার টিপ্পনী যে চলিবে না, তাহা বুঝিতে পাবিয়া একদিন বিশ্বস্তবকে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিলেন। বিশ্বস্তব বলিলেন—“হাঁ চেষ্টা করিতেছি।” বঘুনাথ একবার তাহা শুনিতে চাহিলেন, বিশ্বস্তব বলিলেন—“কল্যাণ শুনাইব।”

একদিন গুরুদেবেব বোনও কার্যোপলক্ষে তখন দুইজনে গঙ্গা পার হইতেছেন। তখন বিশ্বস্তব বলিলেন—“ভায়া! আমাব ন্যায়ের টিপ্পনী শুনিবে কি?” বঘুনাথ তাহাই চাহিতেছিলেন, আগ্রহ প্রকাশ কবিয়া বলিলেন—“শুনিব বৈকি।”

নিমাই পাঠ করিতে লাগিলেন, বঘুনাথ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কবিয়া বিবাদে মুখ লান কবিলেন। বঘুনাথ পণ্ডিতের বড় আশা ছিল—তাহারই রচিত গ্রন্থ জগতে সমাদৃত হইবে, কিন্তু বিশ্বস্তব যদি ইহা প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ কেহই স্পর্শ কবিলে না। বিশ্বস্তবের তুষ্ণনায় তাঁহার গ্রন্থ নগণ্য। পরিশ্রম বিফল হইল দেখিয়া বঘুনাথ কাদিয়া আকুল হইলেন। গ্রন্থ পাঠ শুনিতে শুনিতে বন্ধবর কাদিয়া ফেলিলেন, দেখিয়া নিমাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—“ভাই! একি,

নদের নিমাই ।

তুমি কাঁদিতেছ কেন, হঠাৎ কি কোন পীড়া হইল ?” রঘুনাথ সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“ভাই, পীড়া হয় নাই, আমার সকল আশায় ছাই পড়িল, আমিও একখানি এরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম কিন্তু তোমার যেরূপ স্নন্দর হইয়াছে, তাহাতে আমার পরিশ্রম পণ্ড, তুমি ইহা প্রচার করিলে আমার আদর হইবে না ।”

বিশ্বস্তর বলিলেন—“এই কথা, ইহার জন্য তোমার ক্রন্দন—ভাই ! এসকল শাস্ত্র আমার প্রচার করিবার ইচ্ছা নাই, যদি তোমার উপকার হয় ত হউক”, এই বলিয়া এতদিনের পরিশ্রমোপার্জিত অমূল্য গ্রন্থ খানিকে তিনি অগ্নানবদনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া সেইদিন হইতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চায় ইস্তফা দিলেন ।

নিমাই এখন আর কোথাও যান না, বাড়ীতেই থাকেন কিন্তু তাঁহার যশোসৌরভ, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি, এতদূর প্রচারিত হইয়াছিল যে, সূদূর মিথিলার সকলে নিমাইকে পণ্ডিত আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার স্ননাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন । নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত আর কেহ নাই, নবদ্বীপে তিনিই অদ্বিতীয়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে কেবল এই কথা ।

“বিদ্যা বিনয়ং দদাতি” এখন নিমাইয়ের সে চপলতা, সে ছুটামি আর নাই, তপনোদয়ে কুজ্জটিকার মত তাহা তিরোহিত হইয়াছে । নিমাই এখন মহা বিনয়ী, মহা অমায়িক প্রকৃতি লইয়া সকলের আশীর্বাদ ভাজন হইতে লাগিলেন । শোকাভুরা জননীর কাছে কাছে থাকিয়া নানা প্রকার আশার আশ্বাসে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যমহীন প্রাণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ।

নদের নিমাই ।

নিমাইকে মানুষ হইতে দেখিয়া, পুত্রেব যশে চারিদিক সমুজ্জল
বুঝিয়া শচীদেবী আবার আশায় বুক ঝাঁপিয়া সংসাবকার্যে পবিলিপি
হইলেন ।

— — —

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিবাহ ।

জননীর বিষাদ কালিমাময় বদন যখন পুত্রের স্নানম-স্নাত্যতিরূপ নৌভাগ্যস্বৰূপে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তাহার মলিন মুখে যখন আবার নব উৎসাহের অরুণিমা ফুটিয়া উঠিয়া অবিন্যস্ত গৃহপ্রাক্কনের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি আবদ্ধ করিল, নিমাই তখন ব্রহ্মচার্য ছাড়িয়া গুরুর আদেশে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিলেত গৃহিণী চাই, গৃহিণী না হইলে কেমন করিয়া গৃহী হওয়া যাইবে ? বিশেষতঃ জননী স্বামীহীনা, শোকাভুবা, তাহার সাহায্যের জন্য, তাহার সেবাতৎপর হইবার জন্য, সংসারের কাষা ও ধর্ম উপার্জনের জন্য একজন সধর্মিণী নিতান্ত আবশ্যক ।

শচীদেবীও পুত্রকে সকল গুণের গুণনিধি দেখিয়া তাহার অভিপ্রায়া-সুযায়ী বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের ন্যায় বিদ্যাবিভব সম্পন্ন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পাত্রের বিবাহের জন্য শচীদেবীকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইল না । শচীদেবী পুত্রের বিবাহ দিবেন অনিবামাত্র কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া নিমাইয়ের বাটীতে পড়িল । তাহার মধ্যে বনমালী ঘটকের ঘটকালিতে নিমাইয়ের শৈশবসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লাভাচার্য্যও আসিয়াছিলেন ।

পূর্বে বলিয়াছি—বাল্যকালে গঙ্গাতীরে নিমাই বল্লাভাচার্য্যের

নন্দের নিমাই :

আদরের হুহিতা লক্ষ্মীদেবীর সহিত খেলা করিতেন। এক্ষণে তাহাব সেই সরলতা, তাহাব সেই ধর্মভাব, তাহাব সেই সৌন্দর্য্য মাতাপুত্রের মনে যুগপৎ সমুদিত হইল। শচীদেবী বল্লভাচার্য্যাকেই আশ্বাস প্রদান কবিয়া বিবাহেব আয়োজন কবিতে বলিলেন।

বহুদিন পরে আবাব শচীর নিরানন্দময় অঙ্গনে আনন্দেব সাদা পড়িয়া গেল। নিমাইয়েব বিবাহে পাডাব সকলে আসিয়া যোগদান কবিল। নিমাই শুধু পিতামাতাব নহে, প্রতিবেশী সকলেব নয়নের মণি—আনন্দেব উৎস, সকলেই তাঁহাকে পাইলে যখন আনন্দে বিভোব হয়, তখন আর তাঁহাব এ আনন্দ উৎসবে, এ শুভ পরিণয়ে কে যোগদান কবিতে বাকী থাকিবে ?

একদিন শুভযোগে পাডাব এয়োস্ত্রীগণকে ডাকিয়া শচী নিমাইয়ের গাত্রে হরিদ্রা প্রদান কবাইলেন, সকলকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন কবিয়া বলিলেন—“মা, আমবা দবিত্র, ত্রুটী হইলে মার্জ্জনা কৰো”, সকলে শচীর মত দেবীকে, এমনভাবে, ‘কিন্তু’ হইতে দেখিয়া কহিলেন,— “হ্যাঁ মা, তুমি নিমাইয়ের মা, তোমাকে কি অমন কথা বলতে আছে— আমরা যে তোমার নিমাইয়ের বাধ্য, আমরা যে তাহাকে প্রাণাশ্রয়ীও ভালবাসি, একান্ত আমাদেরও যে বড় আনন্দেব, তুমি অমন কথা বলনা মা। শচী তথাপি সাধ্যান্তসারে সকলকে সংবর্জ্জনা কবিত্তে ছাড়িলেন না।

গাত্র হরিদ্রা দান করিয়া রমণীগণ আনন্দে হনুমানি করিত্তে লাগিল। সকলে জানে বিবাহের তুল্য আনন্দ আর নাই, এ আনন্দে নিমাই আনন্দিত হইয়া কত কথা কহিবে, কিন্তু তিনি নীরবে কাঁদিত্তে

নদের নিমাই।

নাগিলেন। এ আনন্দের উৎসব উপলব্ধি করিয়া নিমাইয়ের শোকসাগর উথলিয়া উঠিতে উঠিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য তাঁহার দুঃস্বপ্নে বারিষা পতিত হইতে লাগিল। পুত্রের শুভবিবাহে শচী সমস্ত শোক জ্বালা ভুলিয়া প্রাণপণে কর্তব্য প্রতিপালন করিতেছিলেন, হঠাৎ নিমাইকে হাপুস্নয়নে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহারও হৃৎশোকবহ্নি নবীভূত হইয়া মনপ্রাণ দগ্ধ করিতে লাগিল। পাছে নিমাই শোকাভিভূত হইয়া এ শুভকার্য্যে কোনও অশুভ ঘটনায়, এইজন্ত তিনি বহুকষ্টে এ স্থলের দিনে শোকের কোনও চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু নিমাই অগ্রে সেপথ দেখাইলে শচী আর থাকিতে পারিলেন না, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম করিয়া স্বর্গগত স্বামীর শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

মাতাপুত্রের এইভাব দেখিয়া সকলে বাট্ বাট্ বলিয়া নিবেদন করিতে বলিল—“ছিঃ মা, এ শুভকাৰ্য্যে ও অশুভ ভাব আনিয়া কেন মঙ্গলিক কার্য্যটাকে নষ্ট করিতেছ, এ সময় কি চক্ষের জল ফেলিতে আছে? শচী, মা, স্থির হও, নিমাইকে সান্ত্বনা কর।” জননী বুঝিলেন—বাস্তবিক পুত্রের এ মঙ্গল-উৎসবে চক্ষের জল ফেলা ভাল নয়। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বুকে ধারণ করিলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে নিমাই পণ্ডিত বরভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া বাটী ফিরিলেন। আচাৰ্য্য মহাশয় নিমাই পণ্ডিতকে জামাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, ক্ষমতানুসারে তাঁহাকে ঘোতুক প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কন্যার পিতাকে দেনা-পাওনার জন্ত কোনও প্রকার পীড়ন করেন নাই। শচী দেবীও বৈবাহিক আচার্য্যকে সেজন্য উৎপীড়িত

নদের নিমাই।

করিতে চেষ্টা করেন নাই। আচার্য্য যাহা পারিয়াছিলেন, ক্ষমতামুসারে যাহা দিতে তাঁহার অবস্থায় কুলাইয়াছিল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া সম্বষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার জাতংশে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া আজ কাল্কার মত অহঙ্কারে কন্ডার পিতাকে পদদলিত করেন নাই।

নব বধুর সমাগমে সংসার উজ্জলভাব ধারণ করিল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপে শচীর সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী নব বিবাহিতা হইলেও এঘর তাঁহার নূতন নহে, বরও স্বশ অপরিচিত নহেন, বাল্যপ্রণয়ে লক্ষ্মী-নিমাই বহুদিন হইতে একসূত্রে গাঁথা, তাই নব বধুর মত বাধাবিঘ্ন লক্ষ্মীকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি স্বপ্নসেবায়, স্বামীভক্তিতে এবং সংসার ধম্মে সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া আদর্শ সংসার স্থাপন করিলেন। লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহের অল্পদিন পরেই এইরূপ পাকা গৃহিণীর মত সংসার করিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। শচীদেবী শোক-দুঃখে একটু জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বধুমাতাকে এইরূপ সংসার-কার্য্যে স্ননিপুণা দেখিয়া তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া পুত্র ও পুত্রবধুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী বুদ্ধা শান্তিভিকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে দেন না, বলেন—
“না, আপনি যতটুকু পারিবেন, ততটুকু করিবেন, না পারেন কোন ক্ষতি নাই, দাসী যখন আসিয়াছে, তখন ভাবনা কি? যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অহুমতি করিলেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।
যাহা না জানি, কন্ডার মত মায়ের কাছে শিখিয়া লইব। আপনি এতদিন

নদের নিমাই !

হাডভাঙ্গা পরিশ্রম কবিয়া সংসাবে দেহপাত করিয়াছেন, এক্ষণে এই কন্যার হাতে সমস্ত সমপণ কবিয়া বিশ্রাম করুন।” শচীদেবী পুত্রবধুব এই অল্প বয়সে এত সংসাবাসক্তি ও ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেন—
“আমার ঘবে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি, মনের মত বউ হইলে শান্তি আর খাটিবে কেন ?”

লক্ষ্মী বলিতেন—“মা, দাস দাসী থাকিতে কত্রী কখনও পরিশ্রম করেন না, তবে তুমি কবিতে ছাড়িবেন না, কাবণ আমিও আপনার মত পাকা হই নাই ?” “হাঁ মা, সেজন্য চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিব।” যেমনি ছেলে, বউটীও তেমনি, শচী এতদিন পবে স্বথের সংসাবে আনন্দের বাজাষ বসাইলেন, পরমানন্দে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

সংসার ধর্ম ।

অর্থ না হইলে সংসাবে থাকা দায় । পূর্বেই বলিয়াছি—নিমাইয়ে সংসাব সচ্ছল ছিল না, বিশেষতঃ জগন্নাথ স্বর্গগত হইবাব পর তাঁহাদেব সংসারে বড়ই অনাটন সংঘটন হইয়াছিল । নিমাই খুব বড় পণ্ডিত হইয়াছেন, নবদ্বীপে তাঁহাব মত বড় পণ্ডিত আব কেহ নাই কিন্তু তাঁহার বয়স বেশী নয় আব উপার্জনেব চেষ্টাও এখন কবেন নাই । এইজন্য আবও অনাটন হইয়া পড়িয়াছিল ।

এইবার বিবাহ হইয়াছে, সংসাব-পথে প্রবেশ করিয়া অর্থের আবশ্যক হইল । নিমাই কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য প্রথমে বাড়িতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন । তিনি টোল স্থাপন কবিয়াছেন শুনিয়া অল্পদিনের মধ্যে এত ছাত্র সমাবেশ হইল যে, তাঁহাব বাড়িতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইল না ।

মুকুন্দ সঙ্গয় নামক একজন ধনী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে বাস কবিতেন, বাহিরে তাঁহাব একখানি খুব বড় চণ্ডীমন্দির ছিল । মুকুন্দ নিমাইকে বড় ভালবাসিতেন, তাহার উন্নতি দেখিয়া ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তাহা গ্রামাণ্ডে টোল স্থাপন করিতে নিমাইকে দিলেন । অতঃপর সেই স্থানেই নিমাই পণ্ডিতের টোল হইল । এখন নিমাই অধ্যাপক বলিয়া টোল খুলিলেন, তখন

১২ নিমাই ।

ষোল কিংবা সতের বৎসব, এত অল্প বয়সে নবদ্বীপে আর কেহ
ও চতুষ্পাশী স্থাপন করিতে পারেন নাই, নিমাই পণ্ডিতই প্রথম ।
সময় হইতে নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার আসিয়া নিমাইয়ের অভাব
টন দূর করিয়া দিল । নিমাই সচ্ছল সংসারে মনেব আনন্দে
চাত্তরগণকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন ।

পুত্রের উন্নতিতে জননী দ্বিগুণ উৎসাহে বধুমাতাকে লইয়া সংসার
কাষ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন । শাশুড়ী বধুতে কটাদেশে কাপড়
বাঁধিয়া এতগুলি ছাত্রের আহার যোগাইতে লাগিলেন, একদিনের
জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা দুঃখ বোধ করিলেন না । শচীর পুত্রসম যত্নে,
নিমাইয়ের সহোদবাদিক স্নেহে ছাত্রগণ মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিতে
লাগিল । দেশ বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র নিমাই পণ্ডিতের টোলে
আসিয়াছিল, তাহারা শচীর যত্ন ও পণ্ডিতের সরল অন্তঃকরণে পড়াইবার
ধরণ দেখিয়া শতমুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিল । বলিতে লাগিল—
“আমরা অনেক টোলে পড়িয়াছি কিন্তু অধ্যাপকের এমন সরলতা এবং
আহারের এমন সুবন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই ।” যে ছাত্রের
যে দিন যেরূপ আহারের প্রয়োজন হইত, শচী মা তাহাকে তাহাই
প্রস্তুত করিয়া দিতেন । অস্বখে অস্বখের মত পথ্য ও সেবার ক্রটি
হইত না ।

যখন নিমাই পণ্ডিতের নাম খুব জাহির হইলো, পণ্ডিত বলিয়া
এর বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি প্রতিপত্তি জন্মিল । সেই সময় ত্রীপাঠ
স্বামীরট্ট নিবাসী বৈষ্ণবংশীয় প্রভুপাদেশ্বরপুরী নামক জনৈক
এল বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন, এ মাধবেশ্বরপুরী নামক

নদের নিমাই

জৈনৈক মহাপুরুষের শিষ্য। মাধবেন্দ্র বৈষ্ণবের শিবোমণি ছিলেন, নামা প্রকাব যোগযাগে তিনি পবন পাবদশী হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, জ্ঞানেব চবম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিমার্গে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। তিনি জগতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আব বাচাকেও পুরুষ দেখিতে পাইতেন না, তিনি এ জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেন।

ঈশ্বরপূরী এই মাধবেন্দ্রপুরীৰ শিষ্য। দেহ রক্ষার সময় তিনি ঈশ্বর-পূরীকে তাঁহার সমুদয় প্রেম প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—
নদীযায় শাস্ত্রই তুমি ভগবান দর্শন করিয়া চবিতার্থ হইবে, ভগবান্বেষ অবতাব গ্রহণ করিতে আব বেশী বিলম্ব নাই।

গুরুব আদেশে ঈশ্বর ঈশ্বর দর্শন মানসে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। গদাধর, বিদ্যাদর প্রভৃতি কয়েক জন তাহার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল। ঈশ্বরপূরী শ্রীমদ্ভাগবতে মহা পণ্ডিত, সৰ্বদা ভাবে বিভোর, কৃষ্ণ প্রেমে উন্নত হইয়া শিষ্যগণ সঙ্গে আনন্দে কাল যাপন করিতেন।

ভগবান নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোথা? আজ কাল ত এখানে নিমাই পণ্ডিতের নাম-ডাক খুব, সকলেই বলে মিশ্রপুত্র নিমাই পণ্ডিতের তুল্য পণ্ডিত ভূভারতে নাই। কিন্তু সে বড় চঞ্চল, তার বালকত্ব এখনও যুচে নাই। তাই তক্ত ভাবুক পণ্ডিত ঈশ্বরপূরীর ইচ্ছা থাকিলেও সে বালকের সহিত দেখা করিলেন না। কিন্তু একদিন পথে যাইতে যাইতে উভয়ে দেখা হইল। নিমাই ভক্তিভাবে ভক্তের চরণে, গদাধর ও গোবিন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ বলিল—“ইনিই পণ্ডিত।” ঈশ্বরপূরী নিমাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।
। চক্ষু যেন অচল হইয়া গেল, আর অন্তরিকে ভগ্ন

নদের নিমাই।

ফিরাইতে যেন ইচ্ছা হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—“যদি মরি কি অপরূপ রূপ, মনুষ্য পুত্রের কি এরূপ রূপ সম্ভব, অথবা কোন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ নদীয়া পবিত্র করিতে আসিয়াছেন?”

সন্ন্যাসী প্রভুকে স্তুতিতে হইতে দেখিয়া নিমাই মুহূহাস্ত কবতঃ বলিলেন—“প্রভূপাদ, অদ্য আমাদের কুটীবে পদার্পণ করিলে ধন্য হইব।” ঈশ্বরপুরী অহরোধ এড়াইতে পারিলেন না, সাগ্রহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সেইদিন হইতে পণ্ডিতে পণ্ডিতে পরিচয় ও সম্ভাব জন্মিল। ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণলীলামৃত নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তাহা পাঠ করিতেন, গদাধর, গোবিন্দ নিমাই প্রভৃতি সকলকে তাহা শ্রবণ করাইয়া বলিতেন—“যদি কোথাও অসঙ্গত থাকে নিমাই, তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিও।” নিমাই পণ্ডিত দাস্তিকতা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—“ভক্তের ভক্তিসূত্রে গাঁথা কুঁড়ার কখন দুর্গন্ধ হইতে পারে না, তাহা সর্বদাই সকল সময় সকলের প্রিয় হইবে।” তথাপি পণ্ডিতের অহরোধে নিমাই একদিন একটা শ্লোকের ধাত্যার্থ ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না, তারপর বহু ভারিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—“তুমি ঐ পদটিকে পরশ্মৈপদী রাখিতে বল কিন্তু আমার মতে আত্মনেপদী রাখিলেই ভাল হয়।” নিমাই আত্মনেপদীর ভাব বুঝিয়া মস্তক অবনত করিলেন, তিনি ভাবে গদ গদ হইয়া হার স্বীকার করিলেন।

তারপর ঈশ্বর পুরী নিমাইয়ের প্রাণে প্রেমের বজা ই সময় ত্রীপাঠন নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, সেইদিন হইতেই নিমাইয়ের নামক জনৈক লাগিল। তিনি কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন ঈশ্বরপুরী নামক

নদের নিমাই:

মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বর পুরীর উপর শচীদেবীর অভক্তি জন্মিল। তিনি সন্ন্যাসী, না জানি আমার ছেলেকে কি গুণ কবিয়া পলাইয়া গেলেন—নিমাই আমার এমন করে কেন?

কিছুদিন পবে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার ছাত্রগণ সঙ্গে অহনিশ বিদ্যা শিক্ষায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের টোল এখন দেশ বিখ্যাত এবং তাহার অবস্থাও খুব উন্নত—ধন, ধাত্ত এবং টাকা পয়সার কোন অভাব নাই। ছাত্রগণ মনের স্থখে পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধত্ত হইতে লাগিল। অস্ত্রান্ত্র অধ্যাপকের টোলে ছাত্রগণ অনবরত অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপক ঘোর পরিশ্রম করিয়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তথাপি নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণের সমকক্ষ করিতে পারেন না, খুব বুদ্ধিহীন ছাত্রও কিছুদিন নিমাই পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিলে—কি জানি পণ্ডিতের কি গুণে, কোন্ অমাতুল্যিক শক্তি বলে সে ঘোর মেধাবী এবং বিচক্ষণ হইয়া যায়। তখন অস্ত্রান্ত্র টোলের ভাল ছাত্রকেও তাহার নিকট হার মানিতে হয়। বেশী পরিশ্রম না করিলেও নিমাই মুখকে পণ্ডিত করিতে পারে—এইরূপ একটা জনপ্রতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে নিমাই পণ্ডিতের টোলে ছাত্রের এত অ-
হইল যে, মুকুন্দ সজয়ের তত বড় চণ্ডীমণ্ডপেও

হইল না।

নবদ্বীপের নাম তখন বিদ্বজন সমাজে আ দেশ আর নাই, বিশেষতঃ নিমাই পণ্ডিত নব প্রতিভা লইয়া জন্মাইয়াছেন—তেম জন্মে নাই, আঠার বৎসরের ছেলে

নদেদর নিমাই ।

দেখে নাই । নিমাই পণ্ডিত ক্ষণজন্মা মঠাপুরুষ না হইলে এমন শক্তি সাধারণ মানুষের হইতে পারে না ।

এই সময় কাশ্মীর দেশ হইতে কেশব কাশ্মীরী নামক একজন পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে সকল দেশে জয় করিয়া নদীয়ায় পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক যুদ্ধ কবিত্তে উপস্থিত হইলেন ।

জনরবে শুনা গেল—কেশব সরস্বতীর ববপুত্র, তাই নবদ্বীপে কোনও পণ্ডিত আব তাঁহার সহিত বিচার করিতে অগ্রসব হইল না—সকলেই সভয়ে কোঠরগত হইয়া আপন আপন মান বাঁচাইলেন । যখন কোন পণ্ডিতকে তাঁহার সম্মুখীন হইতে দেখিলেন না—তখন কেশব হাস্ত কবিয়া বলিলেন—“এই নবদ্বীপ, ইহারই মিথ্যা জনরব এত প্রচারিত হইয়াছিল ।”

কেশবের এই দান্তিকতা বেশী দিন বহিল না । একদিন গ্রীষ্মের শুরু রজনীতে নিমাই দারুণ গ্রীষ্মের সমতা প্রার্থনায় শিষ্যগণসহ গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন । চারিদিকে শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া কখন শাস্ত্রালাপ, কখন কখন বা হাস্ত পরিহাস—রহস্যলাপ করিতেছেন ।

সকাল উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় কেশবও ভাগিরথী তীরে আসিয়া থিয়া পরিচয়ে জানিলেন—ইনিই নিমাই, নদীয়ার

কাশ্মীরী পণ্ডিতের দাখজয়া আখ্যা—সমতএব
রপুর । তিনি নির্ভয়ে নিমাইয়ের মিকট
পরিচয় প্রদান করিলেন । নিমাই সন্দেহ
হ আসন দান করিলেন । কেশব
“তোমার নাম কি নিমাই পণ্ডিত,

নদের নিমাই !”

দেখিতেছি তুমি নিতান্ত বালক, এত অল্প বয়সে কি পাণ্ডিত্য লাভ
করিয়াছ ?” নিমাই নম্রতা দেখাইলেন—কোন কথা कहিলেন না।
কেশব নিমাইয়ের নাম শুনিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে নিগন্ত বালক
দেখিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কবতঃ বলিলেন—“আমাব বিবেচনা হইয়াছিল,
তুমি বৈথাকবণিক, না জানি তুমি কত বয়স্হ ।”

নিমাই বলিলেন—“আজ্ঞে না, আমি বয়স্হ নই এবং ব্যাকবণও
তাদৃশ জানি না। এক্ষণে সোভাগ্য বশে আপনাব শ্রায় পণ্ডিতের
দর্শন পাইয়াছি, অল্পগ্রহপূর্বক আমাদিগকে পতিত পাবনী ভাগীরথীর
একটা স্তব শুনাইয়া কর্ণকুহব পবিত্র ককন। কেশব পণ্ডিত অহঙ্কারে
দ্বীত বক্ষ হইয়া অতি দ্রুত একটা শ্লোক আওড়াইয়া গঙ্গার বন্দনা
কবিত্তে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইলে—নিমাই তাঁহাব শ্লোকেব নানা
দোষ ধরিয়া দিলেন। পণ্ডিত এত লোকেব সম্মুখে বালক নিমাইয়ের
যুক্তিতর্কে এক প্রকাব পরাস্ত হইয়া বাসায় গমন কবিলেন। সে দিন
দুর্ভাবনায় তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার
আবাধ্যা সবস্বতী দেবী শিরোদেশে বসিয়া বলিতেছেন—“বৎস !
একি ধৃষ্টতা করিতেছ ? কাহাব সহিত তুমি তর্ক-যুদ্ধ করিতে অগ্রসর
হইয়াছ, উনি যে আমার স্বামী, ত্রিজগতে এমন সাধ্য কার আছে,
যে তাঁহার সহিত বিত্তা-বুদ্ধির পবিচয় প্রদান করে।” কেশব স্বপ্ন
দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন—“হায়, আমি কি
কুকার্য্যই করিয়াছি, সামান্য বিত্তালাভ করিয়া জ্ঞানদাক্ষিণ্য উগ্রসর
সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইয়াছি।”

কেশব সমস্ত রাত্রি দারুণ মর্শ্মপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাতঃকাল

নদের নিমাই ।

হইবামাত্র দ্রুত গমনে নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন—“বিশ্বস্তর ! আজ আমার দর্পচূর্ণ হলো, ভারতের সর্বত্র বিজয় লাভ করে, আজ তোমার নিকট পরাস্ত হয়েও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি ; তুমি যে কি বস্তু তা চিনেছি ; এ ভারত ত কোন ছাব, পাণ্ডিত্যে ত্রিজগতে তোমার সমকক্ষ কে হতে পারে প্রভু ! নবদ্বীপ আজ তোমার চরণ-ধূলিম্পর্শে পবিত্র, স্বর্গ সন্মুখা মণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী আজ ধন্য, আজ আমিও এ পবিত্র রাজ্যে আসিয়া কৃতার্থমগ্ন হইলাম ।” এই বলিয়া কেশব কাশ্মিরী ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত মাৎস্য্য বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

পত্নী-বিয়োগ ।

দ্বিগ্নিজয়ী পণ্ডিতকে পবাস্ত কবিয়া নবদ্বীপেব মান বক্ষা কবিলেন দেখিয়া অধ্যাপকমণ্ডলী একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—“আমরা গ্রামের বালক বলিয়া নিমাইকে যতই অবজ্ঞা করিনা কেন, নিমাইয়ের মত পণ্ডিত জগতে আর নাই, আজ তাহারই জন্ত আমাদের মান রক্ষা হইল ।”

নিমাই সঙ্কোপাঙ্গ লইয়া এইবাব একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হইবাব ইচ্ছা কবিলেন । এই সময় তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাস তাঁহাকে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন, বলিলেন—“নিমাই ! তুমি কেবল চিরদিন লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে—ভগবানকে ভাবনা কর, ব্রাহ্মণের ছেলে শুচি হইয়া সাধন-ভজন কর ।”

নিমাই গাভীর্ঘ্য পবিত্র্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—
“সাধন-ভজন, যোগ-বাগ, পঞ্চমকার সমস্ত করিয়াছি, এইবার বৈষ্ণব হইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া প্রেমধন বিতরণ করিব । কলিতে মাছুষ বড় শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছে, তাই যমের ডাড়নায় এত শীত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, প্রেমভক্তিতে সরস হইলে আর এত শীত ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ।” শ্রীবাস নিমাইয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন—সেই অপক্লান্ত যুবককে দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল ।

নদের নিমাই।

নিমাই জীলোকদের বড় ভয় করিতেন, পথে জীলোক দেখিলে—
তিনি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেন, মাতৃ ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রণাম
করিতেন। পুরুষ দেখিলে জীলোক বেরূপ সম্মুখে জড়সড় হয়, নিমাই
সেইরূপ হইতেন।

যেদিন নিমাই সঙ্গোপাঙ্গ সহ পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিতে বাহির
হইলেন। সে দিন তাঁহার অপূর্ণ বেশ—বাড়ীর ছায়া, গবাঞ্চে
জীলোকগণ সেই মোহন রূপমাধুরী দেখিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া
রহিল, নিমাই জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া, পদ্মা পার
হইয়া একেবারে শ্রীহট্টে পিতামহালায়ে উপস্থিত হইলেন। সে সময়
পিতামহালায়ে এক জ্যোষ্ঠতাত তনয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র ভিন্ন আর কেহ জীবিত
ছিল না।

বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত নিমাই মিশ্র শ্রীহট্টে আসিয়াছেন—শুনিয়া দলে
দলে লোক তাঁহার দর্শন মানসে আগমন করিল, এবং সেই নয়না-
ভিরাম শ্রীমূর্তি দেখিয়া সকলে তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্ত হইল। এই
সময় তপন মিশ্র নামক একজন সাধু নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া তাঁহার
চরণ প্রান্তে পণ্ডিত হইয়া বলিলেন—“আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি—আপনি
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, ভূভার হরণের জন্ত ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, পতিতকে
উদ্ধার করাই আপনার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, প্রভু! আমাকে
উদ্ধার করুন।” নিমাই পণ্ডিত অতি নম্রভাবে জিহ্বা কর্তন করিয়া
বলিলেন—“জীবে ভগবত ভাবের আরোপ করা নিতান্ত অগ্রায়া; আমাকে
এরূপ বলিবেন না—আমি তৃণ হইতেও অধম—আপনি আমায় ক্ষমা
করুন।” তপন মিশ্র প্রভুকে ছাড়িলেন না দেখিয়া তিনি তাহাকে

নদের নিমাই ।

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করতঃ সম্মুখ কাশী বাসেব অন্ত্যাত দিলেন ।
তখন অন্ত্যাত পাঠিয়া বাবানন্দা ধামে গমন করিলেন ।

নিমাই পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবগণের প্রীতি বড়ই আকোশ প্রকাশ করিতেন,
কিছু পুস্তকে লেখেন কবিগণ তাহা বসে ভাব বহিল না । তদেৎসর্গমী
কীর্তন সহিত কবিনাম কবিগণ উন্নত কীর্তন পড়িত । কিছুদিন
তখন গান গাব নিমাই নবদ্বীপে কবিগণ আসিলেন ।

পুত্র এতেন পরে বাড়ী কবিগণ আসিল কিছু জননীও তাহাতে
আনন্দ পাইল না ; মাঝে মলিন মুখ দেখিয়া নিমাই বলিলেন—“মা,
আমি এতদিন গণে বাড়ী আসিলাম কোথায় তুমি স্নেহ বাৎসল্য
স্বাদা অংশনন কাব্যে, না কেবল মলিন মুখে, বিরস বদনে দিন
কাটাচ্ছে, ইহা বাক্যেই ” পুত্রের কথা শুনিয়া শচী আঁখি
পারিলেন না । তিনি বধূব নাম করিয়া কাদিয়া উঠিলেন ।

প্রতিবাসিগণ বলিল—“নিমাই । বউমা, অবশ্যে মানব লীলা সম্বন্ধ
কবিগণ—আজ কয়েক দিন হইল, সপ্তমীতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে,
তাই তোমার মা, তেমন গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়া শোক-দুঃখে অধীর
হইয়া তোমার মত হাঁসি মুখে কথা কহিতে পারিতেছেন না ।”

সত্যসাক্ষী পত্নী বিষেগে গণে শুনিয়া নিমাই কিছুক্ষণ মর্শ্বিত
হইয়া বহিলেন, তাব পর জননীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—“মা,
এয়োবাণী ভাগ্যমানী, স্বামীকে বাগিয়া যে রমণী দেহ রক্ষা করে—
তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—তবে তুমি তাব জন্ত কাদিয়া আকুল হও
কেন ?” নিমাই মনেব দুঃখ মনে চাপিয়া শোকাভূরা জননীকে প্রবোধ
দিতে লাগিলেন ।

নদের নিমাই ।

এখন নিমাই পণ্ডিতের আর কোন প্রকার অভাব নাই । দরিদ্র জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত এক্ষণে বিদ্যা ও বৈভবে নবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছেন । বড় বড় লোক নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলে— তটস্থ হইয়া দাড়াই—তাঁহার অচ্যুত প্রতীক্ষা করে । নবদ্বীপ ও অগ্র্য স্থানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় হইলে নিমাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য অচিরে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয় । এইজন্ত শচীর গৃহ ধনধান্য পরিপূর্ণ ; তবে নিমাই পণ্ডিত নাকি বড় ব্যয়শীল—অতিথি অভ্যাগত প্রতিপালক—তাই এত আয়ে এক কপর্দকও সঞ্চয় হয় না । ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কখন সঞ্চয়ের পক্ষপাতী নহেন, ঈশ্বরের রাজত্বে কার্পণ্য না করিয়া যথাসাধ্য আত্মের সেবা করা মহাধর্ম, পুত্রের প্ররোচনায় শচীদেবীও সে ধর্ম অকাতরে প্রতিপালন করিয়া গ্রামে অন্নপূর্ণা আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন ।

পুত্র এখন যশোগৌরবে গৌরবান্বিত—সংসারও এখন বেশ সচ্ছল—অভাবের লেশমাত্র নাই । অথচ এই অল্প বয়সে নিমাই গৃহশূন্য হইল, এমন স্থতের সময়ে একটি বধু না হইলে ত গৃহের শোভা হয় না, শচীদেবী মনে মনে পুত্রের আর একটি বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ।

শচীদেবী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন । বালিকাটি অমৃত্যু, এখনও বিবাহ হয় নাই—তবে বিবাহ যোগ্য হইয়াছে, বোধ হয় সংপাত্র্যভাবে এইরূপ হইতেছে । বালিকাটিও শচীর মত বাৎসল্য প্রতিমা, স্নেহময়ীকে দেখিয়া আনন্দে চাহিয়া থাকে—মনে মনে কি ভাবে—তা ভগবানই জানেন ।

নদের নিমাই।

একদিন শচীদেবী স্নানান্তে তীরে উঠিয়া বালিকাটিকে সঙ্গেহে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হ্যাঁ মা, তুমি ত প্রত্যহ স্নান করিতে আইস, তুমি কি ব্রাহ্মণের কন্যা?”

বালিকা স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল—“হ্যাঁ!” শচী বলিলেন—“তুমি কাহার কন্যা, তোমার পিতার নাম কি মা?”

বালিকা বলিল—“সনাতন পণ্ডিত।” শচী বালিকার পিতার নাম শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। যদিও তিনি তাঁহাদের স্বঘর—তথাপি সনাতন রাজার সভা পণ্ডিত, তিনি দরিদ্র নিমাইকে কন্যাদান করিবেন কি? শচী কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সনাতন রাজপণ্ডিত, আর তাঁহার পুত্রই বা কম কি? ধনে-মানে-কুলে-শীলে সেও ত কোনও অংশে কম নহে—তবে চেষ্টায় দোষ কি, পাত্রীটী বেশ পছন্দ সহি কিনা?

শচীদেবী তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে আপনার অভিপ্রায় করিলেন। তিনিও কন্যার পিতাকে শচীর অভিপ্রায় ব্যক্ত : সনাতন কথা শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। নিমাইয়ের মত জ পণ্ডিত যে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার জন ব্যক্ত করিয়াছেন—ইহাতে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া স্বীকৃত হইলেন। এবং বিপুল বিত্ত-বিভব প্রদান করিয়া তদীয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই পণ্ডিতের গায় সংপাত্রে সম্প্রদান করিয়া কন্যা দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

পুনরায় মনের মত বধু পাইয়া শচীর আনন্দের সীমা রহিল না। গৃহ-প্রাঙ্গণ এতদিন অন্ধকার হইয়াছিল—আজ আবার নববধু সমাগমে

নদের নিমাই ।

তাহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া অপূৰ্ণ শ্রীমণ্ডিত হইল । বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতন পণ্ডিতের আদরিণী ছদ্মিতা, রাজপণ্ডিতের একমাত্র কন্যা—অতুল স্বখে লালিত পালিত হইলেও নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া আর তাঁহার সে ভাব র'হল না । তিনি শাস্ত্রীরা পূৰ্বে উঠিয়া গৃহকৰ্ম সমাধা করিতেন— ছাত্রগণের ভোজনের জন্ত জননীর মত আহাৰাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন । পূজনীয় স্বামীর অভাব-অভিযোগ অশ্রীৰ যত্নের সহিত প্রাণপণে পূরণ করিতে অল্পমাত্র ক্রটি করিতেন না । স্বামীকে তিনি দেবতা অপেক্ষাও পূজনীয় জ্ঞানে হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি-প্ৰীত প্রদান করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার প্রণয় ভাজন হইয়া উঠিলেন । দ্বিতীয়বার দার পবিগ্রহে পতি-পত্নীতে প্রায়ই কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়, এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া বরং সংসারে শান্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠিল দেখিয়া শচী নিশ্চিন্ত মনে ভগবান চরণে হৃদয়ের রুতজ্ঞতা র্নন করিতে লাগিলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গয়াধামে ।

“পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্বজয়া ব্রতং” ।

পণ্ডিত বুঝিলেন—আমি জীবনে পিতার কোন প্রিয় কা-
নাই। এক্ষণে যদি গয়াধামে গমন করিয়া বিষ্ণু স্ম-
করিয়া তাহার অক্ষয় স্বর্গবাসের পথ-পরিষ্কার করি।
হইলেও পুত্রোচিত কার্য্য করা হয়। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে
প্রয়োজনম্।” পুত্রের কার্য্যহিত পিতামাতার মুক্তি বিধা-
নামাত্র শ্রম স্বীকার করিলে যদি এইরূপ একটা স্মৃহং
করা যায়, তবে তাহাতে বিরত হই কেন ?

নিমাই পিতৃকার্য্য করিবার জন্ত জননীর নিকট গয়া বাইবার
অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রমণীগণ একটা প্রবাদ বাক্য বলিয়া
থাকেন “ছেলে হয়ে কর্কে গয়া, মেয়ে হয়ে কর্কে সর্বজয়া”। পুত্র হয়ে
পিতৃপুরুষগণের মুক্তি বিধানার্থ গয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং কত্যা হইয়া
“সর্বজয়া” ব্রত সম্পাদন করিলে পুত্র বা কত্যা জন্মের সার্থকতা লাভ
হইয়া থাকে। নিমাই কৃত্তী পুত্র, সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত, সে পিতৃঋণ
পরিশোধার্থ গয়ায় যাইবে—ইহাতে বাধা দেওয়া অত্যাশ, তবে নিমাই
যে রূপ পাগল স্বভাব, ধর্ম্মে যে রূপ একাগ্র, হয়ত গয়ায় যাইয়া কোন
সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজিয়া যাইবে, বাড়ী আসিতে বিলম্ব করিবে বা আসিনে-

নদের নিমাই।

তাহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া ত
পাণ্ডিত্যেব আদরিণী চুহিত' কাদাইয়া সন্ন্যাসী হইবে, এই ভয়ে তিনি
লালিত পাণ্ডিত হইতেইবাণ অনুমতি দিয়াও বলিলেন—“বাবা, যে
ভাব র হন না। তিনকী ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যাওয়া একান্ত
চান্দ্রগণের ভোগে লইয়া যাও, তোমার মেসোমশাইকে সঙ্গে করিয়া
বাখিতেন। ‘হয়।’ নিমাই বলিলেন—“মা ! সে ভাল, তিনি যাইতে
প্রাণপণে পুত্র আমার আপত্য নাই, তবে আমি যে এতদূর দেশে
দেবতা অপেতাহা তুমি মনেও করিও না, আমার সঙ্গে মুরারী গুপ্ত,
করিয়া অচিরকয়েকজন ছাত্র ও যাইবো।” পুত্রকে ইহাদের সঙ্গে
দ্বিতীয়বার দারমুন উঠিল না। তিনি তন্নীপতিকে অনুরোধ করিয়া
হয়, এক্ষেত্রে পাঠাইলেন।

দটিল দেখিবে, আশ্বিন মাসে নিমাই বাড়ী হইতে বাহিব হইলেন।

গঙ্গলেন তাঁহার মেসো মহাশয় চন্দ্রশেখর আর শিবাবর্গ। এখনকার
তখন রেল পথ বিস্তৃত হয় নাই, কাজেই তীর্থ ভ্রমণ বড়ই কষ্টসাধ্য
ছিল, আর তীর্থ ভ্রমণ এত আয়াসসাধ্য ছিল বলিয়াই তীর্থ সাহায্য তখন
এত প্রবল ছিল, প্রাণের আবেগে ভক্তিভাবে তথায় খাইলে ভগবদ্দর্শন
হইত, ভগবান ভক্তকে দয়া করিতেন, তাহার মনস্কামনা সিদ্ধির কোনও
ব্যাঘাত ঘটত না। এখন সে পরিশ্রম নাই, সে ঐকান্তিকতা, সে
ভক্তি প্রাণে জাগে না, কাজেই দেব দর্শনে যাইয়া পুঁইমাচা দর্শন
করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

নিমাই গঙ্গার তীরবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, শিবাবর্গ
প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। চন্দ্রশেখর নিমাইকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন,
পাণ্ডিত্যের দারুণ অভিমানে নিমাই পূর্বে একটু দাঁড়িয়ে

নদের নিমাই !

পড়িয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি নিমাই নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছেন। প্রাণ তাঁহার ভক্তিভাবে গঠিত হইয়াছে। দেবতা-ব্রাহ্মণ দেখিলেই তিনি ভক্তি ভাবে নত হইয়া পড়েন। সে অহঙ্কার, সে মাংসখ্যা, সে দাস্তিকতা, বাল্যের সে চপলতা আর নাই, নিমাই এখন ঠিক পণ্ডিতের মত গাভিখ্য লাভ করিয়াছেন। বৃক্ষ ফলবান হইলে যেমন স্বভাবতই নত হইয়া পড়ে, নিমাই ভক্তিধনে ধনবান হইয়া এখন সেইরূপ নম্রতাই লাভ করিয়াছেন।

মাতৃজঠর হইতে ধরাবক্ষে পতিত হইয়া নিমাই কখনও পীড়িত হন নাই, অটুট স্বাস্থ্য লইয়া অসীম তেজোগর্বে শচীর পুত্র গ্রাম ভোলপাড় করিতেন, একদিনের জ্ঞা কেহ তাঁহাকে অস্থস্থ হইতে দেখে নাই। আজ নিমাই তীর্থ গমন মানসে ক্রমশঃ পূর্ণ হাঁটিয়া মান্দার গ্রামে জরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এ জর সামান্য নহে - বিষম জর। সঙ্গীগণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। চন্দ্রশেখর পুত্রসম নিমাইকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। শিষ্যগণ প্রভুর সেবায় প্রাণপণ করিল, গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া চিকিৎসার পদ্যমর্শ প্রদান করিল। কিন্তু নিমাই নিজেই চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেই করিলেন, বিপ্র পদরজ আনিয়া খাওয়াইতে বলিলেন।

সেখানকার লোক বড়ই ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্ত ছিল, তাই ব্রাহ্মণ মহাত্ম্য দেখাইবার জন্য জগতের সর্বস্বার্থ্য প্রধান পণ্ডিত নিমাইটাদ এই খেলা খেলিলেন। বিপ্র পাদোদক আনিয়া পান করাইয়া এবং পদরজ সর্বান্তে মাখাইবামাত্র নিমাইয়ের প্রবল জ্বর একদিনেই সারিয়া গেল। বিপ্র পাদোদকর বিষয় বিবৃত করিয়া এইজন্ত কবিতা গাহিয়াছেন—

নদের নিমাই ।

হইলে অসাধ্য ব্যাধি,

বৈद्य যার না পান বিধি,

সে রোগের মহৌষধি, কেবল ব্রাহ্মণেরই পদরজ ।

ব্রাহ্মণ বিদ্বেশী গ্রামবাসিগণ বিপ্র পাদোদকের ক্ষমতা দেখিয়া অবাধ হইয়া গেল, সেই হইতে তাঁহারা আবার ভূদেব ব্রাহ্মণের অমুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িল ।

নিমাই আরোগ্যলাভ করিলে সকলেই আবার গয়াভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল । কত গ্রাম, কত নগর অতিক্রম করিয়া সশিষ্য নিমাই ভক্তপ্রধান গয়াস্বরের পবিত্র ক্ষেত্র গয়াধামে প্রবেশ করিলেন । গয়ার পবিত্র স্বর্গাদপি দৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিত প্রবর নিমাইয়ের হৃদয় ভক্তিরসে স্নান হইল । যে নিমাই পাণ্ডিত্য প্রভাবে একপ্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ গয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া সেই নিমাইয়ের চক্ষু হইতে অজস্র প্রেমধারা পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিল । আহা ! এই সেই গয়াধাম, যেখানে ভক্তবীর গয়াস্বর শ্রীভগবানের সহিত ভক্তিযুদ্ধে রত হইয়া অসংখ্যবার ভগবানকে পরাজিত করিয়াছিল, ভক্তবৎসল ভগবান কিছুতেই এই মহাভক্তকে বশীভূত করিতে পারেন নাই । তারপর ভক্ত হৃদয়ের কি উদার, কি পবিত্র, কি মহান ভাব, পরপ্রেমে, হৃদয়ের কি গভীরতা, ভক্তচূড়ামণি বলিলেন—
“ভক্তবৎসল ! তোমার সাধ্য নাই যে তুমি আমাকে আঁটিতে পার, তোমাকে কষ্ট না দিলে জীবের ভবের কষ্ট নষ্ট হয় না, তাই আজ আমার এই ভক্তিযুদ্ধ । আমি নিজের জন্ত কোন বর প্রার্থনা করি না, তবে জগদ্বাসীর জন্ত বলিতেছি—“আমি এইস্থানে অবস্থান করি, তুমি আমার মস্তকে ঐ মূর্তি মূলাধার পাদপদ্ম রক্ষা করিয়া প্রতিরত

নদের নিমাই :

২৩, যে কোন লোক যুত ব্যক্তিব মুক্তি কামনায আমাব মস্তক
স্থিত তোমাব ঐ পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবে, সে সকল পাপ হইতে
পবিত্র হইয়া মুক্তিশ্রী কবিবে, ভবেব সকল ভাবনা এড়াইবে, তাহা
স্ট্রীল তোমায় এই যুক্ত হইতে অব্যাহতি দিই, তোমাব পাদপদ্ম মস্তকে
বর্ণ কবিয়া তোমাব বশ্বতা স্বীকার কবি, নতুবা আমি তোমাকে
‘কছুতেই ছাড়িব না ।’

ভগবান দেবগণেব জন্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; অসুখ ভয় হইতে
নাহাদিগকে নিতয় কবাই তাহাব ইচ্ছা, এইজন্য স্বীকৃত হইলেন, ভক্ত-
শাব গয়াস্তবকে বশীভূত কবিতে গিয়া প্রকাবান্তরে তিনি নিজেই মহা-
ভক্তেব নিকট বশীভূত হইয়া পড়িলেন । মবি মবি ইহাই সেই পবিত্র
স্বাধাধ্য পাম, ভগবান নিজ প্রতিশ্রুতি বক্ষাব জন্য এখানে সদা সর্বদা
‘ববাজমান । আহা ! এমন স্থান কি আব আছে ? নিমাই ভক্তিপ্রেমে
‘দ গদ হইয়া বাক্শক্তি শূন্য হইলেন, বিহ্বল নেত্রে চারিদিক
দর্শন কবিলেন । তারপব ফল্গুনদী, অক্ষয় বট সন্নিধানে গমন করিয়া
তাহাব ত্রেতাযুগেব কথা মনে হইল, শ্রীবাম গৃহিণী সীতাদেবী একদিন
জনকপ্রতিম স্বপ্নদেবেব পিণ্ডদান কবিতে গিয়া ইগদিগকে অভিষাপ
ও বব প্রদান কবিয়াছিলেন, ইহা সেই শাপগ্রস্তা অন্তসলিলা ফল্গুনদী,
আব ইহাই সেই অমব-বব-প্রাপ্ত অক্ষয় বট, নিমাই যুক্তকবে ভক্তিতরে
সকলকে প্রণাম কবিলেন ।

তারপব পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার মানসে ব্রহ্মকুণ্ড
ফল্গুনদীতে স্নান করত পবিত্র হৃদয়ে ভক্ত-চুড়ামণি নিমাইচন্দ্র গয়াস্তরের
মস্তকে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শনে গমন কবিলেন । বহুযুগ ধরিয়া

নদের নিমাই।

তপশ্চায় দেহপাত করিলেও যে আরাধ্য পদ দর্শন করা যায় না ; ভক্তবীর গয়াসুর উদার হৃদয়ে অনায়াসে সকলের জন্ত সেই পদ দর্শন এত সহজ সাধ্য করিয়া দিয়াছেন—ধন্য বীরবর গয়াসুর ! “ক্ৰোশমেকং গয়াসুরঃ” একক্ৰোশ পরিমিত অশ্রুরের সেই পবিত্র দেহ বিস্তৃত—ভগবান তাঁহার মস্তকে শ্রীপদযুগল রক্ষা করিয়া জগদ্বাসীকে অভয় দিয়া ডাকিতেছেন—আয় আয় তোরা, পাপী তাপী জীব ! আয়, আজ আমার মহাভক্ত গয়াসুর তোদের উদ্ধারের জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, তোরা ইহাতে পিণ্ডদান করিয়া সকলকে উদ্ধার কর, আজ আমি তোদের জন্য মুক্তি বিলাইতে এখানে মুক্তহস্ত হইয়াছি। নিমাই পণ্ডিত সেখানেও ভক্তিভরা ধরাধরা গলার আওয়াজে নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে মন্ত্র পাঠ করিয়া, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং শ্রীপুরুষ বাহার নাম মনে পড়িল—বিষু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া তাঁহাদের সকলের উদ্ধার সাধন করিলেন।

এইখানেই বুঝিতে হইবে—হিন্দুর মত উদার প্রাণ জাতি জগতে আর কোথাও নাই। ইহারা যে কেবল নিজের জন্ত, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কিছু করে না বা বলে না, তাহা তাহাদের এই শ্রদ্ধা-মন্ত্রের মহিমা-মাহাত্ম্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের শ্রদ্ধাভব, তাহাদের তর্পণ প্রভৃতি কেবল নিজের হিতার্থে নয়—জগতের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঘাহারা শ্রদ্ধা ও তর্পণের মন্ত্রপাঠ করিবেন—তাহারাই একবাক্যে ইহার সত্যতা বুঝিয়া হিন্দু জাতির মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নিমাই পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা করিয়া সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—নয়ন হইতে অবিরাম ভক্তি-অশ্রুপাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল,

নদের নিমাই ।

উত্তবীয় প্রভৃতি আর্দ্র হইয়া গেল । নিমাইয়ের মুখে কথা নাই—নডন চডন একেবারে বহিত হইয়া গিয়াছে, ডাকিলে আব সাডা পাওয়া যায় না । তাঁহাব মেসো চন্দ্রশেখর ও শিষ্যগণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন—নিমাই পণ্ডিতেব তৎকালীন সেই অপকৃপ কপ যে দেখিয়াছে—সেই বৃক্ষিয়াছে, নিমাই শুধু পণ্ডিত নহেন—ভক্তচূড়ামণি, সকল মানুষ অপেক্ষা অমাত্যষিক কোনও শক্তি নিশ্চয়ই ইহাতে বর্তমান আছে । নতুবা গয়াধামে ত কতশত লোক গমনাগমন কবে কিন্তু এমন বিষম ভাববিভাব কে কবে হইয়া থাকে ? নিমাইয়েব শ্রীঅঙ্গ একটু একটু কাঁপিতেছে, অববোষ্ঠ মূহ্ মূহ্ নাড়িতেড়ে, সেই গৌবাক্স স্তম্ভক কপ দেখিয়া সকলে একদৃষ্টে তাঁহাব পানে চাহিয়া আছে । দর্শকগণ মনে কবিতেছে—তাহাবা েন পৃথিবী ছাড়া অস্ত্র কোন অপার্থিব বাজ্যের একটা মানুষ দেখিতেছে ।

এই দর্শকগণের মধ্যে বৈষ্ণব প্রধান ঈশ্ববপুবীও ছিলেন । তিনি নবদ্বীপ হইতে বিদায় লইয়া নানাদেশ পর্যটন করত ঠিক এই সময়ে গয়াধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি নিমাইকে পূর্ব হইতেই বৃক্ষিয়াছিলেন—নিমাই কে, প্রেমরস বসিক ঈশ্বরপুত্রী বৃক্ষিয়াছিলেন—নিমাই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন । নিমাই ভাবাবেশে পড়িয়া যান—কাহাবও ধরিতে সাহস হয় না—সে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ কবিতে কেহ অগ্রসব হয় না দেখিয়া ঈশ্ববপুবী সেই প্রেমে আলু থালু—আবেশে এলাইত দেহ আপন বক্ষে ধারণ কবিয়া বলিলেন—“এতদিনে আমার গয়া আগমন সার্থক হইল—আমি প্রভুর রূপালাভ করিলাম ।”

পুত্রীর পবিত্র অঙ্গস্পর্শে নিমাই একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—
‘প্রভু ! আমি ভাবের ঘোরে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে

নদের নিমাই ।

উদ্ধার কর—স্বপথ দেখাইয়া দাও ।” বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলেন ! ঈশ্বরপুরী শশব্যস্তে নিমাইকে বুকে করিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত ! তোমার সেই প্রথম দর্শন হইতেই আমি মোহিত হইয়াছি, তবে আর এত অল্পনয় বিনয় কেন ?”

এদিকে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণ বাসা ঠিক করিয়াছিলেন নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন । নিমাই স্বহস্তে রন্ধন কবিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন—তাঁহার সেবা কবিলেন । কিছুদিন একত্র অবস্থান করিবার পর ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র প্রদানের উত্তোগ করিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত ! আজ তোমাকে দীক্ষিত করিব ।” নিমাই বলিলেন—“আমি আজীবন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত—পিতার নিকট রাধামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি ।” ঈশ্বরপুরী বলিলেন—“শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে—জীব এত শক্তি লাভ করিতেই পারে না ; যোল বৎসরের বালক যে দিগ্বিজয় করিতে পারে—মহাশক্তির শক্তি ভিন্ন কি তাহা সম্ভব ?” বাহা হউক, আজ আমি তোমাকে “রাধাকৃষ্ণ” যুগল মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া ধন্য হইব । মনে মনে বলিলেন—“তোমার আবার মন্ত্রগ্রহণ কি প্রভু ! তবে আমার মত অভক্তকে চরিতার্থ করিবার জন্তই তোমার এই লীলাখেলা ।” সেইদিন শুভক্ষণে তিনি নিমাইয়ের কর্ণে “রাধাকৃষ্ণ” মন্ত্র প্রদান করিলেন । কয়েকদিন উভয়ে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-স্বধাপান করিয়া ঈশ্বরপুরী বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

নিমাই হিন্দু ধর্মের যাবতীয় আচার-ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া মানিয়া চলিতে লাগিলেন । পূর্বে যদিও বালক স্বভাববশতঃ সময়ে সময়ে জননীকে বিরক্ত করিতে গিয়া ভ্রষ্টাচার করিতেন কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের

নদের নিমাই ।

পর তিনি একেবারে আচার-বিচার সম্পন্ন এবং মহাভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। প্রতিদিন গুরুদত্ত মন্ত্রজপ করিয়া সমাধীস্থ হইতে লাগিলেন, প্রাণ ভক্তিরসে ভোরপুর হইয়া উঠিল—বাহ্যিক চাঞ্চল্য-চাপল্য তিরোহিত হইল। গুরুমন্ত্র যে মানব জীবনে অবশ্য গ্রহণীয় এবং তাহার জপে যে মানুষ অসীম শক্তিমন্ত হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্ত তিনি নিত্য নিয়মিত জপ করিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ নিমাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত প্রাণ হইয়া কখন কান্না, কখন হাসি, কখন প্রলাপ বকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা, তাঁহার এক প্রকার রহিত হইয়া গেল। তাঁহার বদনে একপ্রকার কঙ্কণ দ্ব্যাদ্র্য ভাব—নয়নে অবিশ্রান্ত প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি সঙ্গীগণকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—“ভাই ! তোমরা বাড়ী যাও, আমার জননী ও পত্নীকে বুঝাইয়া বলিও—তোমাদের নিমাই “রাধাকৃষ্ণের” দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক এক দিন পলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মেসো চন্দ্রশেখর দেখিলেন—নিমাইয়ের ধাতু অহুসারে ঈশ্বরপুরী ঠিক মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তাই নিমাই ভগবৎ প্রেমে এতদূর অধীর হইয়া পড়িয়াছে। একে মহাপণ্ডিত, তাহার উপর মন্ত্র গ্রহণের অসীম শক্তি লাভ করিয়া নিমাই মহাভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে— তাহার মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। যাহা হউক, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই—কি জানি, অজানা—অচেনা দেশে কোথায় পলাইয়া যাইবে ; এক্ষণে দেশে যাওয়াই উচিত, গয়ার কার্য্যত শেষ হইয়াছে ?

নদের নিমাই ।

চন্দ্রশেখর একজন বিচক্ষণ লোক । নিমাইকে নানা প্রকার উপদেশ এবং অশেষবিধ সাহুনা প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীবুদ্ধাবন গমনের গতিরোধ করিলেন । তিনি স্বদেশে আসিতে আর দ্বিধাবোধ করিলেন না । এক দিন পৌষ মাসের দারুণ শীত মাথায় করিয়া ভীষণ হিমার্নীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নদীয়ার নিকলক চন্দ্র নিমাই পণ্ডিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন ।

নিমাই নবদ্বীপের প্রাণ স্বরূপ—এতদিন তাঁহার অদর্শনে শুধু তাঁহার জননী পত্নী বা আত্মীয় স্বজন নয়, গ্রামবাসী সকলেই শ্রিয়মান হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল । আজ নিমাই চন্দ্রের উদয়ে তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া অসহ্য অদর্শন যজ্ঞগার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল । বৎসহারা গাভীর মত শচীদেবী শ্রিয় পুত্রের আগমন সংবাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন । নিমাই জননীর পদে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন । পতি-বিরহ-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া গবাক্ষ পার্শ্ব হইতে আরাধ্য মূর্তি দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন । স্বপুত্র সনাতন পণ্ডিত ও স্বশ্রদ্ধামলাদেবী জামাতার আগমন সংবাদ শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন । সমস্ত নদীয়া ধাম নিমাইয়ের আগমানে আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ভাবাবেশ ।

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই একরূপ হইয়া গেলেন । অনবরতই তাঁহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল । পাণ্ডিত্যের অভিমান, জ্ঞানের গরিমা সমস্ত বিসর্জন দিয়া নিমাই পণ্ডিত তৃণাদপি স্ননীচ হইয়া কেবল হা কুট, হা বনমালী, বলিয়া কাদিতে লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে মুচ্ছা হইতে লাগিল । শচীদেবী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন ।

প্রগাঢ় পণ্ডিত পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়া কোথায় সংসারী করিবেন, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া কোথায় তাঁহার সংসার উজ্জ্বল হইবে, না একেবারে উদাস, নিমাই গয়া হইতে আসিয়া একেবারে পাগল হইয়া গেল ! এমন স্বরূপা, কোমলাঙ্গী বধুমাতাকে দেখিয়াও তাহার মনপ্রাণ আকুষ্ট হয় না—তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না, শচীদেবী পুত্রের জন্ত বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কেমন করিয়া সে আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে—সোণার চাঁদ নিমাই আবার কেমন করিয়া বধুমাতার সহিত মিলিত হইয়া আদর্শ সংসার স্থাপন করিবে—শচীদেবী বয়স্থা রমণীগণের সহিত সেই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন । নিমাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, কোন কুগ্রহ বিরূপ হইয়া এরূপ করিতেছে, ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে দেবতার স্থানে

নদের নিমাই।

নানাবিধ মানসিক করিতে বলিল। সনাতন পণ্ডিতের পত্নী কমলাদেবী কস্তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্ত জামাতার মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের সে ভাব দিন দিন বাড়িল বই কমিল না।”

নিমাই সময়ে খান না, ছাত্রদের পাঠ দেন না; আহাৰাদির পর রাত্রে শয়ন করিতে গেলে, বিষ্ণুপ্রিয়া পদে ধরিয়া রোদন করিলে; নিমাই অতিরিক্ত রোদন করিতে থাকেন। শেষে শাশুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া তবে তাঁহার রোদন থামাইতে হয়। নিমাই শয়ন করিয়া চমকিয়া উঠেন—স্বপ্নে কি দেখিয়া “কই কুষ্ঠ, কোথা কুষ্ঠ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। এ যে বড় বিষম ভাব—জননী, পত্নী একরূপ ভাব দেখিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতের এই ভাবের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সূবৃহৎ নদীয়া জেলার চারিদিক হইতে লোক নিমাইকে দেখিতে আসিল। নিমাই শক্তিমত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা সকলেই জানিত, জগন্নাথ তাঁহাকে উপনয়নে গায়ত্রী দীক্ষার সময় “রাধামত্” প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার প্রমুখ্যে তাঁহার কর্ণকূহরে এই অমোঘ শক্তি মত্ত প্রবেশ করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ে তাহাকে উন্নত এবং পাণ্ডিত্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। এখন সকলে শুনিল—গয়াধাম হইতে তিনি পুনরায় ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব মন্ড্রে দীক্ষিত হইয়া একেবারে ভাবাবেশে অধীর হইয়াছেন। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বিরহে হাহাকার করেন, কখন জ্ঞান হারা হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন—তাঁহার তন্ময়ত দেখিয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহাকে

নদের নিমাই :

অভিনন্দিত করিবার জন্য, তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্বাক্য শুনিবার জন্য তাঁহা বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি—তখন শাক্তগণ নবদ্বীপে, বড়ই প্রবল ছিলেন—বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিতেন না, কারণ শাক্তদের মধ্যে সকলেই মহা পণ্ডিত—যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা কাহার সাধ্য ছিল না। নিমাইকে সকলেই ঐ দলভুক্ত মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব রুপে মাতুষ্যরা—অনবরত ভাবাবেশ হইতেছে, শুনিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নিমাইয়ের ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত যখন তাঁহাদের দলভুক্ত, তখন আর ভাবনা কিসের ? এইবাব আমাদের বিদ্যেদ্রোহী মহাশয়দিগকে একবার দেখিয়া লইব বলিয়া উগ্রস্বভাব বৈষ্ণবগণ মাথা নাড়া দিয়া উঠিলেন। শাক্তগণ নিমাইয়ের নির্জ্ঞান প্রিয়তা, আকুল ক্রন্দন, নিরহঙ্কার স্বভাব, চিত্ত দৌর্বল্যের লক্ষণ মনে করিয়া বলিলেন—নিমাই পণ্ডিত অতিরিক্ত অধ্যয়নে উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাঁহার যাবতীয় সাংস্কৃতিক ভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত করিয়া তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত, ভগবানের একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া স্তুতিগান করিবার জন্য এক সভার আহ্বান করিলেন। নিমাই প্রতিদিন, শ্রীবাসের ভবনে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করেন—আরও বহুভক্ত প্রাতঃকালে তথায় পুষ্পচয়ন করিতে আগমন কবেন। শ্রীবাস নিমাইয়ের পিতৃবন্ধ একথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অষ্টোতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অন্তরের মহা প্রেরণায় বুঝিয়া ছিলেন—ভগবান সত্ত্বরই জীবের হৃৎক দূর করিতে, মহাপ্রেমে ধরা ভাসাইতে অবতার গ্রহণ করিবেন।

নদের নিমাই।

একণে নিমাইয়ের এইরূপ পরিবর্তন—হঠাৎ এইরূপ অমানুষিক প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ভাবিলেন—তবে কি বন্ধুপুল নিমাইই আমাদের উদ্ধার কর্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন? শ্রীবাস সমস্ত রজনী এই চিন্তা করিয়া তাঁহার দর্শনাশায় বহিপ্রাক্ষণে প্রাতঃকালেই উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সকলে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, নিমাইও আসিয়াছেন—ফুল তুলিতেছেন। সেই মধুর হস্ত বিজড়িত প্রেমময় মূর্তি দেখিয়া শ্রীবাস আর তাহাকে মাতুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। তার পর অপর সকলের মুখে তাঁহার গুণগ্রাম, অহরহঃ তাঁহার ভাবাবেশের কথা শুনিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন—নিমাই সামান্য মাতুষ নহে। এই অল্প বয়সে এরূপ প্রেমভক্তির উদয় দেব-স্বভাব মহাপুরুষ ভিন্ন কাহার সম্ভবে না।

একদিন শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সকলের ইচ্ছা হইল। বৈষ্ণবগণ নিমাইকে আমন্ত্রিত করিয়া তথায় ঘাই-বার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিমাই এখন বেশী লোক সঙ্গ ভাল না বাসিলেও ভক্তগণের আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি পুষ্পচয়ন করিয়া নিমাই পণ্ডিত স্বরধুনী তীরে শুক্লাশ্বরের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে সদাশিব, মুরারি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি বহু ভক্ত নিমাই পণ্ডিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শুভাগমন করিয়াছেন।

বেলা এক প্রহরের পর সেই পরম শাস্ত্র সুধীর পুরুষ নিমাই পণ্ডিত ভগবদ্ভাবে গদ গদ হইয়া আসিতেছেন। তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, যেন কাহার ভাবে বিভোর, তাই আসিতে আসিতে এক একবার দাঁড়াইতেছেন, কি

নদের নিমাই ।

ভাবিতেছেন, আবার আসিতেছেন, ঠিক যেন দিকভ্রান্ত হইয়াছেন ; বহু সন্তর্পণে নিমাই গুলাবের গৃহে আসিয়া দাওয়ায় বসিলেন । ভক্তগণ সেই আশ্রুভোলা, প্রেমোন্মাদ পুরুষটীকে ঘেরিয়া বসিল । সকলের মুখে হরেকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ বুলি শুনিয়া পণ্ডিতের যেটুকু জ্ঞান ছিল, যে বাহ্যজ্ঞানটুকু লইয়া তিনি এত দূর আসিয়াছিলেন—তাহাও তিরোহিত হইল । তিনি “হা কৃষ্ণ” হা কৃষ্ণ বুলিয়া ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন । মুচ্ছিত ইহবার সময় দাওয়ার একটা খুঁটি অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু খুঁটি সে দীর্ঘাকার পুরুষের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ।

পণ্ডিতের ভাবাবেশে পতন ও মুচ্ছা দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে, হায় হায় করিল উঠিল—মুরারি তাঁহাকে বাহবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন । মুচ্ছা এত গাঢ় যে জীবনের কোন চিহ্ন নাই—চোখের পলক পড়িতেছে না, মুখে ফেন নির্গত হইতেছে—খাস প্রখাস একেবারে বন্ধ দেখিয়া সকলে ভয়ে জড়সড় হইল এবং চক্ষে মুখে শীতল জল প্রদান করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, অহরহঃ হরিশ্বনি কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই সামান্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া “আমার কৃষ্ণ কই” হরি কই” বুলিয়া কাদিতে লাগিলেন, সোণার গৌরাঙ্গ ধূলি ধূসরিত হইল । ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হয় আবার “হাকৃষ্ণ প্রেমময়” বুলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন । নিমাইয়ের সে মধুর আবেশ ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন ।

এইরূপে বেলা প্রায় অপরাহ্ন হইল তথাপি কাহারও চৈতন্য নাই,—আহালাদি হয় নাই, কাহার স্নানাত্মিক পর্য্যস্ত বাকি রহিয়াছে, তথাপি নিমাইয়ের ভাব, তাহার অস্বাভাবিক বিহ্বলতায়, তাহারও তাহার

নদের নিমাই ।

সংসৃত মজিয়া গিয়াছেন, দৈনিক কর্তব্যাকর্তব্য তুলিয়া কেবল কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দাশ্র বিশর্জন করিতেছেন । নিমাই পণ্ডিত মুবারিকে বসিয়া নৃত্য করিতেছেন আৰ বলিতেছেন—ভাই, তোমরা সকলে কীর্তন কর, সংকীৰ্তন প্রেমভক্তি লাভেব একমাত্র উপায় । অমৃতময় কৃষ্ণ-নাম ভজিতে হইলে কীর্তনই পরম সহায় । তখন ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীৰ্তন আরম্ভ করিলেন । যখন ভক্তগণ সকলে উন্মাদ, তখন নিমায়ের পরম বন্ধু গদাধর প্রেমে মাতোষাবা হইয়া নিমায়ের পদতলে গড়াইয়া পড়িলেন । নিমাই গদাধরকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন—“তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া তুমি প্রভুকে বাধিয়াছিস্ গদা । প্রেম দে, আমি প্রেমের ভিখারী ।” আজ নিমায়ের এই অকিঞ্চন-মধুর-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে প্রেমাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কাহার দ্বিধা রহিল না ।

প্রায় সন্ধ্যার সময় সংকীৰ্তন সাজ করিয়া ভক্তগণ বাড়ী গমন করিলেন, নিমাইও টলিতে টলিতে গহাভিমুখে রওনা হইলেন । সমস্ত দিন আহার হয় নাই—ধূলি ধূসরিত শ্রীঅঙ্গে অনর্গল ঘাম বরিয়া কদমাক্ত হইয়াছে । একমাত্র পুত্র আহার করে নাই, জননী কেমন করিয়া অন্নগ্রাস মুখে তুলিবেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা হইলেও হিন্দুর ধর্ম্মাত্মসারে স্বামীর অগ্রে কেমন করিয়া ভোজন করিবেন ? তাঁহার ক্ষুধার যত কষ্ট না হউক, পতির অদর্শন বড়ই প্রাণান্তিক হইয়া পড়িয়াছে । সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নিমাই বিভোর প্রাণে, আলু থালু বেশে গৃহপ্রাঙ্গনে গিয়া দাড়াইলেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, পতি দর্শনে তাঁহার সকল কষ্ট নষ্ট হইয়া অন্তরে আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল । তিনি

নদের নিমাই।

শশবাস্তে পদপ্রক্ষালণের জন্তু কারী পূর্ণ জল, গামছা আনিয়া দিলেন। শচী দৌড়িয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া পুত্রের কোমল অঙ্গ মার্জন। করিয়া স্নান কবাইয়া, আহার দিয়া বলিলেন, “হা নিমাই! এই করে কি শবীরটাকে ম’টী করিবি বাবা। দেখ দেখি, সমস্ত দিন খাওয়া না হওয়ায় কত কষ্ট হলো।” নিমাই ভোজন করিতে কবিত্তে বলিলেন—“মা! কুট্ট নাম কবিলে শরীর নষ্ট হয় না, আব না খাইয়াও কুট্ট পুট্ট হয়।”

ভক্তগণ বাহিরে অপেক্ষা কবিত্তেছিলেন, নিমাই গৃহপ্রবেশ করিলে শ্রুতি, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি স্ব স্ব আবাসে গমন করিতে কবিত্তে ভাবিত্তে লাগিলেন—জগন্নাথের পুত্র নিমাই কি শক্তি পাউয়া একপ ভাবগ্রস্ত হইল, এ ত সামান্য অদৃষ্টের ফল নহে? যে সে মাছুষের ভাগ্যে ইহা ঘটে না, তবে কি নিমাইরূপে ভগবান ধরা পবিত্র কবিত্তে, বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ধীপনা করিতে, শাস্ত্র-বৈষ্ণবে সম্ভাব সংস্থাপন করিতে, নবনের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন? প্রভু! এস, তোমার ভক্তগণ আর কতকাল দিশাহারা হইয়া বেড়াইবে?

শচীনন্দন নিমায়ের নাম একদিন পণ্ডিত বলিয়া যেমন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল; সকলেই যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত আখ্যায় তাঁহাকে আখ্যায়িত করিত। আজ আবার সেইরূপ অদ্বিতীয় ভক্ত বলিয়া, অবতার কল্প মহাপুরুষ বলিয়া চারিদিকে তাহার নাম পরিকীর্তিত করিতে লাগিল। নিমাই যেমন পণ্ডিত, তেমন ভক্ত, বুঝি এমন প্রেমোন্মাদ ভক্ত আর কোথাও জন্মে নাই! নিমাই কি এক আকর্ষণী শক্তি বলে, কি এক সম্মোহিত মন্ত্রবলে সকলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নানা স্থান

নদের নিমাই ।

হইতে ভক্তগণ দিন দিন তাঁহার দর্শনে ধন্ত হইতে আগমন করিতে লাগিল । ছাত্রদের ত কথাই নাই, নিমাইয়ের টোলে পড়িতে হয় না, তিনি একবার মাত্র কটাক্ষ করিলে মূৰ্খ ছাত্রও পণ্ডিত হয়, গুনিয়া নানা দেশ হইতে তাহার তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

একীকরণ চেষ্টা ।

নিমাই প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন, স্নানাদি করিয়া টোলে কিয়ৎক্ষণ ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন কিন্তু তাহাতে পূর্বের ত্রায় লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। যেন এত লোক সংসর্গ তাঁহাব আর ভাল লাগিত না। গয়া হইতে আসিয়া নিমাই বড় নির্জনপ্রিয় হইয়াছেন, একাকী এক স্থানে বসিয়া থাকিতেন, গৃহে অর্গল দিয়া যোগ সাধনা-করিতেন। তিনি কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দ পাইয়া পাগল হইয়াছেন, অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই আনন্দ সাধাবণে বিলাইতে হইবে, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ কবিতো হইবে, শাক্ত-বৈষ্ণব এক কবিতা দেশের উদ্ধার সাধন কবিতো হইবে।—এখন ইহাই তাঁহাব ঐকান্তিক ইচ্ছা।

মাত্স্য যে ভাবেই সাধনা করুক, নদী যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক, পবিশেষে সাগরে আত্মসমর্পণই তাঁহাব উদ্দেশ্য। সাধন-ভজন সমস্তই এক, সকল সাধকই সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জগুই সাধনা কবে, তবে তাহাদেব মধ্যে এত ভেদ জ্ঞান কেন? শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ কেন, আর এই সকল লইয়া তাহাদেব মধ্যে এত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, পরস্পর মিলন সংঘটন হয় নাই বা কেন? এই বিরোধ ভাব ঘুচাইয়া সকলকে এক প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই এখন নিমাইয়ের ইচ্ছা হইয়াছে। কে বলে শাক্ত-বৈষ্ণব দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়!

নদের নিমাই ।

শক্তিও যে, বিষ্ণুও সে, প্রকৃতি পুরুষ লইয়াই ত জীব, প্রত্যেক জীবেরই পুরুষ-প্রকৃতি—স্ত্রীপুরুষ সংযোগ রহিয়াছে, তবে এ পার্থক্য কেন ? শক্তিহীন পুরুষ শব্দপ্রায় ! শক্তি না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, আর বিষ্ণু না থাকিলে এ শক্তির উৎপত্তিও অসম্ভব ! এইজন্য বিষ্ণুর উপাসনা ও শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে । একা পুরুষের বা একা শক্তির কোন ক্ষমতা নাই, কেবল মাত্র স্ত্রীর রজঃ জীবোৎপত্তির কারণ নহে, তাহাতে পুরুষ শুক্লের সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যক, কেবল রজঃ বা কেবল শুক্ল জীবোৎপাদক নহে । এই হেতু প্রত্যেক জীবের স্ত্রী-পুংস্ব বর্তমান স্বাকায় অভেদ ভাব, দেখিতে গেলে পিতা ও মাতা এক ; তবে তাঁহাদের সাধনায় এত ব্যভিচার, এত ঘেঁষাঘেঁষী কেন ? আমাদের এই সমস্ত বিবেচ্য ভাব ভঞ্জন করিতে হইবে, ধরায় প্রেমের বন্যা বহাইয়া মানুষকে প্রেম-ভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে । যাহাতে জীব পরস্পর ভালবাসায় মাথামাথি হইয়া এক হইয়া যায়, বিশ্বজনীন প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতঃ ভগবানের প্রেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া আপন জীবনের আৰ্জি পেশ করিতে পারে । জগতে এই মহা শিক্ষার প্রচার করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ।

সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইলে শক্তি সাধনার আবশ্যক । নিমাই নিৰ্জনে কুলকুণ্ডলিণীর উদ্বোধন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেন । প্রাণায়াম দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মরক্তে প্রেমময়-প্রেমময়ীর প্রেম সম্বিলনে উদ্ভূত প্রেম-স্বপান করিয়া অমানুষিক বলে বলীয়ান হইলেন ।

সামান্য শিক্ষিত লোকে তন্ত্রশাস্ত্রটিকে বেদবহির্ভূত আধুনিক বলিয়া মনে করে কিন্তু অদ্বিতীয় পণ্ডিত বেদজ্ঞ নিমাইয়ের নিকট ত তন্ত্রশাস্ত্র

নদের নিমাই।

সেকপভাবে অনাদৃত হইতে পাবে না? তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন—বেদের মন্ত্র বিভাগই তন্ত্র, ইহাব সাধনাতেই জীব শিব হয়, ভক্তিমুক্তি ববতল গত করিতে পারে।

শক্তি ছোট, প্রেম বড়। ভক্তির বাজহু ছাড়িয়া যিনি প্রেমের বাজহু পৌছিয়াছেন, প্রেমের গভীরতায় যিনি ডুবিয়া পড়িয়াছেন—তাঁহাব নিকট কোন উপাসনা পদ্ধতিই উপেক্ষিত হইতে পারে না। তিনি জানেন,—পথ ভিন্ন কিন্তু গন্তব্যস্থান এক, সম্মিলনক্ষেত্র অভিন্ন। যাহাবা প্রেমের দরবাবে পৌছায় নাই, তাহাদের নিকট শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভেদ ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে। নিমাই সর্বধর্ম সমন্বয় কবিবাব জন্ম, ভেদভাব রহিত করিয়া সকলকে সম-স্বত্রে-গাথিবার জন্য এইবার উঠিয়া পাড়য়া লাগিলেন। হিন্দু মুসলমানে বহুদিন পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের একস্বত্রে গাথিবার উপায় নাই; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে যদি সম্প্রদায় ভেদে এইরূপ মনোমালিন্য থাকিয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু বহু, তাহাদের সনাতন ধর্ম কেমন করিয়া বজায় থাকিবে? নিমাই অসীম শক্তি সম্পন্ন, শটানন্দন বিশ্বস্তর আদিতীয় নৈয়ামিক, কিছু দিনের পর যোগশক্তি সম্পন্ন হইয়া সমাজে মেশামিশি কবিতে আরম্ভ করিলেন।

নিমাই ভাবিলেন—কলির প্রধান সাধনা তন্ত্র কেন হইল? পরম পণ্ডিত স্থির বুঝিলেন—তন্ত্রোক্ত সাধনাট এক সময় দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর যখন ক্ষত্রিয়-শক্তি এদেশে হইতে বিলুপ্ত হইল, সেই সময় বুদ্ধদের অহিংসা পরমোদ্যম প্রচার করিয়া দেশে ভুমূল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ভগবানের নবমাবতার বুদ্ধদেব,

নদের নিমাই।

হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির প্রচার করিলে দেশ যখনগণের অধিকৃত হয়। সে সময় সাধকগণ, ঋষিগণ, যদি এদেশে তত্ত্বোক্ত বীর ভাবের প্রচলন না করিতেন, তাহা হইলে দেশবাসী সমস্তই মুসলমান হইয়া বাইত। সেই সময় শক্তি সাধক মহারাষ্ট্র বীর শিবজী, রাজা কংস, রাজা প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থান না হইলে হিন্দুর অবস্থা, তথা দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইত; এইজন্য তত্ত্বের সাধনা সে সময় প্রচলিত করা খুব সমীচীন হইয়াছিল।

এক্ষণে সে অবস্থা আর নাই, মুসলমানগণ আর তাদৃশ দুর্দ্বন্দ্ব নহে। দিল্লীর অবস্থাও অবসন্ন প্রায়, বঙ্গদেশে হোসেন সাহ শাসন কর্ত্তা রূপে অধিষ্ঠিত। নবাবীপের বেলপুখুরিয়ায় চাঁদ খাঁ, আর শান্তিপুরে মলুক চাঁদ, ইহারা সময়ে সময়ে হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করে; সেই অত্যাচারের প্রশমন করলে এ দেশীয় হিন্দুগণ এখনও বীরাচারের বশীভূত কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে বাইতেছে, যথার্থ গুরুর অভাবে এমন প্রাণারাম উপাসনাটিকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। সকল বিষয়েই সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি লাভের উপায় নাই, বিশেষতঃ তত্ত্ব, জ্যোতিষ, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে বহু গুপ্ত বীজমন্ত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যাহা সাধন-সিদ্ধি গুরু ভিন্ন অন্যের বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, কেবল অভিধান বা ব্যাকরণের সাহায্য লইয়া বন্ধিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময় বিপরীত ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। সাধনতত্ত্বে তত্ত্ববান মহামনীষী নিমাই বুঝিলেন—সাধকের সাধনা অধিকার ভেদে গুরু কর্ত্তক নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইহাতে সকাম-নিকাম দুইই আছে। ত্রীশ্রীচণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈষ্ণৱ মেধস্ব মুনির উপদেশে ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। রাজা

নদের নিমাই !

স্বরথ শত্রুগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত আর বৈষ্ণৱ স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক নিজ সম্পত্তি হইতে অধিকার চ্যুত । দুই জনেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, বাজা স্বরথ সকামভাবে উপাসনা করিয়া স্বতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, আর সমাধি বৈষ্ণৱ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পথের পথিক হইলেন । মেধম্ ঋষি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, অধিকার ভেদে সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া দুই জনের বিভিন্ন গতি লাভ হইল । অতএব জানী, সাধন-সিদ্ধ, তাত্ত্বিক গুরুর অভাব বলিয়া সদাশিবের তত্ত্ব শাস্ত্রটী এমন ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সাধকের মনে আধুনিক বলিয়া সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে । শক্তি না জন্মিলে কার্য্যসিদ্ধি কোথায়, শক্তি না থাকিলে কোনও সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ? তবে অধিকারী অনধিকারী গুরুব দ্বারা নির্দোষিত হওয়া দরকাব, এখন তাহা চয় না বলিয়াই এত বিরোধ, এত মতবৈধ, এত মারামারী, এত কাটাকাটি, আর শাস্ত্র-বৈষ্ণবের এত কলহ-বিবাদ । এই বিবাদ ভঙ্গন করিয়া সকলকে এক করিতে হইবে, এক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তি অভেদ ভাবে ভাবিতে শিখাইতে হইবে । ইহাই নিমাইয়ের প্রাণের ভাব । যে ষথার্থ বৈষ্ণব সে শক্তি ছাড়িয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না, যে ষথার্থ শাস্ত্র সেও বিষ্ণু ভক্তি ছাড়িলে শাস্ত্র নামেব অযোগ্য । হৃদে কালী, বর্হি শিব, বদনে হরি এইত সকল সাধকের সাধনার মূলমন্ত্র । রাধা ও কৃষ্ণ যে এক, অতএব শক্তি ছাড়িয়া সাধনা কেমন করিয়া হইতে পারে ? প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যে রাধা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, শ্রীরাধারও ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নহেন, শক্তিমান ও তাঁহার শক্তিতে প্রভেদ কোথায় ? বিষ্ণুর ক্লাদিনী শক্তি যে রাধা, শিবের জগৎ প্রসবিনী শক্তি যে আত্মা শক্তি ।

নদের নিমাই ।

হায় ! সাধনার বিষয় না বুঝিয়া, প্রেমময়ীর প্রেম-হৃদে অবগাহন না করিয়া, সাধারণ মানব যাহারা সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে তাহাদের এইরূপ ভেদজ্ঞানই হইয়া থাকে । আমিও উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া শাস্ত হইয়াছিলাম, তারপর পিতৃ আজ্ঞায় রাধা নামে বিভোর হইয়া প্রভূত বিজ্ঞা-বৈভব, যশসৌভ উপার্জন করিয়াছি কিন্তু ইহাতে কি হইবে, কেবল আপনার লইয়া ত সব নহে ? সবকে আপনার করিতে হইবে, আরঙ্গ স্তম্ভ পর্যন্ত জীবকে, আচণ্ডাল মনুষ্যকে সেবা করিয়া—প্রেমদান করিয়া আপনার করিতে হইবে ! তাহা হইলে মুসলমান শক্তি আর দেশের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না । দেশবাসী একতাবদ্ধ হইলে আর ভয় কিসের ?

ভক্তিতে ভরা, প্রেমে পূরা হৃদয় লইয়া নিমাই এইবার দেশের কাছে মুগ্ধ হইলেন, দীন-দুঃখী-আর্তের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন । বৈষ্ণবগণকে প্রেম বিলাইয়া তিনি হরি সংকীৰ্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তাঁহার সেবাত্রতে, তাঁহার সাধন ভঞ্জে ও নাম সংকীৰ্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবের দল তাঁহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইলেন । শান্তভক্তগণও নিমাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া, কি এক অপার্থিব সৌজ্জন্যে নিমাইকে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভাল-বাসিতে লাগিলেন কিন্তু বীমাচারী সাধকগণ তাঁহার এতাদৃশ ভাবকে মানবের চিন্তদৌৰ্বল্য ভাবিয়া মিশিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহার এই ভাবকে অধঃপতন বলিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা করিয়াও বেড়াইতে লাগিলেন ।

যিনি স্বয়ং শক্তিধর, ঈশীশক্তি যাহার মনে প্রাণে গাথা, তিনি

নদের নিমাই ।

মানুষের নিন্দা বা তিরস্কারে ভীত হইবেন কেন? বরং ঐ সকল অপরিণামদশী লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আপনার দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাই এখন আর ছাত্র পড়াইতে পারেন না। অধ্যয়নের সময় শাস্ত্র বিষয়ক কোন মীমাংসা করিতে হইলে তর্ক করিতে হয়, তিনি এখন আর তাহা করিতে চাহেন না। নিমাই বিজ্ঞান গুরু পদদলিত কবিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন—“বিশ্বাসে মিলায় রুষ, তর্কে বহুদূর।” ভগবদ্বিষয়ে তর্ক করিতে নাই—তর্কে সেই অসীম অনন্ত শক্তিমান ভগবানের বিষয় কিছুই নির্ধারণ করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তিনি ছাত্রগণকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করাইতে করাইতে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কিছু পাইতেন—তাহা হইলে এমন বিভোর হইয়া যাইতেন—হৃদয়ে এমন প্রেমভক্তির সঞ্চার হইত যে তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধীস্থ হইয়া লুটিয়া পড়িতেন, কখনও বা তন্ময় ভাবে কাঁদিয়া আকুল হইতেন—কাজেই ছাত্র-পড়ান আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। কখন কখন নিমাই শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া অবসন্ন দেহে মুচ্ছা প্রাপ্ত হইতেন—ছাত্রগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিত—তখন নিমাই রাধাকৃষ্ণের প্রেম তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেন, হুই চক্ষে প্রেমধারা বহিত। একদিন তাঁহাদের গ্রামস্থ রুক্মিণী আচার্য্য নিমাইকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন; নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন—নিমাই তাঁহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পরীক্ষার অতীত। এ নিমাই কে? তবে কি জীবের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, স্বাধী রূপে কি ভগবান ধরার বাধা-বিপত্তি হরণ করিতে নিমাইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

নদের নিমাই ।

নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিলেন না ।
বধুমাতার স্নানমুখ, তাঁহার প্রাণের দুঃখ বুঝিয়া শচীদেবী প্রত্যহই
গঙ্গাদাসকে জানাইতেন—কত দুঃখ করিতেন, বলিতেন—“বড় আশা
করিয়া নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলাম কিন্তু সে যেরূপ ভাবে
উন্নত হইয়াছে—তাঁহাতে আমার সকল আশায় ছাট পড়িল ।”
গঙ্গাদাস বৃদ্ধার মন্বাস্তিক দুঃখ বুঝিয়া একদিন নিমাইকে ডাকিয়া
পাঠাইলেন । গুরুভক্তি পরায়ণ নিমাই গুরুর কথা অবহেলা না
করিয়া সেইদিন ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে গুরুসদনে উপস্থিত হইলে—
গঙ্গাদাস তাঁহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন । গঙ্গাদাস জানিতেন—
পাণ্ডিত্যই জীবনের সাব কিন্তু আজ নিমাইয়ের এই প্রেমপূর্বিত মূর্তি
দেখিয়া গঙ্গাদাস মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া বলিলেন—এ কি মহামূর্তি,
না দেবমূর্তি ! এঁক আমাব ছাত্র নিমাই ! না আমার প্রভু প্রভু
শ্রীভগবান ! নাস্তিক গঙ্গাদাস মুগ্ধনেত্রে বলিলেন—“বাবা নিমাই !
তোমার যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপূর্বিত—পাণ্ডিত্যে তুমি নবদ্বীপের কেন,
ভারতের অদ্বিতীয় হইয়াছ কিন্তু বাবা, তোমার মত লোকের কি
জননী ও পত্নীকে দুঃখ দেওয়া উচিত ? তোমার মা প্রত্যহ আমার নিকট
আসিয়া কত কান্নাকাটি কবেন, তুমি তাঁকে সান্ত্বনা কর, তাঁর আশীর্বাদ
গ্রহণ কর—জননীর আশীর্বাদ পুত্রের সকল মঙ্গলের আশ্রয় ।” নিমাই
বুঝিলেন—তাঁহার জননী, তাঁহার আচার ব্যবহারে বিবর্ত হইয়া গুরুর
নিকট অনুরোধ কবিয়াছেন । তিনি নতমস্তকে বলিলেন—“আপনার
আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আজ হইতে আমি আব বাটী বাহির হইব না ।”
নিমাই চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে শিষ্যগণ সহ ঘরে বসিয়া

নদের নিমাই ।

সংকীৰ্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন । শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া আকাশের
চাঁদ হাতে পাইলেন ।

পূৰ্বে বলা হইয়াছে—ছাত্র পড়ান নিমাইয়ের পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব
হইতেছে । তথাপি ছাত্রগণ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেনা । তাঁহার সেবা
শুশ্রূষা, তাঁহার দর্শন-স্পর্শন, তাঁহার শ্রীমুখের করুণ উপদেশবচন শুনিলে
পুস্তকপাঠ অপেক্ষা লক্ষগুণ কাজ হইয়া থাকে, তাহারা এমন মহাপুরুষের
আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে ? ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই সংকীৰ্ত্তন
করেন, ভাবে বিভোর হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দেন । ছাত্রগণ এবং
উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবেন—ইনি নিশ্চয়
কোন দেবতা, পাপীতাপী উদ্ধারের জন্ত মানব জন্ম ধারণ করিয়াছেন ।
কাহ্নেই এ ভাবের ভাবুক কি কেবল পুস্তক পাঠের ভাবনা চিন্তা সংঘত
করিতে পারেন ? জ্ঞান হইলেই নিমাই তাহাদের নিকট লজ্জিত হইয়া
পড়েন, তাহাদিগকে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না
বলিয়া কত দুঃখ করেন । কিন্তু কি করিবেন—এত চেষ্টা করিয়াও
তিনি আশ্বস্তার সংবরণ করিতে পারেন না, কৃষ্ণকথা শুনিলেই তিনি
জ্ঞানহারী হইয়া পড়েন । প্রেমময়ের প্রেমতরঙ্গে যে এমন ভাবে
ডুবিয়াছে, অধ্যাপনা কার্য কি আর তাহার দ্বারা সম্ভব ? তাই একদিন
ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—“ভ্রাতাগণ ! আর
আমার দ্বারা তোমাদের পঠনপাঠন হইবে না ; আমি তোমাদিগকে বুখা
আর সময় নষ্ট করিতে বলি না ; তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্তত
গমন কর”—এই বলিয়া নিমাই কাঁদিতে লাগিলেন ।

অধ্যাপকের মুখে এই নির্দ্যত বচন শুনিয়া ছাত্রগণ অধৈর্য্য হইয়া

নদের নিমাই।

পড়িল ; কাদিতে কাদিতে বলিল—“প্রভু ! আপনার নিকট বিদায় হইয়া অগ্রত্ন আমরা আর কি শিখিব ? আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা অপরের দ্বারা হইবে না, শিক্ষার যাহা চরম উদ্দেশ্য—তাহা আমাদের লাভ হইয়াছে। তবে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ; ইহা ভাবিতেও আমাদের প্রাণ অস্থির হইতেছে, বোধ হয়—আপনার পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে আমরা পাগল হইয়া যাইব, অথবা আমাদের জীবনভার বহন করা দুঃসাধ্য হইবে।”

তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের রতিমতিও আশ্চর্য্য দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত কাদিয়া আকুল হইলেন। শেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—
ভাই সকল ! আমার ত্বায় সামান্য ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে যদি তোমাদের এতই অনিচ্ছা, তবে গিয়া কাজ নাই। আমি তোমাদের অধ্যাপকরূপে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদে যদি আমার ভিলমাত্র রতিমতি থাকে, তাহা হইলে তোমরা যে বিত্তা শিক্ষা করিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের অবিত্তা নাশ হইবে, আর কোন শিক্ষার আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে মানব জীবনের মহাশিক্ষা কায়মনোবাক্যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহার গুণগাণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। এস ভাই সকল ! আজ এই দীন হীনকে রূপা করিয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ কর, কৃষ্ণ কীর্তনে দেহ মন পবিত্র কর। ভাই ! কলিতে নাম ভিন্ন অস্ত্র উপায় নাই ; “হরে নামৈব কেবলম্ করৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্তথা”। কলিযুগে অস্ত্র যাগ-যজ্ঞ, বার-ব্রত, পূজা-অর্চনা কিছুই আবশ্যক নাই ; অল্লায় কলির জীবের পক্ষে নামের তুল্য এমন অনায়াসসাধ্য ভবাক্তি নিস্তারের উপায় আর কি আছে? নিমাই ভক্তগণ-

নদের নিমাই ।

সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনে মাতোয়াবা হইলেন, নিমাইয়ের সেইদিনকার কীর্তন শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল । ভাব বিভোব নিমাই সকলের পদে ধবিয়া প্রেম ভিক্ষা কবিত্তে লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা, ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন, তাহাব উপর আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া প্রভু সকলকে সংকীর্তন-মাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিলেন, তাঁহাব সহিত যোগদান করিয়া সকলকে কীর্তনানন্দ উপভোগ কবিত্তে অনুরোধ করিলেন । দর্শকবৃন্দ সকলেই শ্রীগোবিন্দেব সেদিনকার ভাব দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে অবতার কল্প মহাপুরুষ বিশ্বাস কবতঃ শাহার অন্তর্গত লাভে ধন্য হইতে লাগিল ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

নিত্যানন্দ সম্মিলন ।

প্রবৃত্তি ও আসক্তিই সর্বনাশের মূল । অতিরিক্ত পণ্ডিত হইলেও, শাস্ত্রপাঠে ভালমন্দ জ্ঞান থাকিলেও অনেক সময় লোভ পরতন্ত্র হইয়া মানুষ বিবেক বহির্ভূত কার্য্য করিয়া ফেলে, এইজন্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা সর্বাগ্রে আবশ্যক । তন্ত্র এইজন্য নিম্নাধিকারীর পক্ষে কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন । যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইরূপ আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া, তামসিক—রাজসিক ভাবে গঠন করিয়া তবে সাত্ত্বিকভাব উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । নতুবা একেবারে জ্যাগ সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নয় ।

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন—সত্ত্বগুণাবলম্বী না হইলে মুক্তি নাই, বৈষ্ণবশাস্ত্রও তাহাই বলেন কিন্তু তাহা কয় জনের পক্ষে সম্ভব ? সকল বৈষ্ণবই কি সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে কি আসক্তি বা প্রবৃত্তির ছাপমারা লোক নাই—নিশ্চয়ই আছে ? তবে বৈষ্ণব গুরু হয়ত ঐ সকল লোককে বিষ্ণু উপাসনার অল্পযুক্ত বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবেন ; কিন্তু সার্বজনীন তন্ত্রশাস্ত্র কাহাকেও ফেলিবেন না, তাঁহার শ্রামতরু ছায়ায় সকলকেই স্থান দিয়া ধীরে ধীরে তামসিক, রাজসিক প্রভৃতি মার্গ দিয়া সাত্ত্বিক ভাবে বিশ্বজননীর দরবারে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত করিয়া দিবেন । শাস্ত্র-বৈষ্ণবে এইটুকু মাত্র পার্থক্য ।

নদের নিমাই :

পূর্বেই বলিয়াছি—শাক্ত না হইলে, ভজন-সাধনে শক্তিমান হইয়া প্রেম-ভক্তি প্রকয় না করিলে, ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হওয়া কোন সম্প্রদায়ের সাধকের পক্ষেই সম্ভব নহে। এইজন্য প্রবৃত্তি বা আসক্তির হাত এডান একান্ত আবশ্যিক। সে দিন কৃষ্ণকীর্তনে নিমাইয়ের ভক্তিভাব, তাঁহার ভাব-তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিয়া অনেকে তাঁহার আকর্ষণে নত হইয়া ঐচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক বড় বড় শাক্ত পণ্ডিত আবাব তাঁহাকে দুর্বল চিত্ত বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিল, এরূপ ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়াও তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইল না। তাঁহারা পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হইলেও এতদিনের আসক্তি-অভ্যাস, মন্ত্য-মাংস ভক্ষণে বাহ্যিক আনন্দ-উল্লাসের প্রলোভন চাড়িতে পারিলেন না। এই জন্য মোহবশে নিমাইয়ের প্রদর্শিত পথে ভ্রমণ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইলেন না, বলিলেন—“নিমাই ভাগ্যবশে বড় পণ্ডিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সে দিনকার ছেলে, সাধন ভজন কবে শিখিল যে, তাহার আকস্মিক একটা ভাবে মজিয়া আমরা এতদিনের পুরুষ পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিয়া ভেঙ্কুইব ?

নিমাইয়ের উদ্দেশ্য সকলকে এক করা, শাক্ত-বৈষ্ণবে আর পার্থক্য না থাকে। যখন উদ্দেশ্য এক এবং মহান, তখন ভেদাভেদ না থাকাই ভাল। পরম বৈষ্ণবী মায়ের ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিতে রতিমতি হীন হইবে কেন ? আর সকল শক্তির আধার বৈষ্ণবগণেরই বা তাহাদিগকে ভাই ভাই না বলিয়া শত্রুভাবে ভাবিবার উদ্দেশ্য কি ? নিমাই সকলেরই প্রিয়, তিনি বৈষ্ণবের যেমনি অঙ্গুগত, শাক্তেরও তেমনি। তাঁহার চক্ষে সকলেই এক এবং অভেদ, কেমন

নদের নিমাই !

কাবয়া এই অভেদ ভাব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচাব কবিতেন, নতুবা
পারিতো লাগিলেন ।

এখন নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ ভাবের কথা নাই । শ্রীবাস, ওঁর মূর্ত্য তেজে
মুখাবি প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কবিবর্তেছেন । নিমাই এখ. ১ । নিমাই
প্রবণ, বাহ্যিক পূজাদিতে তিনি আব বত থাকিতে পারে. ১ অভিবাদন
দেবতা বধুনাথেব ব্যান কবিয়া তুলসী দান সময়ে তাঁহার প্রা এ জন্ম ত
বিষ্মল হইয়া পড়ে যে, আব কোন মন্ত উচ্চারণ কবিবাব না. ৩ যাছ, তবে
তন্ময় হইয়া কেবল চক্ষের জলে নু ক ভাসান, কখন বা : ১ করিলেন,
পড়েন । কখন কখন তুলসী তলায় যাইয়া প্রয়োমগ্ন ভাবে
থাকেন, প্রভু ভাব দোখিয়া ভক্তগণ তাহাতে যো. ১। তাঁহার
সে নৃত্য বড় বিষম হইয়া দাঁড়ায়, শচী অনেক কষ্টে তাঁহ. ১ পদ্মাবতী ।
কবিয়া পুত্রের স্নানাতাবেব ব্যবস্থা কবেন । সমস্ত দেশ ১ই পণ্ডিতের
মাতিয়া উঠুক, নবদ্বীপ হরিনামেব বজ্রায় ভাসিয়া থাক, বস ১ থিয়া পণ্ডিত
আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করুন—নিমাইয়ের এই ললেন,—“কি
শাক্ত পণ্ডিতগণ কেহই তাঁহার সহিত যোগদান কবিলেন ১ব আশা পূর্ণ

এই সময় শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বপাদেশ পাইয়া নিত ১
আসিলেন । ভগবানেব দর্শন জন্ত নিত্যানন্দ অবধূত বে ১ হাবাই পণ্ডিত
বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইবাব সময় প্রত্যাদেশ পাইলেন, ১া করেন না ।
জন্মগ্রহণ কবিয়াছি, তুমি নবদ্বন্দাবন নদীয়ায় আসিয় ১টাকে প্রার্থনা
মিলিত হও।” বলবামেব অবতাব নিত্যানন্দ সানন্দময় ১ মনে ধারণাও
চিত্তে কনিষ্ঠেব দর্শন মানসে নবদ্বীপে উপস্থিত হ ১ না পদ্মাবতীকে
নবদ্বীপের বন বিটপী বৃন্দাবণের মত ফল ফুলে ভবা, ১ ১ ব্যাঘাত ঘটবে,

নদের নিমাই ।

যব গুণগানে বিভোর । নিতাই আজ নিমাইয়ের সহিত
প্রাণে অপাব আনন্দ ; তাই বুঝি আজ নদীয়া স্বর্গের সুষমা
টয়াছে ?

ঈশ জানিতে পারিয়াছেন—আজ তাঁহাব প্রাণেব ভাত-সম্মিলন
চার্য্যেব ভবনে সংকীর্ণনেব সূত্রপাত হইয়াছে । নয়নাচার্য্য
এ প্রভুৰ অর্চনা কবিয়া বাহিব হইয়াছেন, এমন সময় প্রাণের
সতে হাসিতে উপস্থিত । আচার্য্য অভিবাদন কবিলেন ; নিমাই
ন করিলেন । আচার্য্যপত্নী নিমাইসুন্দরকে আহ্বান কবিলেন,
ঐ হাসিতে হাসিতে জননী সদনে উপস্থিত হইলেন । আচার্য্য
ন—“নিমাই, বহুদিবস তোমাকে কিছু খাইতে দিই নাই,
এ পূজা কবিয়া গিয়াছেন, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কব । নিমাই
সতে ঠাকুর ঘরে গমন কবিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তারপর
ইয়া বিষ্ণু খট্টায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

এ বাহিরে আসিলে এক অপরূপ অবধূত আসিয়া বলিলেন—
“চার্য্যেব বাটা ?” আচার্য্য বলিলেন,—“এই দীনের কুটীর,
শুভাগমন ?” অবধূত বলিলেন,—“শ্রীধাম বৃন্দাবন, হইতে ।”
ব-চূড়ামণি দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন । এ দিকে
ন্দিরে প্রবেশ কবিয়াছে, আর বাহির য না দেখিয়া আচার্য্য
হইয়া দেখিলেন—নিমাই বিষ্ণু খট্টায় আর শ্রীমূর্তি
নিমাইয়ের সেই ভগবান ভাব দেখিয়া আচার্য্য পত্নী
তে গেলেন । অবধূত নিত্যানন্দের সহিত তিনি
—তাহাতে তাঁহাব বাঙনিম্পত্তি হইল না ।

নন্দের নিমাই ।

দিন এ ভাব বুঝিয়াছিলেন,—প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছে
বিষ্ণুমূর্তি নামাইয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিবে,—এ সাহস ক

প্রভু আড়নয়নে দেখিলেন—আর একজন নবোদিত
তেজীয়ান ব্যক্তি আচার্য্যের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিতেছে
ভাব পরিবর্তন করিয়া বাহিরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া
করিলেন । নিতাই বলিলেন,—“এ জন্ম ত চতুরালীর নয় ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীমতীর প্রেমস্বর্ণ শোধের জন্ত গ্রহণ করি
এত চাতুরালী কেন ?” নিমাই অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছা
নিতাই সংযতবাক হইলেন, প্রভুকে প্রণাম করিলেন ।

বর্ধমানের অন্তঃপাতী একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দের জন্মস্থ
পিতার নাম হারাই ওঝা, পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, মাতার না
নিত্যানন্দ যখন খুব বালক, সেই সময় হঠাৎ একদিন হার
নিকট এক সন্ন্যাসী আগমন করিলেন । সন্ন্যাসীর রূপ
সুস্তীত হইলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ মনে ভাবিয়া তাঁ
নিমিত্ত প্রভুর আগমন !” সন্ন্যাসী বলিলেন—“আগমন
করিতে পারিবেন কি ?”

“সন্ন্যাসীকে অদেয় কি আছে; প্রকাশ করিয়া বলুন !”
ভাবানন্দী, সর্বস্ব নষ্ট হইলে তিনি বাহা বলেন, তাহার অন্ত
বলিলেন,—“চেনা করিবার জন্ত তোমার পুত
হইল ।” সন্ন্যাসী এরূপ প্রার্থনা করিবেন—হারাই ইহ
ত পারেন নাই কিন্তু কি করিবেন—সন্ন্যাসীর প্রার্থ
মন । পতির সত্যভঙ্গ হইবে, তাঁহার ধর্ম

সহবাসী হইয়া কখনই তাহা হঠাতে দিবেন না। পদ্মাবতী অকাতরে
পুত্রের মায়া ত্যাগ কবিলেন। পিতা-মাতাব একমাত্র পুত্রকে অকাতরে
নাগ কবা বন্ধনাব অতীত বিষয় হইলেও, ওঝা-দম্পতী সন্ন্যাসীব
পাঠনা পূর্ণ কবিলেন। নিত্যানন্দও হাসিতে হাসিতে যেন কতদিনেব
পরিচিত ব্যক্তিব সহিত চাওয়া গেলেন। অনেকে বলেন—“এ সন্ন্যাসী
যাব কেহ নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—বিশ্বরূপ।

নিত্যানন্দ বহুদিন সন্ন্যাসীব সহিত তীর্থ ভ্রমণ কবিয়া শ্রীমুন্দাবনধামে
আসিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী তখন তাঁহার সহিত ছিলেন না। এই সময়
ঈশ্বৰপুত্রীও বৃন্দাবনে ছিলেন। ক্রমশঃ দিবহে নিত্যানন্দেব জন্মন দেখিয়া,
তান প্রভুব অবতাব গ্রহণেব ইন্দ্রিত জানাইয়া নবদ্বীপে যাইতে
বাগলেন এবং বজনি শেষে তিনিও স্বপাদেশ পাঠিলেন। নবদ্বীপে
আসিয়া নিমাই-পাণ্ডেব বাড়িব অধ্বসণে তিনি ভক্তপ্রবর নয়নাচার্যের
বার্তাতে উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে বেশী অধ্বসণ কবিতো হইল না,
প্রাণেব আকাজ্জা সেইখানেই পূর্ণ হইল। নিমাইয়েব শ্রীমুখে ভক্তগণ
শুনয়াছিলেন যে—এার একজন মহাপুরুষ শীঘ্রই নদীযায় আসিবেন,
তনি আমাদের সঙ্গে যোগদান কবিলে আমরা প্রেমতরঙ্গে নদীয়া
নাগাইতে পাবিব। তিনি প্রভূত শক্তিবর—তাঁহার শক্তি অত্যন্ত।

আজ সেই নিমাই-নিতাই একত্র মিশলেন, নদী-সাগরে আত্মাহারা
হইল, এবার দুকুল দাবনেব পালা পড়িল। ভক্তগণ দেখিলেন—
“এইবার শান্তিপূর ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়।” ভক্তপ্রবর নারদরূপী
অবৈত্যাচার্যের ভক্তভাবে শান্তিপূর প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছে, এইবার
নিমাই-নিতাই দুইজনে মিলিয়া, প্রেমের বজায় নদীয়া ভাসাইয়া দিবেন।

কাজেও তাহাই হইল, সেইদিন হইতে নিমাই-নিতাই বৈষ্ণবগণকে
লইয়া দিবাবাজ্ঞ এমন সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদের
তাণ্ডব-নৃত্যে রজনীতে নিজা যাওয়া দায় হইল। অধিবাসিগণ বাজন্মাবে
বিচাৰ প্রার্থী হইলেন। শাস্ত্ৰগণ এই অকাৰণ চীংকাবেৰ প্ৰতিকাৰ
কৰিতে বদ্ধপৰিকব হইলেন। দেশেৰ ৰাজা মুসলমান, স্ততবাং কাজী
শাস্ত্ৰগণেৰ পক্ষ হইলেন এবা শাস্ত্ৰগণ বৈষ্ণবগণকে দমনেৰ চেষ্টা কৰিতে
লাগিলেন। শাস্ত্ৰশিষ্ট নিমাইয়েব দল প্ৰশান্তভাবে আত্মবক্ষাৰ যত্নবান
হইলেন। দেশে একটা মহা ধৰ্ম্মবিপ্লব আৰম্ভ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

নিমাইয়ের মহত্ব ।

নবদ্বীপে তখন শক্তি-সাধকের সংখ্যাই খুব বেশী । রঘুনন্দন, রঘুনাথ, রুঞ্চানন্দ, কালীকান্ত, গঙ্গাদাস, শ্রামাদাস, প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত শক্তি-সাধক বর্তমান ; তাঁহারা যাবতীয় কাব্য তাত্ত্বিক মতেই সমাধা করিয়া থাকেন । যে দিকে পণ্ডিতের দল বেশী এবং তাঁহারা বাহা করেন অধিকাংশ লোকই যে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে—ইহার আর বিচিত্র কি ? এইজন্ত মুষ্টিমেয়, সামান্ত-বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় এতদিন মাথা তুলিতে পাবেন নাই । কিন্তু যে দিন হইতে গৌরানন্দেব অসীম শক্তি প্রভাবে, অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বৈষ্ণবের পক্ষে যোগদান করিলেন—সেই দিন হইতে বৈষ্ণবের দল বক্ষঃ বিস্তারিত করিয়া সকলের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল । তারপর যে দিন দ্বিতীয় শক্তিধর নিত্যানন্দ আসিয়া নিমাইয়ের সহিত যোগদান করিলেন—সেই দিন হইতে বৈষ্ণবদের প্রত্যাপে নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল ।

নিমাই শাক্ত-পণ্ডিতমণ্ডলীকে সন্মোহন করিয়া করযোড়ে কত ঘিমভি করিলেন ; নিজের দলভুক্ত হইতে কত সাধাসাধি করিলেন । কিন্তু তাঁহারা একে পঞ্চমকারে প্রভূত বীৰ্য্যবান, তাহার উপর রাজশক্তি তাঁহাদের পক্ষ ; কাজেই তাঁহারা সমভাবে অচল অটল রহিলেন এবং বৈষ্ণবগণকে কিছুতেই বাড়িতে দিলেন না । যাঁহারা ষথার্থ শক্তি-সাধক,

নদের নিমাই।

সাধন-শক্তিতে যাহারা প্রকৃত শক্তিমন্ত—তাহারা না ঠউন, সাধারণ ব্যাভচারী শাস্ত্রের দল সর্বনাশ হইল মনে করিয়া, প্রাণপণে বৈষ্ণবদের শত্রুতাচরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদের গৃহদ্বারে জবাফুল, মদের কলসী, মাংস, অস্থি প্রভৃতি শক্তিপূজাব উপকরণ সকল বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে লাগিল এবং বৈষ্ণবগণের এই প্রেম-সাধনাকে গুপ্ত-ব্যাভচার, নেড়া-নেড়ির কাণ্ড ইত্যাদি বলিয়া প্রচাৰ করিতেও ছাড়িল না।

নিমাই, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাহারা যথার্থ বৈষ্ণব. তাহারা এ সকল অত্যাচারে ভ্রক্ষেপ করিলেন না বা অপবিত্র বলিয়া শঙ্কিত হইলেন না, বরং পূজোপহার বলিয়া শির নোয়াইলেন। কিন্তু যাহারা সামান্য অধিকারী, তাহারা হাডে চটিয়া গিয়া শাস্ত্রগণের সহিত একটা বিষম সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা করিল। নিমাই-নিত্যানন্দ সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—“দৈহিক শক্তি প্রয়োগে কোন কাজ হইবে না; আন্তরিক শাস্ত্রের আকর্ষণ চাই। শাস্ত্রগণ যতই ঘৃণা করুক, তোমারা তাহাদের ঘৃণা বা নিন্দা করিবে না। সাধন-ক্ষেত্রে নিন্দার কিছু নাই, সাধনা সবই এক, প্রক্রিয়া বিভিন্ন মাত্র। সননের অপেক্ষা কর, এমন সময় আসিবে—যখন সকল শাস্ত্রপক্ষই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আপনারাই শাস্ত্রভাব ধারণ করিবে।”

নিত্যানন্দ প্রচার কাধ্যে ব্রতী হইলেন। নিমাই বগিয়া দিলেন—
‘আসক্তিই সর্বনাশের গোড়া, আসক্তি ও মোহবশেই শাস্ত্র-বৈষ্ণবে ভেদজ্ঞান।’ যতদিন জীবের আসক্তি থাকে এবং মোহমদিরা না ছুচে, ততদিন মায়াব স্বপথ-কুপথ চিনিতে পারে না। হাজার বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন,

নদের নিমাই !

গাঙিত হইলেও, তাহাবা নাৰ্কেণ্ডা বলদেব মত, কিম্বা মন্দিবামত
 নান্দেব মত চুনাছটী কবিত্তে থাকে। কিন্তু যখন নেশা ছুটীয়া যায়, মন
 অবসাদ গ্রস্ত হইয়া পড়ে—তখনই তাহাদের চৈতন্য হয়। শাক্তগণকে
 প্রবৃত্তি মন্য দিয়া নিবৃত্তি মার্গে আনয়ন কাহাই তত্ত্বের উপদেশ, কিন্তু
 ভাস এক না পাইয়া তাহাবা উন্মার্গগামী হইয়াছে। ভাই! তুমি প্রচার
 কাণ্ডে ব্রতী হইয়া কাহাকেও প্ররতিব পথে বাধা দিও না, তাহা
 হইলে হৈতে বাধাত হইবে এবং স্বকাৰ্য্য উদ্ধার হইবে না। হরিনাম
 মন জনিয় দে, হেলায় অশ্রদ্ধায় কবিলেও তাহাতে ফল হইবে।
 তুমি সকলকে নাম কবিত্তে বল, আসক্তি থাকিলেও বলিবে—
 ‘সুদত্ত বমণীক কোল, কই মৎসেব কোল, বোল এবি বোল।’ নামের
 কচি এবং ভাবে দ্বয়া আনিত্তে পাবিলেই, কাৰ্য্য উদ্ধারের আর ভালক
 থাকিবে না। ককক না সে অকাৰ্য্য, তথাপি নামের গুণে নিহিত
 সমস্ত ত্যাগ কবিলে। ভাই! এ নামে পাপী, তাপী সবাই পরিত্রাণ
 পাইবে—অতিবড় পাপগুণ এ নামে গলিয়া যাইবে। তুমি চিন্তা
 করিও না; যে যেমন ভাবে নাম কবিত্তে চায়—তুমি তাহাকে সেই
 ভাবেই নাম কবিত্তে উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণকুমার মহাপাপী বিষমঙ্গল
 একদিন দিক্‌ভ্রাস্ত হইয়া এই নামেব বলেই জীবনের উজ্জল পথ দেখিত্তে
 পাইয়াছিল। হরিনামই জীবের সঞ্চল, ইহা অন্ধের যষ্টি—পাপীর
 ভরসা। তুমি বিপথে যাইলেও এই হরিনাম-যষ্টি তোমাকে মোড়
 ফিরাইয়া সূপথে লইয়া আসিবে। এই মহাশক্তি সম্পন্ন হরিনাম-যষ্টি
 জীবকে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে লইয়া যাইবেই যাইবে।”

নিত্যানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাই করিত্তে লাগিলেন :

নদের নিমাই ।

ভগবদ্ভিষ্মায় তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে লাগিল। নিত্যানন্দর সেই মনোহর বেশ, শ্রীমাদ্ধর্ম পদ্মচক্ষু, সেই স্নমধুব কথা, সেই নম্রভাব দেখিয়া কেহ আর স্থির থাকিতে পারিল না; সকলেই হবিনামে মত্ত হইয়া পড়িল।

তখন নবদ্বীপে ঘরে ঘরে কালীপূজা হইত। এক বৎসব কান্তিকমাসে অর্মানশার দিন কালীকানন্দের বাটাতে মাতৃপূজার মহা আয়োজন হইয়াছে; বহু শাক্তভক্ত অজ সাধনপীঠে মাতৃ-চরণপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্ত সমবেত হইয়াছে। বামাচারীর নিয়মাবলীতে পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; চারিদিকে রণবাজের মত “নাচ দিগম্বী নাচগো” বাদ্যে ধোর ঢকা নিনাদ হইতেছে। রঘুনন্দন, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ অধিষ্ঠিত বীরাচারী সাধকগণ সমবেত হইয়া, গগনভেদী মাতৃনামের সংঘরবে দিক্‌মণ্ডল কম্পিত করিতেছেন।

নিমাই তাঁহাদের বয়োঃকনিষ্ঠ এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, এক গুরুর শিষ্য বলিয়া এই মহানন্দের দিনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর, হইয়াছে। নিমাই পদের মর্যাদা, জ্ঞানের অহঙ্কার প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়াছেন। আচণ্ডালে প্রেমদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, শত্রু মিত্র তাঁহার পক্ষে এখন সমান, অথবা তাঁহার শত্রু-মিত্র কেহ নাই। পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভগবতীর পূজা-আবাহনে উপস্থিত না হইলে ক্রটি বা ধুটতা দেখান হয়—এইজন্ত সশিষ্য নিমাই অমাবস্তার গভীর যামে যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন বাজে লোক কেহ ছিল না। মায়ের প্রিয় সাধকবর্গই তখন সশিষ্য নিমাইয়ের সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মাতৃমূর্তির সম্মুখে স্তম্ভর আসনে সমাসীন

নদের নিমাই !

করিলেন। প্রাঙ্গনে কয়েকটি ছাগশিশু রজ্জুবদ্ধ হইয়া লতাপাতা ভক্ষণ করিতেছে ; সম্মুখে নানাবিধ পূজোপহাৰ, তাহার মধ্যে বাকীগীপূৰ্ণ কয়েকটি মৃতভাগুও বৰ্ত্তমান বহিয়াছে। পূজক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মাযব সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট ; আজ সাধকগণেব বদনে মাতৃভক্তিৰ প্রবল উচ্ছাস, দেহে অমিত শক্তির প্রভাব আর অল্পব হঠাতে জলদগন্তীর স্ববে মাতৃনামেব ভক্তিভবা জয়ধ্বনি শুনিলে, বাস্তবিক হৃদয় স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যায়। ভাবোন্মাদ শাক্ত-ভক্তেব ভক্তিপুত, পৰ্ব্বজ আভিষেক-সলিলে স্নাত, স্বর্গীয় প্রভাজ্ঞান-মণ্ডিত মাতৃমূর্ত্তির প্রতি একাগ্রচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া, শচীনন্দন নিমাই অশ্রুধ্বলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ফেলিলেন। তাবপর একেবাৰে সংজ্ঞাশূন্য, একেবারে সমাদৌস্ত হইয়া ভাবে বিভোব হইয়া পড়িলেন, চক্ষে আর পলক পড়ে না, হৃদয়স্ত্র নডনচডন বহিত হইয়া গিয়াছে। প্রেমোন্মাদ নিমাই সৰ্ব্বলোকেই মহাভক্ত বলিয়া ভক্তি করিতেন এবং সাবন-বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও, নিমাই যে অতুলনীয় সাধক ও ভক্তচূডামাণ তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না ; আজ মাতৃ সন্নিধানে তাহাকে এই ভাবে প্রেমে বিভোব হইতে দেখিয়া, শাক্তগণ স্তম্ভিত হৃদয়ে তাহার নিকট করযোড় করিয়া উপবেশন করিলেন।

আজ নিমায়ের সে ভুবনমোহন বেশ দেখিলে বাস্তবিক তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া মনে হয় না, কারণ সামান্য মানবের এরূপ সৌন্দর্য্য হইতেই পারে না। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কৃষ্ণানন্দ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—“আমরা যেমন দ্বিধা বোধ করি, নিমাইয়ের তাহা নাই ! মরি মরি, শচীনন্দন-নিমাই

নদের নিমাই।

যথার্থ ভক্ত।” এইরূপ ভাবে প্রায় দশাধিক কাল অতীত হইলে, নিমাই চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন শাক্ত-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দোষিয়া বসিয়া প্রভু হু স্তুত্যাতি করিলেন এবং তাঁহার ভাবাবেশের বিষয় কিছু গুনিবার জন্য মুঞ্চ নৈত্রে চাহিয়া রহিলেন।

মায়ের পূজাপীঠ হইতে ভক্তগণের আসন কিছু দূরে হইলেও, সেখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি বেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাই অধ্যাপকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“পূজনীয় পণ্ডিত মণ্ডলা! আজ আমি আপনাদের পূজাপীঠে অহত হইয়া, বিশ্বপালিনী মাতৃশক্তির পদতলে বসিয়া ধন্য হইলাম। আপনাদেব মায়ের রূপ কিরূপ একবার ধ্যান করুন:—

শবাকটাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং ববপ্রদাম্,
তাস্ত্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাশ্চত কপাল কভুকাকরাম।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবতীং কধিবং মূত্রং,
চতুর্কোহুযুক্তাং দেবীং বরাভয় করাং স্মরেং॥”

সকলেই নিমাইয়ের ভক্তিভাতি-বিভূষিত বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। সেই বদনে কি এক অমিয় মধুর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল, আর শাক্ত-ভক্তগণ সমস্ত ভুলিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের আর অল্প দিকে নয়ন ফিরাইবার অবসর নাই! এমন সময় নিমাই বলিলেন—“ভক্তবৃন্দ! একবার দেখ দেখি, আমাদের মা আজ কেমন নূতনরূপে আমাদের মনোবাহু পূর্ণ করিতে নয়ন মনোহর ভাবে দণ্ডায়মান!”

নন্দের নিমাই :

তখন এগলে চমকিত হইয়া সেহ দিকে চাহিয়া দেখিলেন ।
বৈষ্ণবগণ এতদেব আবার চিত্তবিমোহন কৃষ্ণরূপ দেখিয়া, গলায় বস্ত্র
দ্বা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—

“ও যস্মৈন্দাবব কান্তিমিন্দুবদনং বহুবিতংসগ্রিযং,
শ্রীনাঙ্কমুদাব কৌস্তভদ্বং পীতাদ্বং স্তন্দবম্ ।
নবীনাবদশ্রামং নালেন্দবর লোচনম্ ॥”

দেখ, দেখ ভক্তগণ । কি মনমোহন, কি বিশ্ববিমোহন অপকণ
।। আজ অগ্নি ববা, দিগম্ববা, নৃমুণ্ডমালা পবা মা—কেমন বাঁশী করে,
পাতাধব প’বে, গল’য় বনফুলেব মালা ধ’বে—মুহুমধ্ব হান্ত ক’রে,
খাজ তে’মাদেব সম্মুখে উপস্থিত । কে বলে পরম বৈষ্ণবী মা আমার
।। গমাংল গোপা—মদিবা পানাসক্তা ? ঐ দেখ, স্থখ প্রসন্নবদনে
।। মা মা আমাব—শ্রামকপে দণ্ডায়মান ।”

তখন শাক্তগণ মুগ্ধ, চকিত এবং ভীত প্রাণে প্রেমবিহ্বল হইয়া
বলিলেন—“নিমাই, ভক্তচূডামণি । আমাদের মোহ ঘুচিয়াছে, তুচ্ছ
দ্রাবনেব অংকব টুটিয়াছে । আমরা এতদিন শ্রামা-শ্রামে ভেদ ভাবে
ভাবিয়া সাধনাব প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়াছিলাম, আজ তোমার রূপায় সে
অজ্ঞতা হইতে মুক্ত হইলাম—তুমি আমাদের দয়া কর ।” এই বলিয়া
সকলে ভক্তিভাবে সমস্তবে অভেদ ভাবে গাহিলেন :—

“শ্রামা হলি মা রাসবিহারী, নটবরবেশে বৃন্দাবনে ।”

তারপর নিমাই বৈষ্ণবগণকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—“বৈষ্ণবগণ !
দেখিলে, মা কি তোমার বাবা নয়—শ্রামা কি তোমার শ্রাম নয় ?”

নদের নিমাই !

বৈষ্ণবগণ আকুলপ্রাণে বরষোড়ে গাহিলেন :—

“গোপনে গোকূলে আসি গ্রাম হ’য়েছ ।

কবে আসি মুক্তকেশী বাঁশী ধ’বেছ ।”

শাক্ত-বৈষ্ণবে এইবাব কোলাকুলি হইল ; নিমাইয়ের রূপায় ভেদভাব
বজ্জিত হইয়া সকলেই ভক্তিশ্রাব্যে বিভোব হইলেন । নিমাই বলিলেন—
“সাধনা সমস্তই এক, বাবা ও মা অভেদ মূর্তি । শক্তি ত্রয় সাধনা হয়
না । শক্তি চারু—তত্ত্ব কতক সাধনা বিবেক বুদ্ধি শূন্য সামান্য
অধিকারী পক্ষে ; কিন্তু যতই উদ্ধে উঠিবে ততই এব । পশ্চাচ্চাব,
বীবাচাব প্রভৃতি হইতে সন্মাদিকাবে গোঁছিলে, তখন আব ভেদ জ্ঞান
থাকে না । তখন সব ব্রহ্মময়—মা, বাবা সব এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।
তখন জীব মাত্রই শিব, শিব বৈষ্ণব ভাবে অনন্ত শক্তিব আধাব ।
এ প্রথমে তাত্ত্বিক সাধনায় আসক্তিব বশে প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করিতে হই
বে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিশালী সাধকের লক্ষ্য থাকা চাই, মাজ্জিত-বুদ্ধি
পশ্চিতগণেব চিত্তে স্থিৰ থাকা চাই, সেই—“দ্যেব সদা সবিতৃমণ্ডল
মধ্যস্থতি নাবায়ণ সবসিদ্ধাসিন সন্নিবিষ্ট কেশুববান, কনক-কুণ্ডল-বান
কিৰিটী-হাবী হিরণ্য-বপু ধৃত শঙ্খচক্রম্ ।”

নিমাইয়ের ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই অবাক হইলেন । তাহাব
সেইদিন হইতে নিমাইয়েব উপদেশানুসারে জুড়ে কালী, বহি শিব,
বদনে কেবল হরিশ্বনি করিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে
লাগিলেন । শাক্ত-বৈষ্ণবেব মিলনে দেশ ধন্য হইল । নিমাইয়ের মন্ত্ৰে
সকলে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মান্য করিতে
লাগিল ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যবনে হিন্দুভাব ।

“মা সোহাগে বাপের আদব” বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—মাকে সন্তুষ্ট না ।
কবিলে, বাপেব আদব পাওয়া যায় না । মাই বাবাকে চিনাইয়া দেন
তবে সন্তানেব পিতৃভক্তি প্রকাশ পায় ; অতএব মাকে অবহেলা করা,
অমান্য করা—অধঃপতনেব মূল । শাক্তগণও বুঝিলেন—পিতৃভক্তি না
কবিলে, মায়েব বিষনয়নে পড়িতে হয় ; কাবণ পিতা যে মাতার গুরু ।
অতএব গুরু-গুরুব অমান্য কবিলে—ইহকাল পরকাল, একুল-ওকুল
দুঃস্থ কুলই নষ্ট হইবে । মাতৃভক্তি-শূন্য বৈষ্ণব যেমন—অবৈষ্ণব, তেমনি
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য শাক্তও পতিত—অধমাদম ।

অতঃপর শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে এইরূপ অভেদ ভাবের প্রভাব
জাগাইয়া দিলে, তাঁহারা স্বহস্তে ছাগপশু দুইটীর বন্ধন মোচন করিয়া
দিলেন । পণ্ডিত শাক্তগণ বিবেক-বুদ্ধি বলে প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি
লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নিমাই পণ্ডিত
তাঁহাদের গুরুস্থানীয় হইয়া, হরিনামের বলে মনের মলা-মাটা ধুইয়া
পরীক্ষা করিয়া দিতে লাগিলেন । নিত্যানন্দ তাহাতে সহায়তা করিতে
রূপণতা করিলেন না ।

ইহার পর হইতে বৈষ্ণবের দল ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ
করিল । চারিদিকেই সংকীর্ণনের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল ; ঘরে ঘরে

নদের নিমাই ।

খোল-কবতালেব শব্দ, অঙ্গনে-পাঙ্গনে তুলসী মঞ্চ, ভক্তগণ তাহাব চাবিধাব বেষ্টন কবিয়া পরমানন্দে নৃত্য বিবর্তেছেন। তখনকাব দৃশ্য যে কি নান মনোহর, তাহা ভাবাব দ্বায়া ব্যক্ত করা যায় না। জী পুরুষ সকলেই হবিনামে উন্নত। যাহাবা বিদেষী ছিল- তাহাবা কার্দ্দব নিকট নাগিণ করিল, রাজী হকুম দেন- “হবিনামেব দল বান্ধব হইলেই আদিক বব।”

সেই সময় শান্তিপুত্রব নিকট বুড়ন গ্রামে, হবিদাস নামব একজন ভক্ত, অদৈন্য-যোগেব নিষ্ঠা ওঁস্ত বিষয়ক উপদেশ পাঠিয়া, অবিবাহ হবিনাম কার্দ্দব আবস্ত করেন। হবিদাস হবিনামে গুরুব বিশ্বাস স্থাপন কবিয়াছিলেন যে, তাহাব মতে হবিনামই সকল সাধনাব সাব— হবিনাম দাতা। নাব কোন সাধনাব আবশ্যক হব না। ইনি এনগ্রাম নিবাসী জটনক ব্রাহ্মণেব পুত্র, অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, যবন বড়ক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে সকলে যবন-হবিদাস বলিত। তাঁহাকে হবিনাম হইতে বিমুখ ববিবাব জন্য গ্রামেব জমিদাব একটা পরমাসুন্দরী বেষ্ঠাকে পাঠাইয়া মুগ্ধ করিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বেষ্ঠাটী নিজেই হবিনামে মুগ্ধ হইবা, তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। হবিদাস তাহাকে ভেকধাবণ করিয়া হরিণাম জপেব অনুমতি দিয়া, অন্যত্র গমন করিলেন।

কাজী বব-হবিদাসকে কাফেবেব ধর্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া লইয়া হবিনাম ছাড়িতে বলিলেন এবং কল্যাণ পড়িয়া পুনরায় সংশোধিত হইয়া মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ কবিত্তে আদেশ দিলেন। হবিদাস কাজীব কথা শুনিলেন না দেখিয়া,

নদের নিমাই :

শান্তিপুত্রের কাজী মুলকচাদ খাঁ তাঁহাকে দণ্ডিত ববিবাব জন্য, নবাব হোসেন সাহেব অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। দণ্ডাজ্ঞা হইল—
প্রাণ বধ ; ২২ বার জোবে বেত্রাঘাত করিয়া মাঝিয়া ফেলবার হুকুম হইল। হবিদাস তাহাতে ভীত না হইয়া, অকাতবে সেই ভীষণ শাস্তি গাথা পাতিয়া লইলেন, তিনি সমাবীস্থ হইয়া সেই বেত্রাঘাত সহ্য কবিতে লাগিলেন। এক্ষেপ বেত্রাঘাতে মাঝিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, সকলে তাঁহাব শবদেহ মুক্তিকায় প্রোথিত না কবিয়া গঙ্গাব জলে ভাসাইয়া দিল।

অতঃপব ইনি গঙ্গাব জলে ভাসিতে ভাসিতে কিছুদূর গমন করিয়া, নবজীবন লাভ কবতঃ তীবে উঠিলেন। নবাব সংবাদ পাওয়া তাঁহাকে পাম সার্ব সাব্যস্ত কবিয়া, তাঁহাব উপব আপ কোন হুকুম জারী কবিলেন না। হবিদাস নিঃসঙ্কচিত্তে কুলিন গ্রামে গিয়া বাসস্থান নির্দিষ্ট কবিলেন এবং প্রাণের সহিত হবিনাম সাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

যখন পবম ভক্ত বলিয়া নিমাই পণ্ডিতের নাম চাৰিদিগে খ্যাত হইল, তখন এবদিন অষ্টৈত্যাচার্য্যেব সহিত তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হবিদাসকে পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিত, ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়েব নিকট লইয়া গেল। নিমাই এই পরম ভক্তের মঙ্গলাভ কবিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং নানা প্রকার স্বখাচ্ছাদনে আতিথ্য সংকাষ কবতঃ তাঁহাকে পুষ্প-চন্দনে স্তম্ভোভিত করিলেন। বতনে রতন চিনে—হবিদাস নিমাইকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন।

নদের নিমাই ।

এই সময় নিমাই পণ্ডিতের কখন ভক্তভাব, কখন ভগবানভাব হইত। যখন তিনি ভক্তভাবে অবস্থিতি কবিতেন, তখন তৃণাদপী স্ত-নীচ হইয়া সকলের পদধূলি লইতেন—তুলসী তলায় প্রণাম কবিতেন আর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইতেন। আবার যখন ভগবান-ভাব হইত, তখন তাঁহার সেই শ্রীঅঙ্গে বাস্তবিকই দেবশ্রীব বিকাশ হইত; তিনি দেবমূর্তি নামাইয়া ফেলিয়া—বিষ্ণু খট্টায় বিষ্ণু হইয়া বসিতেন, আর ভক্তগণ আবেগ ভবা প্রাণে, সেই শ্রীমূর্তির পদে তুলসী-চন্দন লেপন করিত—নানাবিধ পুষ্প মাতে শ্রীঅঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিয়া ধ্যান কবিত :—

“শ্রীগোবাক্ষমহং বন্দে বাধাক্ষয়করকম্,
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গোরং দ্বিভূজং করুণাময়ম্।
তপ্তকাঞ্চনপুষ্পাভং বক্তবজ্রং স্নানাসিকম্,
নমঃ ক্রীং চৈতন্য মহাপ্রভবে নমঃ নমঃ ॥”

এইরূপে বিবিধ উপচার উৎসর্গ করিয়া সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করিত। সে রূপ দেখিলে বাস্তবিকই চিত্ত হরণ হইয়া যায়; সকলেই সেই অপরূপ রূপে মুগ্ধ, আত্মহারা হইয়া—প্রভুকে বেষ্টন কবতঃ সংকীর্ণন করিতে থাকেন। আজ অদ্বৈত্য ও হরিদাস আসিষা নিমাইয়ের দেবভাবে বিভোব হইলেন। প্রকাশে না হউক, ভিতরে ভিতরে নিমাইয়ের অবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের একটু অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার কাবণ রহিল না। সামান্য জীবে বখন এতাবণ সন্তব হইতে পারে না। মানব শক্তিতে এরূপ পূজা গ্রহণ কবিবার

ননের নিমাই :

শক্তিলাভ অসম্ভব ! কপট মানব হইলে সে টিকিবে কত দিন ? ভরা ।
চবণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন—তাঁহাব সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল । ১২

অবিশ্বাস মানবের শত্রু নহে—মিত্র । অবিশ্বাসের পর একবার হৃদয়
বিশ্বাসবদ্ধ হইলে, তাহা চিবদিন অচল অটল ভাবে থাকে । যাহার সহজে
বিশ্বাস হয়, তাহাব সে বিশ্বাস আবার সহজে যাওয়াই সম্ভব ; কিন্তু
অবিশ্বাসের মাটিতে একবার বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইলে আর তাহাব
বিনাশ নাই । নরম মাটিতে কোন কিছু প্রোথিত হইলে, তাহা সহজেই
উৎপাটন করা যায়, কিন্তু কঠিন মাটিতে একবার তাহা প্রতিষ্ট হইলে
উৎপাটন করা সহজসাধ্য নহে । অদ্বৈতের অবিশ্বাসভরা হৃদয়ে এই
বিশ্বাসভাবের উৎপত্তি প্রগাঢ় শিকড় বদ্ধ হইয়াছিল ।

আজ শচীদেবীর অঙ্গনে যাবতীষ ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে ।
নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, ভক্তগণ প্রেম-পুলকিত হৃদয়ে ভজনানন্দ
উপভোগ করিতেছেন । সে ভাব দেখিয়া শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ
ফাটিয়া যাইতেছে । শচীদেবী মনে করিতেছেন—নিমাই পাগল হইয়াছে,
আব পতির এই দশা দেখিয়া, পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ দুঃখ তরঙ্গে
ভাসিতেছে । শচীদেবী একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া
শ্রীবাসকে বলিতেছেন—“হে বৈষ্ণব ! আমার মত জন্ম-দুঃখিনী আর কেহ
নাই, কাঁদিতে কাঁদিতেই আমার জন্ম গেল । পতিশোক, কল্যাণশোক এবং
পুত্রশোকে আমি জর জর মর মর হইয়া, কেবল নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া
বাঁচিয়া ছিলাম ; কিন্তু শেষ দশায় সে এ কি করিল ? আমার অদৃষ্ট
যেমনই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু অল্পবয়সে বধুমাতার
ভাগ্য চিন্তা করিয়া, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে । নিমাইয়ের

নদের নিমাই ।

এইরূপ শ্বাশুগ্রন্থ ভাব দেওয়া সে অহবৎ কাদিয়া আকুল হয় । তবে কি বাহ্যকে আমার কোন অপ দেবতায় ধাবিয়াছে ? কেমন কবিবা ইহাব প্রতিকাব হইবে ? আপান বয়োবৃদ্ধ—দয়া করিয়া তাহাব পবাশর্শ দান ককন ।

শ্রীবাস শচীদেবীকে বুঝাইয়া বলিলেন—“দেবি । আপনি পুত্রের জন্ম কেন বুখা চিন্তা ববিতেন । আপনাব পুত্র যে বিকাবগন্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, শিবও সেই বিবাবভাব সদা প্রার্থনা করেন । ঠাকুরালী, আপনাব পুত্রের কোন বোগ নাই, তাহাব কোন বোগ হইতে পাবে না, বুখা অমঙ্গল আশঙ্কা ববিতেন কেন ? আপনাব পুত্রের নাগ স্মরণ ববিতেন স্বপ্নে জীবের সবল অমঙ্গল নাশ হয়, তখন তাহাব আবাব অমঙ্গল চিন্তা । এ ধে বাতুলের কথা মা ।

শচীদেবী বলিলেন—“মহাত্মন । যে দিন হইতে বিবাব পেড়ে গেছে সেই দিন হইতে আমার প্রাণ আব কোনবপে প্রাবোধ গান না নিমাইয়ের ঐ ভাব দেখে হয় হয়, পাছে সেও ফাঁকা দিয়ে পালায় গয়া থেকে এসে অবধি বাচাব যে কি হ’ল, কিছুই বুঝতে গাছি না ।” এই বলিয়া শচীদেবী অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাদিতে লাগিলেন ।

শ্রীবাস বলিলেন—“মা । তোমাব নিমাই পুত্রটা সবাণ নয় । পৃথিবীতে হবিনাম প্রচার ববিতে, ধর্ম্মহীন জীবকে ধর্ম্মে মর্শমান করিতে তাহাব জন্ম । মা । পুণ্যবতী তুমি—তাই অর্মান পুত্র জঠবে ধবিয়াছ, নিজে সাধুন, লাভ বন এবং সৌভাগ্যবতী বধূমাতাকে সাধুনা দান বন ইহাতে ভয় পাইবাব কোন বাবণ নাই ।”

হুইজনের কথা ফুবায় নাই—এমন সময় নিমাই নিজ স্বভাব প্রাপ্ত

নদের নিমাই !

হইয়া, গৃহে আগমন করিলেন। তখনও আঁখি প্রেমনীরে ভরা। ভক্তভাবে পব তৈত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিমাই জননী সন্ন্যাসে আসিতেছেন দেখিয়া, শচীদেবী বলিলেন—“দেখুন, দেখুন, নিমাই পাগলের মত এদিকেই আসিতেছে, ভাব দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়।”

নিমাই ভক্তিভবা প্রাণে আসিয়া জননী পদে প্রণাম করতঃ বলিলেন—“মা ! আজ আমাদের সৌভাগ্যেব সীমা নাই, আজ ভগবানের মহাভক্তসকল আমাদের কুটির পবিত্র করিয়াছেন ; পদধূলি দানে আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন।”

সন্তান-বৎসলা জননী সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না ; ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ নিমাইকে বাহ বেষ্টন করিলেন, অঞ্চল দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ধূলা বাড়িয়া দিয়া বলিলেন—“নিমাই ! পূজা-পাঠ হইয়াছে কি, আহ্বায় করিবি কখন ? হাঁবে, না খেয়ে খেয়ে যে শরীর কালী করুলি, সোনার অঙ্গ শ্রীহীন হ'য়ে গেল। খাওয়া-পরায় একটু মন দে, সমস্ত দিন :কবল হরি হরি ক'রলে কি হবে বাবা ?”

নিমাই বলিলেন—“মা ! হবি ভজিলেই দেহের জ্যোতিঃ বাড়ে। দেখ দেখি, এই সব ভক্তবৃন্দকে ; মরি মরি ! কি সুন্দর কুসুম-ললাম দেহেব জ্যোতিঃ ! তুমি জাননা মা, তাই হরিনাম কর্তে বারণ করছে।”

“আচ্ছা, তা করিস্ ; এগন বেলা অনেক হ'য়েছে, খাওয়া-দাওয়া করবি চল্।”

“মা ! আজ আমি একা খাব না, এই ভক্তগণের সঙ্গে আজ প্রাণের ভাজন করবো।”

নদের নিমাই :

“তা জানি, বধুমাতা জানিয়া গুনিয়াই সকলের আয়োজন ক’রে রেখেছেন—এখন চল।”

নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে আহায়ে বসিলেন। আজ আহাবে কোন জাতিভেদ নাই ; সকলেই সকলের মুখে খাচ্ছ তুলিয়া দিয়া, তাহাই আবার নিজে ভোজন করিতেছেন। শচীদেবী পবিবেশন কবিতেছেন, ভক্তগণ দেখিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবন ধামে আজ রাখালগণ পরিবৃত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রস-ভোজনে প্রমত্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণী বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সে মধুব লীলারস পান করিতেছেন আর বলিতেছেন—
“অন্যকার রন্ধন-কার্য্য আমার সার্থক হইল।”

আহাৰাদির পর, সকলে আচমন করতঃ আসনে আবেশ-আনন্দ উপভোগ করিয়া, দিবাবসানে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৰ্ত্তনেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিমাই সকলকে আগামী কল্য নগর-কীৰ্ত্তনে যোগদানের আদেশ করিয়া, বিদায় দান করিলেন। শচীদেবী বধুমাতার সহিত দিবসের গৃহকার্য্য শেষ করিলেন।

— . —

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

পাষাণ দলন ।

গৌড়ের সিংহাসনে হোসেন সাব প্রতাপ অক্ষুন্ন । তিনি তদানিন্তন গৌড়ের প্রসিদ্ধ নগর বিভাগীঠ নবদ্বীপে, চাঁদ খাঁকে এবং শাস্তিপুত্র মুলুক চাঁদকে কাজী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হস্তে ইহার শাসন ভার প্রদান করিয়াছেন । নবদ্বীপ তখন বাঙ্গালার প্রধান নগর, বহু লোকের বাস, দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ইচ্ছা আবাসস্থল । তখন শাক্ত-বৈষ্ণবে প্রায়ই বিবাদ হইত, এইজন্য প্রভূত-জনসঙ্কুল এই জেলার শাসনভার উক্ত দুইজন প্রসিদ্ধ কাজীর উপর হস্ত ছিল ।

কাজীর অধীনে দুইজন সহর কোতওয়াল নিযুক্ত ছিল ; ইহারা জাতিতে প্রোতীয় ব্রাহ্মণ, নাম—মাধব রায় ও জগন্নাথ রায় । ইহাদের দুই ভাইকে লোকে ‘জগাই-মাধাই’ বলিয়া ডাকিত । ইহারা ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিল ; এমন কু-কর্ম কিছু ছিল না—যাহা জগাই মাধাইয়ের দ্বারা অচুষ্টিত হয় নাই । ইহারা অহোরাত্র মুসলমানের সহবাসে বাস করিত এবং অবিরত মত্তপান করিত ; আত্মার কোণ আচার-বিচার ছিল না । কাজী তাহাদের কার্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিত, কারণ এক জনকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা তাহাকে বাধিয়া মারিতে মারিতে কাজীর নিকট হাজির করিত । কোন প্রকার কু-ক্রিয়ায় তাহারা অপারক ছিল না ; চৌধুর্য্য, নরহত্যা, সতীর সতীত্ব

নদের নিমাই ।

নাশ, লোকের ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্যে তাহাব সিদ্ধহস্ত ছিল। লোকে পুড়িয়া মরিতেছে, চুরী হইয়া দারুণ অভাবে কষ্ট পাউতেছে ইত্যাদি দেখিলে, তাহাদের প্রাণে বড় আনন্দ হইত। কাজির আদবের পাত্র বলিয়া তাহারা সদাসর্বদা নানা প্রকার আশ্চর্যান করিয়া বেড়াইত। ভক্ত সমাজ বিপ্রকুন-কলঙ্ক এই পাষণ্ডদ্বয়কে দেখিলে, ভয়ে জড় সড় হইত; ‘দুর্জনে দূরে পরিহর’ বলিয়া লোকে তাহাদের সঙ্গ করিত না।

ইহারা অর্থ দ্বারা কাজীকে বশ করিয়াছিল এবং কাজীব সহিত একত্র ভোজনে তাহারা দ্বিবা বোধ কবিত না; যথেষ্টাচার করা এই ভাড়াবয়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। মত্তমাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে দল পুষ্ট করিবার ভাবনা থাকে না; এইজন্য বহু অশিক্ষিত ইতর-ভদ্র লোভের বশবর্তী হইয়া ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন কবিত। কাজী নাম মাত্র, ইহারাই নগরের কর্ত্তা; এ হেন পাষণ্ডদ্বয়েব হস্তে পড়িয়া নগরবাসী কিরূপ স্তূথশাস্তি ভোগ করিত—তাহা সহজেই বিবেচ্য।

নিমাই-নিতাই যেদিন হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া সংকীৰ্ত্তনের দল বাধিলেন, যেদিন বড় বড় পণ্ডিত, বিশিষ্ট শাক্ত-ভক্ত ঐ দলে যোগদান করিলেন এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যখন বৈষ্ণবগণের সহিত সংকীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, অথবা মত্তমাংস ভোজন করিয়া বেড়ান দোষ এবং যাহারা এইরূপ করিবে, নিমাইয়ের সম্প্রদায় তাহাদের সমাজে রহিত করিবেন ইত্যাদি প্রচার করিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে জগাট-মাধাইয়ের প্রাণে দারুণ বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া উঠিল।

শাক্ত-বৈষ্ণবে সম্মিলিত হইয়া, নিমাইয়ের দল তখন খুব বড়

নদের নিমাই !

হইয়াছে ; সকলেই প্রায় নিমাইয়ের ভক্ত । দুই একজন যাহারা ব্যভিচার ছাড়িল না, তাহারা নিমাইয়ের দল হইতে বাদ পড়িল । তাহারা বিষম কোপাবিষ্ট হইয়া, দুর্বৃত্তদের দমন করিবার জন্ত কাজীর সহিত যড়যন্ত্র করিতে লাগিল । ইহাদের অগ্রণী হইল—জগাই-মাধাই ।

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রতি পাষণ্ডম্বয়ের ঘোরতর আক্রোশ জন্মিল ; কিন্তু শুধু আশ্ফালনে কি ফল হইবে ? নিমাইয়ের দলের গগনভেদী হরিনাম ধ্বনিতে দিম্বাগুল প্রকম্পিত হইতে লাগিল ; তাহাদের প্রেমময় তাণ্ডব-নৃত্যে নবদ্বীপ টলটলায়মান হইয়া উঠিল । একজন একবার হরিশ্রবণ করিলে, শত শত নরনারী বাহির হইয়া তাহাতে যোগদান করে । কাজী নিজেই যখন ইহাদের সম্মিলন-শক্তি দেখিয়া ভীত, তখন অপর কাহার সাধ্য যে তাঁহাদের সম্মুখীন হয়—তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে বাধা দেয় !

তখন হিন্দু-সমাজে ধর্মপ্রচার বিধির প্রচলন ছিল না ; শিশু নিমাই প্রথমে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত করেন । নিতাই হরিদাসকে লইয়া প্রত্যহ হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইতেন ; জীবের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইত । যেখানে পতিত বা অধম কাহাকেও দেখিতে পাইতেন—সেইখানেই তাঁহারা যাইয়া অযাচিত ভাবে নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, পদে ধরিয়া সকলকে বলিতেন—“ভাই ! পাপ করিয়াছ বলিয়াই এই দুর্দশা ; একবার বদনভরে হরিনাম কর, সকল পাপ-তাপ নষ্ট হইবে—জীবনে বিপুল শান্তি পাইবে।” তাঁহাদের সেই দেবপ্রতিম নম্র শরীর-কান্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িত এবং তাঁহাদের সেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নম্র স্বভাবে সকলেই বশীভূত

নদের নিমাই ।

হইয়া হরিনামি কবিতা উঠিত । নামের ঐশীশক্তি বলে তাহাদেব প্রাণে এমন প্রেমের বস্ত্র প্রবাহিত হইয়া যাইত যে, তাহাবা আব সে নাম ছাড়িতে পারিত না । এইরূপে নিতাই, হরিনাম প্রভৃতি সকলে প্রভু নিমাইয়ের আজ্ঞা লইয়া, শত শত নব-নারীব উদ্ধাব সাধন করিতে লাগিলেন ।

একদিন জগাই-মাধাইয়ের প্রতি তাঁহাদেব নজব পড়িল । তাঁহাবা মনে কবিলেন—ভক্তকে ভক্তিভাবে বিভোর করা অতি সহজ, কিন্তু এই দুইজন পাষণ্ডকে হবিনামে মজাইতে পারিলেই আমাদের প্রচাব কায্য সার্থক হয় । এইরূপ মনস্থ করিয়া নিত্যানন্দ সদলবলে একদিন তাহাদেব সম্মুখীন হইয়া, উচ্চৈঃস্ববে হরিনামি করিলেন । মছপানে বিভোর বস্ত্রাক্তলোচন পাষণ্ডদ্বয়, তখন ভাণ্ড ভরিয়া সুখা লইয়া পান করিতেছিল ; একবার ঘুণার চক্ষে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিল । নিতাই অগ্রসব হইয়া বলিলেন—“ভাই । চিরাদিনই কি পাপে মত্ত থাকিবে ? একবার যদি তোমরা দুই ভায়ে কৃষ্ণনাম কব, তাহা হইলে দেখিবে, যে সুখা থাইতেছ তাহা অপেক্ষা এ সুখা কত মধুর এবং কত শীঘ্র ইহাতে মত্ততা আসে ।”

পূর্বেই বলিয়াছি, হরিনামের প্রতি—নিমাইয়ের দলের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ভাব বহুদিন ইহাতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ঐক্ৰম্যে সময় পায় নাই বলিয়াই তাহারা এতদিন কিছু করিতে পাবে নাই । আজ তাঁহাদিগকে নিজেদের ক্ষমতাবীনে আসিতে দেখিয়া, হৃদয় ছাড়িয়া উঠিল এবং একটা কলসী ছুড়িয়া নিত্যানন্দকে এমন প্রহাব করিল যে, তাঁহার ললাটদেশ কাটিয়া অজস্র শোণিত ধারা

নদের নিমাই ।

নির্গত হইতে লাগিল। হবি নাম শুনিলে জগাই-মাধাইয়ের ক্রোধ শতগুণ বদ্ধিত হয় ; ঐ নিরামিষাসী গয়লা বেটার নাম তাহাদের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করে। কাজেই হরিবোল বলিতে বলিতেছে শুনিয়া, তাহা বা একবার নয়—দুই তিন বার নিত্যানন্দকে ঘোরতর ভাবে নির্ঘাতন করিল। নিতাই প্রহার খাইয়াও আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিলেন :—

“মেবেছিঁস্ কলসীব কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না।”

নিতাই পুনরায় বলিলেন—“ভাই ! মারিয়াছ বেশ করিয়াছ ; এইবার এস, গলা ধবধরি কবিয়া হরিনাম করি !”

নিতাইয়েব উদারতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিরহঙ্কারীতা এবং জীবের দুর্গতি নাশের জ্ঞান প্রাণের গভীরতা দেখিয়া, জগাই একটু নম্রতা স্বীকার করিল। কিন্তু মাধাইয়ের প্রাণ পাষণ হইতেও কঠিন ; এই সোণার অঙ্গে রক্তধারা দেখিয়াও তাহার প্রাণে তিলমাত্র মায়ামমতার উদ্বেক হইল না। সে পুনরায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইল দেখিয়া, সকলে নিমাইকে গিয়া সংবাদ দিল।

নিমাই ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্রুতগতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রোধাক্ত হইয়া বলিলেন—“হ্যারে হতভাগ্য বিপ্রাধম ! এত পাপ করিয়াও পাপের আশা মিটে নাই ? আজ আমার এই মহাপুরুষের অঙ্গে প্রহার করিয়া পাপের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিলি। তোদের এত অহঙ্কার কিসের ?” এই বলিয়া রাগে গর্জন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর ভাব দেখিয়া পাছে হিতে বীপরীত হয় ভাবিয়া,

নদের নিমাই ।

নিজেই ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—“প্রভো । এ অবোধ ভ্রাতৃদ্বয়কে বক্ষা কবিতে হইবে । আমাব কপালে সানাত্ত আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে আপনি কিছু মনে কবিবেন না ।’

পাষণ্ড উদ্ধাবে নিত্যানন্দেব অসীম ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া, প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন । এত নির্যাতন, এত প্রহাবেণ্ড তাঁহাব হৃদয়ে কিছুমাত্র বাগেব উদয় হয় নাই । মরি মরি, পবোপকারে—পাপীর উদ্ধাব সাধনে কি একনিষ্ট অন্তবাগ । নিমাই নিতাইয়েব ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ কবিয়া, ভাব-বিস্মল হৃদয়ে বলিলেন—“প্রভুপাদ । জীবের দুন্দশা দেখিয়া তোমাবই প্রাণ যথার্থ কাঁদিয়াছে ।”

জগাই-মাধাইয়েব উদ্ধাবেব জন্ত নিত্যানন্দেব কাতব প্রার্থনা দেখিয়া, নিমাই উগ্র স্বভাব পবিবর্তন কবিয়া কোমল হইয়া বলিলেন—“ভাই ! পাপীকে কেমন কবিয়া উদ্ধার কবিতে হয়, তাহা কেবল তুমিই শাখিয়াছ । তোমাব এই উতপ্ত বক্তৃপাতে পাষণ্ডদ্বয়েব আজন্ম সঞ্চিত মহাপাপ ধ্বংস হইল—আজ তাহাবা নিম্পাপ হইল । তোমাব এই কীর্ত্তি চিবদিন জগতে অতুলনীয় হইয়া বহিবে ।”

ধর্মের নিকট পাপেব প্রবোপ বেশীক্ষণ থাকে না । নিত্যানন্দকে প্রহার কবিয়া জগাই ইতিপূর্বেই একটু নম্রতা স্বীকার করিয়াছিল, তারপর যখন নিমাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাব সেই ভুবনমোহন দিব্যকান্তি দেখিয়া, উভয় ভ্রাতাই চবণে গডাগডি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষেব জলে বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিল ; অল্পতাপের অশ্রুজলে হৃদয়-মল প্রক্ষালিত কবিল । প্রভু বলিলেন :—

“আয়রে মাধাই । কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায় ।”

নদের নিমাই :

তখন গোবান্ধ মহাপ্রভু নিজ হৃদয় ভাঙস্থিত মহাবীজ হবিনাম
নইয়া, জ্ঞান-পাবকের প্রবাণ্ড বুঝে প্রেমভক্তির স্বীকৃতি-নীরে পাক করিয়া,
বমান্ন প্রস্তুত কবতঃ জগজ্জননী অন্নপূর্ণার মত অকাতবে বিতরণ
করিতে কবিত্তে গাহিলেন —

নাম সুধাবস কে নিবি বে আয় ।

এ যে দেবের দুর্লভ হবিনাম, নামে ক্ষুধা-ভৃগু দূরে যায়,
নামের গুণে বোবায় বলে, পদু চলে, অন্ধ চক্ষে দেখতে পায় ॥

পাপীষ প্রাণের ক্ষুধা বেশী, পিপাসা অত্যধিক, তাই পাপী
জগাই-মাধাই আকর্ষণ ভরিয়া এই নাম-সুধা-বস পান করিয়া, এই নামের
মহা মাধুরীধাবায় অবগাহন করিয়া একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল ।
হৃৎক্লিষ্ট অনমন-উপবাসী জীব, এ অমৃত পানের লোভ ছাড়িতে
না পারিয়া, আকর্ষণ ভোজন কবতঃ একেবারে চৈতন্যহীন হইল ।
তাহাদের চিব-কঠিন হৃদয়—কমনীয় হবিনামের বিশ্বব্যাপী তরঙ্গে
একেবাবে তলাইয়া আত্মহারা হইয়া গেল । নিমাই দুই ভাইকে
প্রমত্তে আলিঙ্গন দানে চবিতার্থ করিলেন ।

নিত্যানন্দ দুই ভাইকে দীক্ষিত করিলেন, গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া
তাহাদের বর্ণে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করিলেন । জগাই-মাধাই
একেবাবে নূতন মানুষ হইল, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইল ।
প্রত্যহ দুই লক্ষ জপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গঙ্গাতীরে জপ
করিবার জন্ত একটা ঘাট প্রস্তুত করিল । নবদ্বীপে এখনও সে ঘাটের
অস্তিত্ব বর্তমান ।

নদের নিমাই ।

মহাপাপী জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার হইল দেখিয়া, ভক্তগণ গগন
বিদীর্ণ কবিতা সংকীৰ্ত্তন আবৃত্তি করিলেন । সকলে প্রাণ ভরিয়া
গাহিলেন :—

‘ নিতাই এনেছে নাম নিতে হ’লো ।

প্রাণ ভবে সবাই মিলে হবি বলো ॥

নবানুবাগেব স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন কবিতা জগাই-মাধাই হবিধ্বনি
করিতে লাগিল । পাষণ গলিয়া গিয়াছে, তাহাদেব সেই ঢল ঢল
প্রেম তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্যে মোহিত হইয়া, সকলে বিষয়গুলকে জয়ধ্বনি
করিয়া উঠিল । জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ড্যের এই অদ্ভুত পরিবর্তন
দর্শনে সকলেব চক্ষু ফুটিল—মন গলিল । আজ অনেক পাষণ্ডই নিমাই
পণ্ডিতের অসীম দৈবশক্তিৰ মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাব চরণে প্রণত
হইল ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

গর্ব খর্ব ।

নিমাইয়েব রূপায় এখন নবদ্বীপে সকল সম্প্রদায় এক হইয়াছে । এখন আব শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌব, শৈব, গানপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ে অমিল নাই । সকলেই বুঝিয়াছে—মা না হইলে বাবাকে পাওয়া যায় না এবং বাবাকে না পাইলেও মায়ের অস্তিত্ব লোপ পায়, অতএব এখন সকলেই অভেদভাবে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিতের সংকীৰ্ত্তন সম্প্রদায়ে যোগদান কবিয়াছে ।

দৈবশক্তিব বলে বলীয়ান না হইলে, শুধু কথায় বা বহুতায় সকলকে একত্র কবা যায় না । অবতাব বল্ল মহাপুরুষ না হইলে এরূপ আকর্ষণী শক্তিতাণ্ড মাতুষের পক্ষে অসম্ভব । এই নিমাই মানুষ নহেন—স্বয়ং ঈশ্বর ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবোদ্ধারের জন্ত নিমাইরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল । যখন নিমাইয়ের জুবন-মোহন মূর্তি দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ণ আনন্দ-রসের সঞ্চাব হয় এবং তাঁহার অমিয়-মধুর কথা শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, সকল ভয়-ভীতি দূরে পলায়, তখন নিমাই যে স্বয়ং ভগবান—সে বিষয় আর সন্দেহ কি ?

যখন নিমাই অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তখনই নগ্ন-কীৰ্ত্তনের উচ্চরোলে দেশ উন্নত হইল । চারিদিকেই খোল, করতাল এবং হরিক্ষনি । বিপক্ষ হিন্দু ও মুসলমান দিবারাত্র এই উৎপাতে

নদের নিমাই ।

বালাফালা হইয়া কাজীৰ নিবট নালিগ কবিগ । কাজী সাহেব
প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কাবণ একেত নালিগেৰ বিষয়
অতি তুচ্ছ, তাহাব উপব যাহাব নামে নালিগ—সেই নিমাই পণ্ডিত
কাজী সাহেবেব প্রাণেব চাচ। নীলাসব চক্রবর্তীব দৌহিত্র । সামান্ত
একটা বালকেব সতিত বিবোধ কবিতে যাওয়া, কাজীৰ হায় উচ্চপদস্থ
বাজকৰ্মচাবীৰ উচিত নয় । নিমাই পণ্ডিত ছেলেমানুষ, নাচ-গান
কবিয়া বেড়ায়—ইহাতে আব ক্ষতি কি ? কিন্তু তিনি দেশের শাসন-
কর্তা, কাজেই অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহাব মিমাসা করা উচিত
বিবেচনা কবিয়া, সকলের অন্তরোধে একদিন নগব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া
দেখিলেন—বাস্তবিকই চাবিদিকে বিষয় কলরব, কাণ পাতা দায় ।
তখন তিনি হুকুম দিলেন যে—“যাহাবা পুনবায় নগবে এইকপ অশান্তি
উৎপাদন কবিবে, তাহাদিগকে বিশেষকপে শাস্তি দেওয়া ত হইবেই—
অধিকন্তু বলপূর্বক জাতি নষ্ট কবা হইবে ।”

কাজী সাহেবেব এই কঠিন ঘোষণাবাণী শুনিয়া, ভক্তবৃন্দ ত্রিযমান
হইল, সকলে তাহাদেব রাজাধিরাজ নিমাইচাদেব নিকট কাজীৰ কড়া
হুকুমের কথা জ্ঞাপন কবিয়া কাঁদিতে লাগিল । নিমাই পণ্ডিত কাজীৰ
দ্রুষ্টিৰ কথা শুনিয়া ভয়ানক বাগাধিত হইলেন এবং ক্রদ্ধমূর্ত্তি ধারণ
করিয়া রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন—“এত বড় আপদ ! কাজী
প্রভুব নাম-কীর্ত্তন বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছে ? আচ্ছা, অতুই আমি
কাজীৰ গৰ্ব্ব থৰ্ব্ব করিব ।”

অতঃপর তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—“প্রভূপাদ ! তুমি
নগরে নগরে ঘোষণা কবিয়া দাও যে, অতু সন্ধ্যার সময় আমরা

নদের নিমাই।

নগব কীর্তন কবিত্তে বাহিব হইব। সকলে যেন সন্ধ্যাব সময় আমাদেব বাড়ীতে সমবেত হয়।”

নিত্যানন্দ তাহাই কবিলেন। প্রভুব আদেশ শিবোধার্য্য কবিয়া, সকলেই সন্ধ্যাব প্রাক্কালে প্রভুব আঙ্গিনায় দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসী উন্মত্ত, তাহাদেব পদতবে গ্রাম টলমল। শত্রু-মিত্র সকলেই উপস্থিত। কেহ কাজীর সহিত সংগ্রাম দেখিতে আসিয়াছে, কোন্ পক্ষ হাবিয়া যায় এবং কোন্ পক্ষ জয়লাভ কবে—আজ তাহা প্রত্যক্ষ কবিবে। কেহ বা প্রাণেব উত্তেজনায় প্রভুব সহিত কীন্তন-বসে বসিত হইয়া জীবন সাথক কবিত্তে আসিয়াছে—প্রাণেব ভয় ইহাদেব একেবাবে নাই।

একে নিমাই পণ্ডিতেব দেবদুর্লভ কান্তি, তাহাব উপব আজ আবাব ভক্তগণ তাঁহাকে মনেব সাধে অলকা-তিলকা দিয়া মাজাইয়াছেন। গোবান্দসুন্দবেব সে প্রাণ-মন-বিমোহন বেশ দেখিলে, বনেব পশুপক্ষীও চাহিয়া থাকে—মানুষ ত’ কোন্ ছাব।

তাবপব তিনি যখন বাহিরে আসিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইলেন এবং বিপুল জনসম্মুখ যখন প্রাণভবা উৎসাহে গগনভেদী হবিধ্বনি করিয়া উঠিল, প্রভু যখন নিত্যানন্দকে পার্শ্বে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিত্তে লাগিলেন—ক্ষণে ক্ষণে যখন বিশ্বস্তবেব জয়-উল্লাস বাড়িতে লাগিল—তখন বাস্তবিকই নবদ্বীপ যেন বৈষ্ণব-বাহিনীর পদভরে ঘন ঘন কম্পাঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিশ্বনি, আর মাঝে মাঝে প্রভুর হৃদয়ধ্বনি, গলদ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছেন, তথাপি ক্লান্তি বোধ নাই। বিষম উৎসাহে অদম্য অবোল হৃদয় ছাড়িয়া বলিতেছেন—

নদের নিমাই।

‘এদ দে—মদ্ দে।’ ভক্তগণ পবিত্র গঙ্গাবাবি দান করিতেছেন।
আঙ্গিকার এ কীর্তনে আর কোন ভক্তই গোপদান কবিতে বাকী নাই,
সকলে নিমাই-নিত্যানন্দকে বেটন কবিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে
হরিদাস, শ্রীদাম অথৈত, গদাধর, জগাই-মাধাই প্রভৃতি ভক্তগণ
উন্মাদ ভৈরব বেশে কাজীব দর্প চূর্ণ কবিতে চলিয়াছেন।

ক্রমে সমস্ত ভক্তসমূহ চাবিটা দলে বিভক্ত হইল। এক একটা দলে
এক একজন প্রধান ভক্ত। হবিদাস, শ্রীদাম প্রভৃতি কতকগুলি ভক্ত
লইয়া একটা দল গঠন করিলেন। প্রভু নিমাই, নিত্যানন্দকে লইয়া
আর একটা দল গঠন করিলেন এবং যাবতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এই দলভুক্ত
হইয়া ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

আজ বিবাত সংকীর্ণনের আয়োজন; নিমাই পণ্ডিত আজ কাজীব
দর্পচূর্ণ করিবার জন্ত স্বয়ং ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই সে যুদ্ধে
আয়োজন এত মহৎ—তাহাব ঘন গভীর গর্জন এত ভয়ঙ্কর। যে শুনিল
সেই আসিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গবাঞ্চে, কান্তারে, পথে, মাঠে, ঘাটে
প্রভুব সেই দোদুণ্ড লীলা-মাধুবী দেখিবার জন্ত মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়াছে।
শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া আয়ত-লোচনে ফুল-বদনে তাঁহাদেব প্রাণপ্রিয়
নিমাইটাদের সে রূপমাধুবী, সে অপ্ৰতিহত প্রভাব দেখিবার জন্ত
গবাঞ্চ আড়ে আড়ী পাতিয়া বসিয়া আছেন। শচীদেবী প্রাণের
আবেগে বলিতেছেন—“মরি মরি। আজ আমার নিমাই ভক্তবৃন্দের
মান রক্ষা করিবার জন্ত—সংকীর্ণনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত,
কাজীর সহিত ধর্মযুদ্ধ করিতে যাইতেছে। ভগবান! তাহার মুখ
রক্ষা কর।”

নদের নিমাই ।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপ্রিয় হৃদয়েষবের জয়লাভেব জন্ত, বিজয়-প্রদায়িনী মহামায়ার শবণাপন্ন হইতেছেন ।

আজ নবদ্বীপের প্রতি গৃহ সজ্জিত, প্রতি গৃহই মঙ্গলঘট, পুষ্পমালা এবং ধ্বজপতাকায় সুশোভিত । সকলেই জানেন—নিমাই সংকীৰ্ত্তন আবস্ত কবিলে, তাহাতে বৃন্দাবনের যাবতীয় বস-মাব্য্য মুক্তিমান হইয়া দর্শকেব প্রাণমন বিমোহিত কবে । তাই আজ প্রস্তুতি পুত্র কোলে লইয়া—দর্শন-শক্তিহীন অন্ধ কাহাবও হাত ধবিয়া, পথেব ধারে দণ্ডায়মান হইয়াছে । আশা করিয়াছে—আজ মধুব ব্রজরস পান করিয়া জীবন সার্থক করিবে ।

গোধূলি সময়ে এই বিবাট মিছিল বাহিব হইল । নগব আলোক-মালায় সজ্জিত, পথে যাইতে কোন কষ্ট নাই ; তাহাব উপর অগণিত মণাল লইয়া অভিভাবকগণ অগ্র-পশ্চাৎ ছুটাছুটা কবিতেছে । সে এক অপূৰ্ব শোভা, অপূৰ্ব বিহ্বলভাবে ভক্তগণ ভক্তি-উন্মাদনায় উন্মত্ত । সহস্র সহস্র নর-নারী পুলকপূৰ্ণ তনুমন লইয়া, এই অভিনব ধর্মযুদ্ধ সমারোহে জীবন উৎসর্গ কবিতে ছুটিয়াছে । হরিনামের সেই প্রাণমাতান উচ্চরোল এবং তাহার আনন্দ-জয়ধ্বনি দিক-দেশ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল ।

যুদ্ধেব সময় যেমন সেনাপতির আদেশক্রমে সৈন্তগণ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া, আপন আপন যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকে—তেমনি এ ধর্মযুদ্ধেও সেনানায়ক নিমাইচন্দ্রের আদেশে, ভক্তবীরগণ জীবমোক্তির জন্ত—ধর্মরক্ষার জন্ত, ইজিত যাজেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে । অত্যাগ্ন যুদ্ধে যেমন তুরী, ভেরী,

নদের নিমাই ।

জয়চন্দ্র প্রভৃতি বণবাচ্যসহ জয়োল্লাস হইয়া থাকে, এ যুদ্ধেও তেমনি খোল-কবণাল সহ রামশিখার “দশকুশী” মহা হাবিকীৰ্ত্তনের প্রেমোন্মাদ ভাষণ জয়ধ্বনি, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে এততানে উদ্দেশ্যবীত হইয়া ভক্তপ্রাণে স্রবণাবা—আর অভক্তের প্রাণে ভয় বিষেব বিষাদ ধাবা ঢালিয়া দিতে লাগিল।

নিমাইয়ের শব্দে আজ ভগবদ্ভাবের দিব্য আবকাশ। চন্দনেচ্ছিন্ সেই কনককান্তি নিমাইকে ভক্তগণ দেখিল—তাহাদের মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। আব অভক্তগণ দেখিল—নিমাই তাহাদের বমকণী, পাষণ্ডদলন করিতে অবতরণ হইয়াছেন। এই নগব-কীৰ্ত্তনের দল, গঙ্গাব তীব দিয়া ধীরে ধীরে কাজীব গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। বাহতে যাইতে যাহাব গৃহেব দ্বারে আসিতেছে—সেই পবন পুলকিত চিত্তে কৃতকৃতার্থ হইয়া, কবষোড করিতেছে—ভক্তিভাবে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু পদধূলি লইতেছে। আব বাহার অভক্ত—তাহাবা ভয়ে সবিয়া যাহতেছে। বমগীর্ণ আনন্দচিত্তে হলুধনি ও শঙ্খধনি কবিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা ও বিদায় দান করিতে করিতে প্রার্থনা করিতেছে :—

“তুয়াব চরণে মন লাগু বহ বে শাবঙ্গব ।”

প্রভু গৌরাঙ্গ কখন “শিব শিব” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কখনও “মদ দে—মদ দে” বলিয়া ফুকারিতেছেন। তাঁহার শব্দে আজ অপূর্ণ শক্তির সমাবেশ হইয়াছে—প্রাণ মন ভাবোন্মত্ত। নিমাইয়ের এ মধুর ভাব দেখিয়া আজ বহু বিপক্ষ সাপক্ষ হইয়াছে, ভক্তিরসে রসিত হইয়া

নদের নিমাই ।

প্রাণেব আবেগে বলিতেছে—“এত মিশ্রবংশ, ধন্য জগন্নাথ ! আর যাহার পবিত্র গড়ে এমন সন্তান জন্মিয়াছে, সেই শচীদেবীও যে বহুগর্ভা— তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । আজ এই মহাপুরুষেব পবিত্র পদবেণুস্পর্শে নদীয়া ও নদীয়াবাসী এত হইল ।”

নিমাই পণ্ডিত আজ কাজীকে দমন কারবার জন্য রণসজ্জা করিয়া বাহির হইয়াছেন । হবিনাম-মহামন্ত্রই এ যুদ্ধেব শাণিত অস্ত্র । যে কখনও গান গাহে নাই—গান গাহিতে জানে না, সেও আজ মধুব হুবে হবিগুণগান কাবয়া, শ্রোতাগণকে মোহিত কবিতেছে । ভাবেব ঘোরে যাহা বাহির হইবে—তাহাই মধুর, প্রেমিক আবেগভরে যাহা গাহিবে— তাহাতেই শ্রোতার মন-প্রাণ মোহিত হইবে । প্রেমভক্তিস্তে তুমুয় হইলে, অতিবড় করুণ কর্ত্তও যে স্বকর্ত্ত হইয়া যায়, তাহার মোহনীশক্তি যে সন্মোহন-শক্তির দ্বায় সকলকে আকৃষ্ট কবে ।

দেখিতে দেখিতে প্রভু নব নটবব বেশ ধরিলেন । যে বেশে একদিন ব্রজগোপীর মনপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রজের পশুপক্ষীও যে বেশে আকৃষ্ট হইতে বাদ পড়ে নাই, আজ সেই মোহন বেশে প্রথমে পরম ভক্ত মাধাইয়ের নামে প্রাতঃস্তিত ঘাটে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন । তারপর সেই বিপুল জনসংঘ সঙ্গে লইয়া গগন-বিদারী হরিশ্রবণ করিতে করিতে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিলেন ।

কাজী চাঁদ খাঁ শাক্তগণের প্ররোচনায় সংকীর্ণন বদ্ধ করিবার জন্ত কয়েক দিন নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; কিন্তু তারপর তাহার সে খেয়াল নাই, নিজের বাড়ীতে আমোদে মত্ত হইয়াছেন । এমন সময় হঠাৎ তাহার কর্ণে হরিনামের ভীষণ চীৎকার প্রবেশ করিল ।

নদের নিমাই ।

নিমাই যে এত শীঘ্র সমগ্র দেশকে খেপাইয়া, লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে তাঁহাব বাটীর দিকে আসিতেছে, তাহা তিনি ধারণায় আনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন—প্রজা সকলে তাঁহার হুকুম অমাগ্ন কবিতেছে, তাই তিনি বলিলেন—“দেখতো, কাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে ; আমার নিষেধ সত্ত্বেও কে হবিনাম কবিতেছে ?”

কাজীর লোকসকল বাহির হইয়া দেখিল—নদীস্রোতের মত জনস্রোত তাহাদের বাটীর অভিমুখেই আগমন করিতেছে। তাহারা কাজীকে এই সংবাদ দান করিয়া, নিমাই যে সকলকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া সকলেই পলায়নপর হইল। এই অসংখ্য জন-বাহিনীর নিকট কাজীর মুষ্টিমেয় সৈন্য কোথায় লাগিবে? প্রমাদ গণিয়া কাজী প্রাণভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবগণ কতৃক কাজী সাহেবের বাটী পরিবেষ্টিত হইল।

তখন হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিরোধ চলিতেছিল, মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া অযথা শাস্তি প্রদান কবিত। আজ তাহারা বহুলোক একত্র হইয়াছে, সজ্ঞপ্তি তাহাদিগকে অশেষ বলশালী করিয়াছে, কাজেই তাহারা ছাড়িবে কেন? কেহ কেহ অত্যাচার করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরানন্দেব সকলকে নিষেধ করিলেন। নিমাইয়ের ইচ্ছিতে সকলে স্থির হইল বটে, কিন্তু গগনভেদী হরিনামের ধ্বনি করিতে কেহ ছাড়িল না। মুহূর্হু গগন-পবন বিদারিত করিয়া উচ্চরোলে হরিশ্রবণ হইতে লাগিল।

নিমাই পণ্ডিত কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

নদের নিমাই !

পাঠনা কবিলেন। কাজীব লোকজন সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন
করিয়াছিল, দুই একজন পাইক, যাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া বসিয়াছিল,
নিমাই তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“তোমাদেব কাহাবও
বান ভয় নাই, আমরা তোমাদেব কোন অনিষ্ট কবিব না, তোমরা
একবার কাজী সাহেবকে ডাকিয়া দাও।”

জনৈক ব্যক্তি চাঁদ খাঁবে ডাকিয়া আনিল। কাজী বাহিবে আসিলেন
বেং সেই বিবাট জন-বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পরে গোবিন্দকে
গোবিন্দেব নায়ক বৃত্তিতে পাবিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

প্রভু অভয় দিয়া বলিলেন—“কাজী সাহেব! আমরা আপনার
কোন অনিষ্ট কবিত্তে আসি নাই, তবে শুনিলাম—আপনি নাকি
আমার সম্প্রদায়কে হরি-সংকীৰ্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন—তাই
আসিয়াছি। হরি সংকীৰ্তন—কলিযুগ-নিস্তারের একমাত্র উপায়;
দেব এক্ষণে আমাদের অনুকূল, তবে আপনি প্রতিকূল কেন? আর
ধর্ম হস্তক্ষেপ করিলে জাতির অপমান করা হয়, জাতি অপমানিত হইলে
সংজ্ঞাশক্তি জাগিয়া উঠে, তখন রাজ্যপ্রজা সম্বন্ধ থাকে না। ধর্ম যে
হিন্দুর প্রাণের জিনিষ, ধর্মের জন্ত তাহারা অগ্নিবদনে প্রাণ বিসর্জন
দিতে পারে, তা কি আপনি জানেন না?”

কাজী সাহেব নিমাই পণ্ডিতের সেই মধুব রূপ ও তাঁহার শ্রীমুখের
সেই মধুব যুক্তিপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন—“পণ্ডিত! আমি
যে ইচ্ছায় তোমার হরি সংকীৰ্তন বন্ধ করি নাই। তোমাদেরই কয়েকজন
লাক আসিয়া আমাকে বলিল যে, “নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক হইয়া
মনগড়া একটা ধর্ম প্রচার করতঃ, আমাদের জাতিনাশ করিতেছে,

নদের নিমাই ।

আপনি তাহাতে বাধা দিন, মড়বা আমাদেব বড়ই অনিষ্ট হইবে ।
আমি সেইজন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রচার কবিয়াছিলাম ।”

নিমাই বলিলেন—“না সাহেব । তাহা কখনই হইতে পারে না, তাহ
হইলে দেশের সমগ্র লোক ইহাব পক্ষ হইত না । আজ আমাব
লোকবল দেখিয়া এবং বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমাব দলভুক্ত
দেখিয়া বুঝিয়া লউন—উহা নিশ্চয়ই আমাব বিপক্ষপক্ষীয় লোকদিগের
প্রবঞ্চনা বাক্য । দেখুন, কত লোক এবং কত পণ্ডিত আমাব দলে
আপনাব প্রসিদ্ধ কোটাল জগন্নাথ ও মাধব, সমস্ত পাণ্ডাবক অত্যাচার
ভুলিয়া—আজ আমাব দলভুক্ত হইয়াছে । আপনি বুদ্ধিমান ও
বিবেচক, ইহাতেও কি বলিতে চান যে—হবি-সংকীৰ্তনে দেশেব অমঙ্গল
হইতেছে ?”

কাজী দেখিলেন—জগাই-মাধাই ঘোর পাষণ্ড ছিল, অহোরাত্র মত্ত
পানে বিভোব থাকিত এবং সকল প্রকাব দুষ্কর্মই করিত, তাহারা যে
ইহজন্মে কখনও মত্তগ্ৰস্ত লাভ কবিবে—তাহা স্বপ্নেবও অগোচব ছিল ।
কিন্তু সেই পাষণ্ডদ্বয় যখন নামেব গুণে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া
সন্ন্যাসী হইয়াছে, তখন হরিনাম নিশ্চয়ই জীবের মঙ্গল-নিদান । ইহাব
প্রচাবে নিষেধ কবা নিশ্চয়ই অত্যাচার । গৌরানন্দেব কাজীর প্রতি কটাক্ষ
করিলেন, কাজীব নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন—চাঁদ খাঁ যেন নবজীবন
লাভ কবিলেন । তিনি বলিলেন—“পণ্ডিত । তুমি আমার পরম বন্ধু
নীলাশ্বর চাচার দৌহিত্র ; তাহা হইলে আমি তোমার নানা হইলাম ।
বারা ! আমার যদি কোন কষ্ট হ’য়ে থাকে, তাহা হইলে তুমি কিছু
মর্মে ক’র না ।” কাজী একেবারে গলিয়া গিয়া স্পষ্ট বলিলেন—“নিমাই !

নদের নিমাই !

রাজ আমি তোমাকে যেন মানুষ দেখিতেছি না, তোমার ভিতর কোনও দেবশক্তির সমাবেশ দেখিতেছি। অতএব আমার ক্ষমা কর, তুমি কি সাও বল ?”

নিমাই বলিলেন—“রাজার কাছে দরিদ্র আর কি চায়—ভিক্ষা !”

কাজী বলিলেন—“তোমার মত ধার্মিক-ভিক্ষুককে কি ভিক্ষা দিব, আমার কি আছে ? তাহার উপর আমি যবন-জাতি !”

নিমাই বলিলেন—“রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁহার জাতিত্ব নাই। আপনি দেশের শাসনকর্তা—আপনার ক্ষমতা অসীম ; আপনি এই ভিক্ষা দিন—যেন আপনি বা আপনার কোন লোক আমাদের কীৰ্ত্তনে কোনও বিশ্ব-বাধা প্রদান না করে।”

পণ্ডিতের কমনীয় কান্তি, তাঁহার স্তম্ভুর আলাপ-আপ্যায়ন এবং ততোধিক তাঁহার কটাক্ষ—চাঁদ খাঁকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি বলিলেন—“পণ্ডিত ! অতঃপর আমি বা আমার কোন লোক তোমার সংকীৰ্ত্তনের কোন অনিষ্ট করিবে না, সে বিষয় তুমি নিশ্চিত থাক।” তারপর যবন-হরিদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হরিদাস ! তুমিই ধন্য। জীবনের তুচ্ছ আশা-ভরসা সকল পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, মানুষের তাহা অপেক্ষা মহৎ ব্রত আর কিছুই নাই। আমি আজ তোমাদের সহিত নিমাই পণ্ডিতের মত মহাপুরুষকে ভবনে পাইয়া ধন্য হইলাম।”

কাজীসাহেব হৃষ্টচিত্তে নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কাজীর দৰ্প চূর্ণ হইল, অবশেষে কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি অশেষ উক্তি প্রদর্শন করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন দেখিয়া, বৈষ্ণবগণ

নদের নিমাই ।

নিমাই পণ্ডিতেব জয়ধ্বনি সহকারে সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে বাড়ী ফিবিলেন ।

কাজীসাহেবও হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে যোগদান করিয়া, মহাপ্রভুর সম্মান রক্ষার জন্ত কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন । হরিনামের এমন মন-মাতান প্রাণ-জুড়ান শক্তি যে, বিধর্মী চাঁদ খাও কিছুক্ষণের জন্ত সেই শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নেত্রনীর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তারপব সকলেব নিকট অতি বিনয়ের সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । চাঁদ খাঁ সেই হইতে এক প্রকাব হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন ; হরিনাম শুনিলে তাঁহাব চক্ষু হইতে প্রেমাক্রম বহির্গত হইত । এখনও নবদ্বীপে চাঁদ খাঁর কববে, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সংকীৰ্ত্তনে বাহিব হইয়া স্ত্রীতিব পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ, মৃত-শাসনকর্তার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন ।

আজকাল ধর্ম-প্রচারকগণ কত উপদেশ দেন—কত কথা বলেন, কিন্তু শ্রোতাব কর্ণে সে কথা বা উপদেশ অতি অল্পক্ষণও স্থান পায় কি না সন্দেহ । কিন্তু নবদ্বীপে নিমাইচাঁদেব এমন শক্তি ছিল যে, তিনি মুহূর্ত্তে একটা মাত্র ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত করিতে পারিতেন , হরিনাম-মহামন্ত্র বলে মহা পাষণ্ডকেও নত করিয়া, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাইয়া লইতে পারিতেন । যেমন বাজীকর মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, কত প্রকার খেলায় মানুষকে বশীভূত করে—সেইরূপ মহাপ্রভু লীলামন্ত হইয়া এক একবাব হরিনামের আবেশভরা নৃত্যে যে কত শত পাষণ্ডকে এককালে বশীভূত করিতেন, তাহার স্থিরতা করা দুঃসাধ্য ।

মানবকে বশীভূত করিয়া লীলা প্রচার করিতে হইলে, দৈবশক্তির

নদের নিমাই ।

প্রয়োজন, নতুবা কেবল বিজ্ঞা-বুদ্ধিতে কাজ হয় না। নবদ্বীপের জায়
মুসলমান সুরক্ষিত নগবে, বিজ্ঞাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপের
মত প্রবল ক্ষেত্রে নিমাই যে এত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—
কেবল ঐশীশক্তির পূর্ণত্বই তাহার একমাত্র কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গ
মহাপ্রভুকে যে ভগবানের অবতার বলিয়া ভক্তগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন,
তাঁহার এই সকল অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সে বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার
কোন কাবণ থাকে না। তাঁহার পদার্পণে নদীয়া পবিত্র এবং নবদ্বীপ
যে তীর্থ হইয়াছিল—তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

— —

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রূপ-সনাতন ।

কাজীসাহেব নিমাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট হরিণাম করিতে চকুম দিলেন এবং বলিলেন—“তিনি কিম্বা তাঁহার কোন অমুচর আর কখন তোমাদিগকে হরিণাম কবিত্তে বাধা দিবে না, বরং এ কার্য্যে তোমাদের সহায়তা করিবে ।” কাজীও নিমাই পণ্ডিতের প্রেমের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া, সময়ে সময়ে মধুব হরিণাম উচ্চারণ করিতেন ।

নিমাইয়ের এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কবিয়া এবং সদাসর্বদা তাঁহাকে ভাবাবিষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে দেখিয়া, সকলে ভগবান ভাবে তাঁহার পাদপদ্মে নত হইয়া পড়িল । শচীব নিমাই এখন একপ্রকার উন্মাদ—হরিপ্রমে মাতোয়াবা । ভক্তভাব হইলে প্রভু এইরূপ আবিষ্ট চিত্তে থাকেন, ঈশ্বরে কিরূপ ভাবে তন্ময় হইতে হয়, ভক্তকে তাহা দেখাইয়া দেন । আর যখন ভগবদ্ভাব হয়—তখন তিনি সকলকে “নিজ্জেই ঈশ্বব, নন্দুলাল শ্রীকৃষ্ণ” এই ভাব দেখান, শ্রীমন্নিরে বিগ্রহমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া, তাহার স্থলে আপনি উপবিষ্ট থাকিয়া ভক্তকে অভয় প্রদান করেন । নিমাইয়ের নানাভাব—কখন রাখাভাব, কখন বলরামভাবও হইয়া থাকে ।

ভগবান জীবোদ্ধারের জন্ত নদীয়ায় অবতীর হইয়াছেন । শচীদেবীর

নদের নিমাই :

নিমাইচাঁদই শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত তিনি অপরাপর যুগের মত অবতার হইয়াছেন বুঝিয়া, চাবিদিক হইতে ভক্তগণ নবদ্বীপে সমবেত হইল এবং প্রভুব দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পাগিল—নদীয়া হরিনাম-শ্রোতে ভাসিয়া গেল। নিমাইয়ের কিন্তু তাহাতেও সাধ মিটিল না, তিনি সমগ্র দেশকে হরিনামে বিভোর করিতে—নামামৃত পানে সঞ্জীবনী-শক্তি দান করিতে বন্ধপরিকর হইলেন, সমস্ত গোড় নগর ঘুরিয়া প্রেম বিলাইবাব ইচ্ছা তাঁহাব বলবতী হইল।

নিমাই পাগলের পাবা দিশাহাব হইয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিলেন, ভক্তগণ আহাব-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহাব অনুসরণ করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—নিদ্রা-তন্দ্রা তিরোহিত হইয়াছে ; নামহুধা পানে জীবনের সমস্ত বষাদ-অবসাদ ঘুচিয়া গিয়াছে—তাই সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া, প্রেমের পাগল গোরাচাঁদেব অনুগমন করতঃ জীবন সার্থক করিতেছে।

তখন সমগ্র গোড়নগরের নবাবত্ব লাভ করিয়া হোসেন সাহ দোদ্দিগু প্রতাপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই কম্পাঘিত কলেবর। প্রেমবিশ্বল নিমাই পণ্ডিত বাহাবও দর্প বাখেন না—কাহাকেও গ্রাহ করেন না। তাই আজ নবদ্বীপের কাজী চাঁদখাঁর মত হোসেন সাহকেও দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে চলিয়াছেন। চাঁদখাঁর প্রবল কোটাল, পশুভাবাপন্ন জগাই-নাধাইকে উদ্ধার করিয়া, প্রভু এখন কাহার জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ? একজন বিজাতীয় নরপতিকে ধর্মশিক্ষা দানে উদ্ধার করিবার জন্ত—তাঁহাব এত প্রয়াস, এত আকাজ্জা, এত অহুসার !

পূর্বেই বলিয়াছি—মুসলমান রাজত্বের যাবতীয় কর্তৃত্ব-ভার হিন্দুগণের

নদের নিমাই ।

উপবই ব্রহ্ম থাকিত ; রাজ্যের বড় বড় পদে হিন্দুগণই নিযুক্ত হইতেন । হিন্দুগণ যে সকল কার্য্যে উপযুক্ত এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন—মূলমান নরপতিগণ তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেন । তাই গোড়েব মুসলমান বাজা হোসেন সাহেব অধীনে সন্তোষনাথ ও অমরনাথ নামে দুইজন দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ, প্রধান কর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন । ইহাবা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । হোসেন সাহ তাঁহাদের বিজ্ঞাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রী প্রদান কবেন ।

বাজ্যের কণ্ঠস্থ পাইয়া, দুই ভ্রাতাষ নানাবিধ অসং উপায়ে বহু অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন । ইহারা যেরূপ কুকর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন, সংকর্মেও তাঁহাদেব ধন সেইরূপ পরিমাণে ব্যয়িত হইত । নদীয়ার দুঃস্থ পণ্ডিতগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে ইহারা কুণ্ঠিত হইতেন না । নিমাই ইহাদেব মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পাবিয়া, উদ্ধাব সাধনে যত্নবান হইলেন । ইহাদের পিতা কুমারদেব ও জননী রেবতীদেবী পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল কামনায় সতত ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ে যেন ভগবন্তক্তির প্রাচুর্য্য সম্পাদন হয় , এইজন্ত সকল দেব-দেবীর নিকট তাঁহারা কায়মনে মানসিক করিতেন । পিতামাতার কাতর প্রার্থনায় জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষনাথ ক্রমশঃ ধার্মিক হইয়া উঠিল ; কিন্তু অমরনাথ বিজ্ঞাবুদ্ধির অল্পতা হেতু এবং নানা প্রলোভনে পড়িয়া অধর্ম্মের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল দেখিয়া, ধার্মিক পিতামাতা জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত কনিষ্ঠকে গোড় নগবে জীবিকা উপার্জনের জন্ত পাঠাইয়া দিলেন । অল্পায়াসেই এই ব্রাহ্মণ পুত্রদ্বয় গোড়ে আসিয়া দবির খান ও সাকর মল্লিক উপাধী লাভ করতঃ,

নদের নিমাই :

হোসেন সাহের মজীপদ প্রাপ্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে এত বড় দায়িত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্যও তাঁহাদের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হইল না এবং রাজাও তাঁহাদের কাৰ্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

যাহার যত বিষয়-বৈভব, তাহার ভাবনা-চিন্তা তত বেশী। নিমাই যেদিন সদলবলে হোসেন সাহের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—লক্ষ লক্ষ লোক যখন তাঁহার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে দিক-দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল—তখন হোসেন সাহ সেই বিষম কলরব শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন—বুঝি কোন শত্রু তাহার পুরী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি মজীদকে হইয়ার তথ্য অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। দরিব ও সাকর বাহিরে আসিয়া প্রভুর সেই ভূবনভুলান রূপে মোহিত হইয়া গেলেন। দরিব একেবারে বিমোহিত হইয়া প্রভুর চরণতলে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; সাকর নড় হইলেন বটে, কিন্তু দরিবের মত বিগলিত হইলেন না। নিমাই ইহাদের দুই ভাইকে রূপ-সনাতন নাম দিয়া, রূপকে বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিলে রূপ সেইদিনই সন্ন্যাস-ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। এত বড় একটা মজীদ পরিত্যাগ করিতে—এত বিস্ত-বিতব, অতুল সম্মানের এরূপ মোহজাল কাটিতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। যাহার বিবেক-বহির উদয় হয়—সংসারের মায়া-মোহ অতিক্রম করিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় না।

সনাতনের প্রাণ এখনও ঠিক হয় নাই; মন এখনও সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্তরূপে গঠিত হয় নাই, কাজেই তিনি আরও কিছুকাল মুসলমান

নদের নিমাই।

পত্রখানি প্রদান করিলেন। সাকব মল্লিক শ্রোকেব পদ পূরণ করিয়া
তাহা পাঠ করিলেন তাহা এইরূপ :—

“যদুপভেঃ ক গন্তা মথুবাপুৰী
বঘুপভেঃ ক গতান্তব কোশলা ।
হীত বিচিন্ত্য কুরু স্ব মনঃ স্থিরং
নশ্বরং ভগদিদমবধাবয় ॥”

এইজন্ত শাস্ত্র বলেন যে—“পণ্ডিত শত্রু হইলেও ভয়েব তত কাবণ
নাই, কারণ, সামান্য কোনও সূত্রে একদিন না একদিন তাঁহাব
চৈতন্যোদয় হইলে তিনি শত্রুতা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন।”

সত্য সত্য তাহাই হইল। সাকব মল্লিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সদুপদেশ
পাইয়া নিজের দুর্বৃত্তাব বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই ত,
যে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলীৰ সংখ্যা ছাপান্ন কোটি এবং যাহাবা
দোদীপ্ত প্রতাপশালী ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের মথুবাপুরী এখন কোথায়? যে
বঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রবল প্রতাপে বঙ্গকুলপতি বাবণ সবংশে নিধন
হইল—সেই বামেব বাজ্য অযোধ্যাই বা কোথায়? অতএব জগতের
সকলই নশ্বর। কিন্তু ছায়। আমি এ কি করিতেছি? সনাতনের
চিত্ত স্থির হইলে—অহমিকার অপগমে চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি বিশেষ
সম্প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণেব নিকট ক্রটি স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে
স্ববাসে থাকবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

সেইদিন হইতে সনাতনের ভাবান্তর হইল। ভগবান কখন কাহাকে
কোন দিক দিয়া উদ্ধার করেন—কি গুপ্ত সূত্র টানিয়া জীবের জীবনের

নদের নিমাই :

পথ মুক্ত করিয়া দেন—তাহা তিনিই জানেন। সনাতন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম প্রার্থনা কবিয়া স্থিতির হইলেন ; জগতেব সমস্ত যে নখব, জীবনও যে ক্ষণস্থায়ী—এই চিন্তা কবিয়া তিনি দাদার মত সংসাব ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পাবত্রিক উন্নতিব জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। রাজকাধ্য আর শাহাব ভাল লাগিল না, তিনি অনবরত রাজবাটীতে অন্তর্পাশ্বিত হইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে কয়েকবার সাবধান করিয়া দিলেন : কিন্তু সনাতন রাজার কথা গ্রাহ্য করিলেন না, গৃহে বসিয়া কেবল ধর্ম-চর্চায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সনাতনের এইরূপ অবহেলা দেখিয়া, হোসেন সাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। সনাতন নিরুপায় হইয়া কারাধ্যক্ষকে বহু অর্থ উৎকোচ প্রদান করতঃ কারামুক্ত হইয়া একেবারে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। সনাতনের চিত্তবিকার দূরীভূত হইয়াছে এবং সংসারাসক্তি মিটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া—দীনের দয়াল প্রভু নিমাই তাঁহাকে হরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। সনাতন পরমশুদ্ধ নিমাইয়ের অপূর্ব শক্তিবলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং পূজনীয় অগ্রজের সহিত ধর্ম-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। “হোসেন সাহ প্রভুর অম্মিত প্রভাব দেখিয়া অবশেষে তাঁহাব নিকট নত হইয়া পড়িলেন। জীবের উদ্ধার সাধন জন্য হরিনাম প্রচার, পাষণ্ড নাস্তিকগণকে আন্তিক করিয়া তাহাদের জীবনের অন্ধকারময় পথ হরিনামের প্রেমালোকে উজ্জলীকৃত করিয়া, নৃত্তির পথ দেখাইয়া দেওয়াই—শ্রীগোরাধ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আচণ্ডালে প্রেম দান করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার করতঃ

নদের নিমাই ।

বঙ্গদেশে প্রেম-বর্ষেব প্রবল বন্যা প্রবাহিত কবিতা দিতে লাগিলেন । যেখানে অত্যাচার, যেখানে উৎপীড়ন—যেখানে কলহ-বিবাদ—নিমাই সেইখানে গমন করতঃ প্রবল শক্তিপ্রভাবে তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া—প্রেমসূত্রে গাথিয়া দিতে লাগিলেন । সকলেই এক প্রাণ, এক আত্মা হইয়া হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিল । বৈষ্ণব-ধর্মের অভ্যুদয়ে দেশে এক নব-জাগরণেব সূত্রপাত হইল । এমন মধুব নাম কেহ কখনও শুনে নাই—কেহ কখনও বলে নাই, হইতে যে এত মধু—এত প্রেম—এত শাস্তি বিরাজিত, তাহা পূর্বে কেহ অনুভব কবে নাই । হরিনাম ত অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই-নিতাইয়ের মুখে এ নামে যে সুধা স্বরণ হয়, তাহা আব কাহারও মুখে হয় না ।

দেশ যখন হবিপ্রমে এইরূপ উগমগ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম যখন বাজাল দেশকে এইরূপে চাইয়া ফেলিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন নাম-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহারা হইতে লাগিল—তখন প্রভু নিমাইচাঁদ শ্রীবাস, অষ্টৈত্য এবং নিতাই প্রভৃতির উপর কাষাভার দিয়া দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন । প্রাণ আর এত ছোট বন্ধনের মধ্যে বাঁধা থাকিতে চায় না, তাই সন্ন্যাস গ্রহণ কবিতা প্রভুব দেশে দেশে নাম প্রচারের ইচ্ছা বলবতী হইল । কিন্তু তিনি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

অলৌকিক ঘটনা ।

ভাবোন্মাদ নিমাইয়ের অবস্থা কেহ বুঝিতে পারে না। অহরহঃ হরিনামে বিভোর, আবার কখন রাধাভাব হইয়া “কৃষ্ণ কোথা—কৃষ্ণ কোথা” বলিয়া কাদিয়া আকুল হন। ভক্তগণ প্রভুকে একদণ্ড কাছ ছাড়া কবেন না আর প্রভুও ভক্তগণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। প্রভু প্রায়ই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীৰ্ত্তন করেন।

শ্রীবাসের একটা পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। একদিন প্রভু ভাবোন্মাদ হইয়া কীৰ্ত্তন করিতেছেন—ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাস গৃহে গিয়া দেখিলেন, পুত্রের অস্তিম কাল উপস্থিত। তিনি পুত্রকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই পুত্রটী ইহলোক ত্যাগ করিল। রমণীগণ চিৎকার করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু পাছে বাহিরে প্রভুর কীৰ্ত্তনে কোনও ব্যাঘাত হয়, এইজন্ত তিনি মিনতি করিয়া সকলকে চূপ করাইলেন।

শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ বার্তা বৈশীক্ষণ অপ্রকাশ রহিল না। ভক্তগণ শুনিলেন, স্তব্ধমান হইয়া মনে করিতে লাগিলেন—যেখানে ভগবান স্বয়ং লীলারত, সেখানে এইরূপ ভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়—ভক্ত পিতা এইরূপে মনোকষ্ট পায়? সকলের মনে দাক্ষণ দুঃখের সহিত সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্রীবাসের কিন্তু তাহা হয় নাই, পুত্র-বিয়োগে তিনি

নদের নিমাই ।

একটুও বিচলিত না হইয়া, প্রভুর সঙ্গে নৃত্যানন্দে যোগদান করিলেন । কি মায়া মোহের অতীত অবস্থা । এইমাত্র যাব উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, সে কোন প্রাণে আসিয়া আনন্দ মগ্ন হইল ? সাধারণ মানব আমরা, তাই বুঝি যে পুত্রশোকে আনন্দানুভব অসম্ভব ; কিন্তু যাহাব। আত্মানন্দে বিভোর—সংসারের নখবত্ত যাহারা ভাল কবিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ আনন্দ—এরূপ সুখানুভব অসম্ভব নহে । যাহারা প্রকৃত ভক্ত, ভাবের ঘোরে যাহাদেব জীবন বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন বলিয়াই অনুভব করেন । পরকালই তাঁহাদের পক্ষে সর্বস্ব, পরকালের চিন্তাই তাঁহাদেব মহা চিন্তা । মৃত্যু তাঁহাদের দুঃখের নহে, যৌবন-জরার গ্রায় অবস্থা পরিবর্তন, তাঁহাদের নিকট মহা সুখের সুখ-সম্মিলন । তাই শ্রীবাস নিরানন্দ না হইয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন । যখন আনন্দময় মহাপ্রভু তাঁহাব আক্షিনায় আনন্দবত, তখন তাঁহাব গৃহে নিবানন্দ কি কখন সম্ভব ।

মরি মরি । শ্রীবাসের মত ভক্ত কয় জন আছে ? বাটীর মধ্য হইতে করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, ভক্তগণ একে একে অস্থির হইয়া নৃত্যে বিরত হইতে লাগিলেন । দেখিয়া শুনিয়া শ্রীগোরাঙ্গেরও ভাব বিপদায় হইল, প্রাণ ঘেন তাঁহার কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল । অন্তর্ধামী প্রভু শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন—“শ্রীপাদ । তোমাব বাটীতে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?”

শ্রীবাস বলিলেন—“অসম্ভব কথা প্রভু । যেখানে তুমি স্বয়ং উপস্থিত, সেখানে কি কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে ?”

শ্রীগোরাঙ্গের বিশ্বাস হইল না, তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

নদের নিমাই !

করিলেন । তাহারা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—“হাঁ প্রভু ! পণ্ডিতের পুত্র ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে ।”

নিমাই পণ্ডিতের করুণ অন্তঃকরণ দ্রব হইল । প্রিয় ভক্ত শ্রীবাসের চক্ষে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন । শ্রীবাস সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“তোমরা কি করিলে, আমি পুত্রশোক অগ্নান বদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু মহাপ্রভুর অশ্রুজল আমার পক্ষে অসহ্য । প্রভু ! আপনি স্থির হউন, পুত্র গিয়াছে তাহাতে আর হইয়াছে কি ? ঠাকুর, আমি ভুবন-মোহন চিদঘন আনন্দময় মূর্তির পরিবর্তন কখনও দেখিতে পারিব না, আপনি যে রূপ ছিলেন—সেই ভাব ধারণ করুন ।”

নিমাই শ্রীবাসের হৃদয়-নিহীত গভীরতম ভক্তিভাব—তাহার মায়া-মোহের অতীত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া, বিভোর চিত্তে বলিলেন—“মৃতের দেহ বাহিরে আনয়ন কর ।”

অনুমতি পাইয়া সকলে শ্রীবাস-পুত্রের মৃতদেহ প্রভুর নিকটে আনয়ন করিল । সেই সুন্দর সুললিত দেহ দেখিয়া নিমাই বলিলেন—“কে বলিল বালক মারা গিয়াছে ? মরি মরি, এ দেহ কি মৃতের হইতে পারে ? তাহা হইলে যে কত বিবর্ণ হইয়া যাইত, এ যে জীবিত ।” এই বলিয়া গাচীর দ্বালাল আনন্দময় মূর্তিতে নিকটে গমন করতঃ সেই ভক্ত শিশুকে আনন্দ-আবরণে আবরিত করিয়া বলিলেন—“বৎস ! কিসের নিমিত্ত তোমার এ শয়ন ? উঠ—জাগরিত হও ।”

শব তৎক্ষণাৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রভুর কথার উত্তর দান করিল । বলিল—“প্রভু ! এ জগতে আমার সমস্ত কাৰ্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কাজেই এস্থান আমার আর ভাল লাগিতেছে না । আমি নবজীবনে

নদের নিমাই।

নূতন স্থানে ঘাইতেছি ; আপমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করুন।” এই বলিয়া শব হরি হবি ধ্বনি করিয়া আবার নীরব হইল। এইবাব তাহার শরীর মৃতের স্থায় বিবর্ণ, জ্যোতিঃহীন হইল, দেহী দেহ-গেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশুর মুখের কথা শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, তাহার আযু শেষ হইয়াছে ; ইহজীবনের কার্য্য তাহার ফুরাইয়াছে, তাই তাহার মহা-প্রস্থানের সময় উপস্থিত। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন শোক দুঃখ হইতে বিরত হইলেন। সকলে শ্রীগোবিন্দের অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃতের সৎকার করতঃ উচ্চরোলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীবাসের পুত্র পরলোক গমন করিলে, শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভু বিশ্ব্রাবিষ্ট চিন্তে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাবপর বলিলেন—“নদীয়াব অল্পবয়স্ক বালক পর্য্যন্ত যখন শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য একপ ভাবে বুঝিয়াছে, তখন আর নদীয়ায় কালক্ষেপ করা উচিত নয়, অন্য স্থানে ইহাব প্রচার করিতে হইবে। একস্থানে বসিয়া সময় নষ্ট করিলে কি হইবে, সময় ত কাহার হাত ধরা নয়। প্রভু সেদিন সকলকে আনন্দ দান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

—:—

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

মাতা-পুত্রে ।

নিমাই পূর্বে আসক্তির বশে সংসারের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন ।
বিদ্যা উপার্জন, ধন উপার্জন প্রভৃতির জন্ত টোল স্থাপন করিয়া এখন
একেবারে নিলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন । জীবের দুঃখ দেখিয়া তিনি
আব সংসার করিতে পারিতেছেন না । তাই সংসার ত্যাগের সংকল্প
এখন তাঁহার মনোমধ্যে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছে । সংসারে এরূপ
ভাবে আবদ্ধ থাকিলে সকলে তাঁহাকে ভেকধারী বলিবে ; বুঝি অর্থ
উপার্জনে—সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্তই নিমাই এরূপ কপটতাচরণ
করিয়া থাকে । সুতরাং লোকের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ত, সাধারণ
জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ
হইলেন । সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে না ঘুরিলে, ধর্মপ্রচার হইবে
না—বৈষ্ণব-ধর্মে জীবের প্রবৃত্তিও বাড়িবে না ।

ভক্তগণের নিকট নিমাই আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন ; সকলে
শুনিয়া দুঃখে ত্রিয়মান হইল ; যাহারা ভক্তিমার্গের চরমে উঠিয়াছিল,
তাহারা বুঝিল—বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিবার জন্তই প্রভুর সন্ন্যাস
গ্রহণ । সংসার মদে মত্ত হইয়া কেবল নাম প্রচার করিলে, লোকে
তাঁহাকে ত্যাগী বলিবে না—তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে না । অতএব
জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত গৃহ-ত্যাগ করাই শ্রেয় । প্রভু এইজন্ত নবদ্বীপ

নদের নিমাই ।

অন্ধকার কবিতা, নানাস্থানে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার কবিত্তে—ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ।

নিমাইয়ের গৃহ-ত্যাগ সঙ্কল্প আর অপ্রকাশ রহিল না । ক্রমে ক্রমে শচীদেবীও কর্ণেও একথা প্রবেশ করিল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন—একদিন একটা সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, নিমাই তাহাকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছিল ; তবে কি তাঁহারই প্রবোচনায় নিমাই এই কাজ কবিত্তে যাইতেছে ? নিমাই যেদিন হইতে ভাবে বিভোর হইতেছে—হবিনামে মত্ত হইয়া সময়ে স্নানাহার করিতে ভুলিয়া যাইতেছে, অমন সোণাব বধুমাতাকে যখন অগ্রাহ করিতেছে—তখন নিশ্চয়ই যে সে মনে মনে আমার সর্বনাশ করিবার জন্য একটা সংকল্প পাকাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ।

পাছে বাছা আমার সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়, পাছে গৃহত্যাগ করে ভাবিয়া আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলাম । অমন পরমা হৃন্দরী, কার্যকুশলা, পতিভক্তিপরায়ণা বধু যবে আনিলাম, ভাবিলাম—নিমাই এইবার ভাল করিয়া সংসারী হইবে, সংসারের আলয়-আশ্রয় দেখিবে । কিন্তু এখন দেখিতেছি হিতে বিপরীত হইল । সে আর বধুমাতার প্রতি কিরিয়্যাও চায় না, গৃহে শয়ন কালে কেবল “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিয়া উঠে । বধুমাতা তাহা শুনিয়া মুখে কিছু না বলুন—মর্ম্মহঃখে দহিয়া য়েন । স্বামীর চিন্তা করিয়া তাঁহার দেহ আধখানি হইয়া গিয়াছে, তাই স্নান হইতে দিন কয়েকের জন্য পিতৃগৃহে পাঠাইয়াছি ; তাই কি সে সেখানে থাকিতে চায় । কিন্তু আজ আবার এ কি শুনি—তাহা হইলে যে ঘোর সর্বনাশ ।

নদের নিমাই ।

নিমাই আহারের পর আবেগ ভরে বসিয়া আছেন—এখনও কোন অস্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই । শচীদেবী পুত্রের ভাব দেখিয়া এবং লোকমুখে তাহার মর্যাদাস্থিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছেন । পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পূর্ব হইতেই ত তিনি চিন্তা-জরে জর জর হইয়াছিলেন । এক্ষণে সত্যসত্য কি তাঁহার সোণার গৌর গৃহত্যাগ করিয়া, সেই জরে বিকার আনিবে ? শচীদেবী পুত্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন । স্নেহের ছাওয়ার লগ্নে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হাঁ নিমাই ! লোকের মুখে কি কথা শুন্তে পাচ্ছি বাবা, কথা কি সত্য ?”

নিমাই চমকিত হইলেন । জননীর ভাব দেখিয়া—তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ বিষাদক্লিষ্ট বদন দেখিয়া, সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন ।

শচীদেবী বলিলেন—“কোন কথা কহিতেছ না যে ? আমার দিব্য, কথাটা সত্য কি না বল ?”

নিমাই এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন ; সর্বনাশ হয় হউক, তথাপি সংসার ত্যাগ করিয়া জীবে হরিনাম দান করিবেন । তিনি বিচলিত না হইয়া বলিলেন—“মা ! পিতামাতার ঋণ জীবনে শোধ হয় না, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় জননীর ঋণ, আমার মত অকৃতী-সন্তান কখনও শোধ করিতে পারিবে না । মা ! তুমি কিছু মনে করিও না, প্রাণ আর আমার সংসারে মত্ত হইতে চায় না ; সর্বদাই যেন ঐক্লব-বিরহে আকুল হইয়া উঠিতেছে । পুত্রের মঙ্গল মাতার প্রার্থনীয় ; মা, তুমি আমাকে অকপটে বিদায় দাও, আমি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ।”

নদের নিমাই ।

পুলকে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ গৰ্ভধাবিনী জননী প্রাণ খুলিয়া বলিতে পাবে ? নিমাইয়ের নিধাত বচন শুনিয়া, শচীদেবী পাগলের মত হইয়া উঠিলেন । বোমল প্রাণ নিমাইয়ের মুখে আজ এই মন্মথার্থী প্রার্থনা শুনিয়া শচীদেবী মুচ্ছিত হইবার উপক্রম ববিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদে ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন—“হাঁবে নিমাই । এই কি উচিত—এই কি তোমাব মাতৃভক্তি ?” শচীদেবী বেশী বাতবতা প্রকাশ করিলেন না, পুনবায় ধীবে ধীরে বলিলেন—“তোমাব সংসাবে দুইটী মাত্র প্রাণী, আমাব অদৃষ্টে ত স্মৃতি নাই দেখিতেছি । কিন্তু আনন্দ-প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া, সৌভাগ্যবতী বনী-তনয়া হইয়াও যে তোমাব মুখ চাটিয়া এই পৰ্ণকুটীরে পড়িয়া বহিয়াছে, তাহার উপায় কি হইবে ? সে একথা শুনিলে কি করিবে—একবার ভাবিয়াছ কি ?”

নিমাই আবাব মস্তক অবনত কবিলেন । অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নীবে সেই অল্পমম ভক্তি-শ্রদ্ধা—তাঁহাব সেই অতুলনীয় কমনীয়তাব কথা মনে পড়িয়া, নিমাইকে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ কবিয়া রাখিল । তাহাব পব সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া বলিলেন—“মা । যখন তোমাব জগ্ন ভাবনা হইল না, তখন তাহার জন্য এত ভাবনা কিসেব ? আমি কোনরূপ চবিত্র-দোষে দোষী হইয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতেছি না । আমার জীবনাস্ত হইলে তাহাব গভীর দুঃখের কারণ হইত ; কিন্তু আমি জীবিত থাকিয়া দেশে দেশে হবিনাম প্রচার করিব—সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, ইহাতে তাহার ত মুখোজ্জলই হইবে ? আব সে আমার হইয়া তোমার সেবা কবিয়া ধন্য হইবে । ইহাতে তাহাব ত তত দুঃখের কাবণ দেখি না ?”

শচীদেবী পুল্লেব এ সকল কথায় মনে শান্তি অনুভব করিতে

নদের নিমাই।

পাবিতেছেন না। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন—“বাবা! সকলে তোকে
পাশ্বক বলে; জানি তোর হৃদয় অতি কোমল এবং জীবের প্রতি তোর
দয়া। কেবল আমার প্রতি—বিষুপ্রিয়ার প্রতি, আব নদের
ভক্তদেব প্রতি তোর কিছুমাত্র দয়া নেই।” এই বলিয়া শচীদেবী
একলে নয়নজল মোচন করিলেন।

নিমাইয়ের প্রাণ কোমলতাময়, জননীর দুঃখ দেখিয়া বলিলেন—
‘মা! তুমি যদি ঐরূপ দুঃখ কর, প্রাণ খুলিয়া বিদায় না দাও, তাহা হইলে
আমার সংকল্প ব্যর্থ হইবে এবং জীবের দুঃখ দূর করিবাব জ্ঞাত গৃহত্যাগও
করিতে পারিব না। মা! জীবের দুঃখ মোচন এবং জীব-সেবায়ই
মানব-ধর্ম। যে সন্তান ঐরূপ কার্যে ব্রতী হয়, তাহার জনক-জননী
দত্ত—তাহাদের কুল পবিত্র। তুমি জানিয়া শুনিয়াও যদি তাহাতে দুঃখ
কর, তাহা হইলে আমাকে সামান্য জীবের মত গৃহে আবদ্ধ হইয়া
কেবল পশু-জীবন বহন করিতে হইবে। মানুষের পুত্র পশু হয়,
পশু-কণ্ঠে জলাঞ্জলি দেয়—ইহা কি তোমার মত জননীর অভিপ্রেত?’

শচীদেবী পুত্রের মর্শ্বঘাতী যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া
অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল। ইতিমধ্যে দুই একজন ভক্ত প্রভুর নিকট
আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তাও আজ অতি বিষম; কিন্তু মাতা-পুত্রের ঐ
ভাব দেখিয়া তাঁহারা নিজ স্থানে গমন করিলেন। মনে করিলেন, জননী
পুত্রকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেছেন—এ সময় বাধা দেওয়া উচিত নয়।

অনেক দিন পরে নিমাই আজ গৃহে বাস করিতেছেন। জননী
শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া, পুত্রের নিকট শয়ন করিলেন; নিমাইও

নদের নিমাই ।

আজ জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শেষ শয়ন করিলেন । নিমাই দারুণ চিন্তাব
আবেগ-আবেশ ভাবে দ্বিগমান হইয়া পড়িয়াছেন ; জীবের হাঙ্গাকার,
তাহাদেব পরিভ্রাহী রব যেন তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে ।
শচীদেবী পুত্রের পার্শ্বে নিদ্রিতা হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন—কংস-কাবাগারে
শ্রীকৃষ্ণ জননী যেমন স্বপ্নে দেখিয়া বিস্ময় আবেশে বলিয়াছিলেন—“প্রভু !
ওরূপ সম্বরণ কর, এবে অসম্ভব । যাঁহাব উদরে ব্রহ্মাণ্ড—যিনি ব্রহ্মাণ্ড-
ভাণ্ডোদব, দেবকী তাঁহাকে উদবে ধারিয়াছে ? কমল অঁাখি । এতে যে
তোমাব অমাগ্ন হইবে।” আজ শচীদেবীও সেইরূপ দেখিতেছেন,
তাঁহাব পুত্র যে নামাগ্ন নয়, ভূ-ভাব হরণেব জগ্ন স্বয়ং ভগবান যে
তাঁহার গতকোষে আশ্রয় লইয়া—আজ নিমাইরূপে লীলা বিস্তাব
করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পাবিয়া শচীদেবী “নিমাই নিমাই” বলিয়া
চিৎকার করিয়া উঠিলেন ।

নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শশব্যস্তে ভীতা-চকিতা জননীকে বাহবেষ্টনে
আবদ্ধ কবিয়া বলিলেন—কেন মা ! এই যে আমি, তোমার আঁচলে
আঁচলে রহিয়াছি ।’

জননী স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন—“বৎস ! দয়া করিয়া
ভুমি আমার পুত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছ । এখন বুঝিলাম—তোমাব
কাথ্য অনেক , অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও । আমি
আব তোমার কাথ্যে বাধা দিব না ।” অকপটে জননীর অহুমতি
পাইয়া নিমাই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন ।

প্রাতঃকাল হইলে শচীদেবী সর্কানন্দমনে পুত্রের ভোগের জগ্ন
আহারীয় প্রস্তুত করিতে গমন করিলেন । এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া

নদের নিমাই :

সঙ্গিনীগণের মুখে স্বামীর গৃহত্যাগ-বার্তা শ্রবণ করিয়া, সেইদিনই পিত্রালয় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে প্রাণ-প্রিয়জনকে দেখিয়া একগাল হাসি হাসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। বেহারাব চড়াহাড়ি শুনিয়া, শচীদেবী বাহিবে আসিয়া দেখিলেন—বধুমাতা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। অশ্রু কাষে প্রিয়জনের প্রাণ স্বতঃই সতর্ক হইয়া পড়ে, প্রাণে প্রাণে সে বার্তা জানিতে পাবে। এই গোলযোগে পতিব্রতাব প্রাণ যে পতিব জ্ঞাত কাতর হইবে—বিষ্ণুপ্রিয়া যে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাব আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বধুমাতাকে স্থপালিঙ্গন করিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর পদধূলি লইলে, শচীদেবী তাঁহার মুখচুষন করিয়া “পতিব্রতা হও” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রতিবাসিগণ সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারও মুখে আর সেকপ হাস্য-কোতুক দেখিতে পাইলেন না, গোবাত্তের গৃহত্যাগ-বার্তা শ্রবণে সকলেই বিষন্ন ও মর্শ্বাহত হইয়াছে যাহাকে লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার এত মান—সেই যদি চলিয়া যায়, কান্না চলিয়া গেলে ছায়ার আদর কে করে বা কতক্ষণ থাকে? সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া এবং দেখা দিয়া চলিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীগণের ভাব দেখিয়া, জনরব যে সত্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে আহায়াদি শেষ হইল। অপরাহ্নে নিতাই, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিতে যেন তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে—বাক্যক্ষুণ্ণ হইতেছে না; কেবল আনমনে দাঁড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রভুর মধুর ভাব দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বহুদিনের পর আসিয়া, গৃহের

নদের নিমাই ।

মধ্যে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত করিতেছিলেন । পরম ভক্ত নিতাই ও গদাধরকে দেখিয়া, নিমাই বাহিরে আসিতেছেন—এমন সময়ে শোক-বিহ্বলা মস্তপীড়িতা জননী নিমাইকে হাত নাড়িয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন ; নিতাই গদাধর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন । শচীদেবী বলিলেন—“তুমি যে বলিয়াছিলে, কীর্তনের সময় যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই আমার দর্শন পাইবে, ভক্তগণ কখন আমা ছাড়া হইবে না, আর আমিও কখন তাহাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না—নিমাই ! এ সকল কথা যেন তোমার সত্য হয় ।”

নিমাই অতি মধুর মনমোহন স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—“শচীনন্দন কখন মিথ্যা কথা বলে না মা ; যাহা বলিয়াছি—সবই সত্য হইবে, তজ্জ্ঞ কোন চিন্তা করিও না । আমি সময়ে সময়ে আসিয়া নবদ্বীপের ভক্তবর্গ এবং তোমার সহিত দেখা করিব, সে বিষয়ে মা তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।”

বিষ্ণুপ্রিয়া যদিও মাতা-পুত্রের এই সকল কথা শুনিলেন, তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । মনে করিলেন—আজ রাত্রে স্বামীর পদে ধরিয়া এ কথার সত্যতা জানিয়া লইবেন । তাই তিনি মনের সহিত শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন ; স্বামী ফুল বড় ভালবাসেন বলিয়া আজ মনের সাধে মালা গাঁথিতেছেন ।

একে একে কত ভক্ত আসিতেছে, প্রভুর সহিত কথা কহিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে । সকলেই যেন দ্রিয়মান—মন ভার ভার, প্রাণ যেন কি এক বিষম দুঃখের দাব-দাহে পুড়িয়া থাক্ হইতেছে—তাই কথা কহিতে পারিতেছে না, কেবল নিমাইয়ের মুখের প্রতি

নদের নিমাই :

চাহিয়াই কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। নিমাই সকলকে সাঙ্ঘনা দান
করিয়া বলিতেছেন—“ভয় কি তোমাদের ? তোমরা সকলে কীৰ্ত্তনানন্দে
মাত্ৰি। আমাব প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কব। আমি কখনই তোমাদের
দুঃখিত। থাকিব না।”

—:—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

গৃহত্যাগ ।

বহুদিনেব প্রিয়সঙ্গ ছাড়িতে প্রাণ কেমন কেমন করে, হাজাব উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইলেও মানব দুঃখ-অবসাদে মগ্ন হইয়া থাকে । জগত-জীবের জন্ত নিমাইয়ের চিত্ত আকুল, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া প্রাণ উচাটন হইলেও—এ স্থখেব আবাস, এ প্রিয়সঙ্গ ছাড়িবাব পূর্বে তিনি যেন কিছু দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছেন । ভক্তগণের ছল ছল নয়ন, মাতার শোক-দগ্ধ বদন এবং প্রিয়াব অব্যক্ত দুঃখ-বেদন দেখিয়া, মহাপ্রাণ—উদার প্রকৃতি, পরদুঃখ কাতর নিমাইয়ের কোমল হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইয়া পাড়িয়াছে । তাই আজ সমস্ত দিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া, জননী ও পত্নীব কাছে কাছে ঘুরিতেছেন । যেন জন্মেব শোধ তাঁহাদের স্তম্ভ দান কবিয়া, চিরদুঃখ সাগরে ডুবাইবাব জন্ত—নিমাই আজ ঘর-সংসারে এক মন দিয়াছেন । ভক্তগণ আজ বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন না, যাহাতে প্রভুর মন সংসারে এইরূপ প্রকৃষ্টরূপে আসক্ত হয়—ইহাই তাহাদের ইচ্ছা ।

সন্ধ্যাব পব নিমাই আহাবাদি করিলেন । শচীদেবী বধুমাতাকে আহ্বানাদি করাইয়া, বহুদিনের পর আজ শেষ স্বামী-সম্মিলনে পাঠাইয়া দিয়া—নিজে অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । নিমাই যে ভগবান, তাহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে । ভগবান যে এত দিন তাঁহাকে “মা” বলিয়া ধন্য করিয়াছেন—এই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ।

নদের নিমাই ।

এই ভাগ্য চিরস্থায়ী হইলে কি সুখই হইত ? কিন্তু এ সৌভাগ্য কি বাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে ? বসুদেব-দেবকীর ঘটে নাই—নন্দ-যশোদাও ন পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া, শেষে অজস্র বোদনে ধরাতল ভাসাইয়া, অস্থিম চিন্তায় সে জ্বালা চিরনির্বাণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মা হইয়াও যখন কেহ সুখী হইতে পারেন নাই—তখন আমি কেমন কবিয়া হইব ? পিতামাতাকে দুঃখ দেওয়াই যে তাহার সুখ। আর এই দুঃখ পাইয়া, অনবরত “হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ” বলিয়া কাঁদিলে, অস্থিমে যে তিনি পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া উদ্ধার করেন—আমার ভাগ্যেও কি তাই হইবে। নিমাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার সমস্ত জীবন গেল, কিন্তু দেখিস্ বাপ ! অস্থিমে যেন তোর দেখা পেয়ে, এ জীবনব্যাপী কান্নার অবদান ক’বতে পারি। অন্তর্যামী তুই, তোর চিরদুঃখিনী মাতার এই অনুরোধ পূর্ণ করিস্ বাপ ! শচী-দেবী বিষম চিন্তায় তন্ময় হইয়া শব্যায় পড়িয়া আছেন, কোন প্রকার সংজ্ঞা নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া আহারাতির পর গৃহে প্রবেশ করিয়া, আরাধ্য-পদ কোলে তুলিয়া বসিলেন। প্রিয়মান—মুখে হাসি নাই, চক্ষু বহুদিনের পর সেই প্রাণপ্রিয় বস্তুর দর্শন পাইয়াও সুখবোধ করিতে পারিল না ; শ্রুত জনরব তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া দিল। তিনি সেই দেবারাধ্য পদে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তাঁহার নয়নে জল দেখিয়া নিমাই বলিলেন—“তুমি কাঁদছো, কেন কি হয়েছে ? এতদিনের পর দেখা হ’ল—কোথায় আনন্দ কর্কে, না তুমি কাঁদছো ? তোমার কান্না যে আমি কখন দেখতে পারিনা বিষ্ণুপ্রিয়া !”

নদের নিমাই ।

বিষ্ণুপ্রিয়া শোক সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সাগর
রূপ ধারণ করিয়া যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আহা! স্বামী গৃহত্যাগ
করিবেন—একথা শুনিলে কোন্ পতিব্রতীর চিত্ত অস্থির না হয়?
সতী একবার “না” বলিয়া পদযুগল আরও যতনে বক্ষে ধারণ করিলেন

“না, না হাঁ? না ব’লে যে আরও বেশী কাঁদতে লাগলে?”

“প্রভু! আমি দাসী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।”

“প্রিয়ে! তোমার অপরাধ কিসের? ববং আমিই তোমার কাছে
অনেক অপবোধ করেছি।”

সতী জিহ্বা কণ্ঠন করিয়া বলিলেন—“দাসীর নিকট প্রভুর অপবোধ
হইতে পারে না। আমি বহুজন্মের পুণ্যফলে এই পদ সেবার অধিকার
পেয়েছি; তুমি কি আমার সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ক’রবে?”

“কেন প্রিয়ে! কেন তুমি এ কথা ব’লছো?”

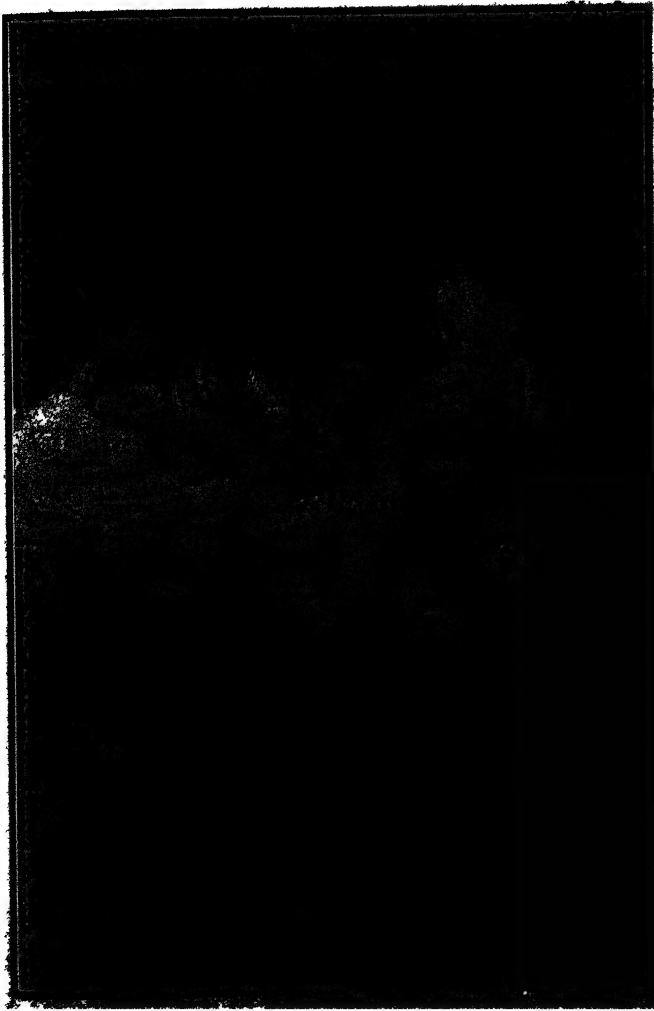
“প্রভু! আমি তোমার দাসীর উপযুক্ত নই, তথাপি দয়া ক’বে
তোমার চরণ সেবার অধিকারী ক’রেছো। তুমি সকলকে সকল অধিকার
দিয়ে স্তুতি ক’রেছ; কেবল আমার প্রতি কি বিরূপ হবে?”

“দেখ প্রিয়ে! আমি আর আমার বশীভূত নহি, যেন দিন দিন কেমন
এক রকম হ’য়ে যাচ্ছি, তাই অগ্ৰমনস্ক ভাব। সতি! তার জগু তুমি
আমায় ক্ষমা কর।”

“প্রভু! আবার ঐ কথা কেন? তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকার
আমার কোথায়? আমি দাসী, চিরদিন ঐ পদ সেবার অভিলষী,
আমার প্রতি সদয় হও।”

“তোমার প্রতি নির্দয় ত আমি কখনই নই। তবে যদি অজানিত

গৃহভাগ ।



উঠ দেবী বিম্বপ্রিয়া উঠ গো স্বরায় ।
প্রাণেব দযিত তব গৃহ ছাড়ি যায় ॥

নদের নিমাই ।

কোন প্রকারে ব্যথা পেয়ে থাক, তার জন্ত কেঁদ না, স্থির হও ।
বিষ্ণুপ্রিয়া । এত অভিমান কেন প্রেয়সি ?”

“হৃদয় সর্বস্ব । তুমি যে আমার সর্বস্ব, মান অভিমান তোমা ছাড়া
আব কার উপব ক’ববো ? সগী জীব নিকট স্বামী শুধু বাহিরেব বস্তু নয়,
অন্তরেব অন্তর্যামী-দেবতারূপে চিব অধিষ্ঠিত । তথাপি প্রাণ চায়—
সকল বাহ্যদৃষ্টিতে অহবহঃ ঐ কপ দেখি, দুই একবার দেখে সাধ
মিটবাব নয় ।”

বিষ্ণুপ্রিয়া যতই স্বামীর গৃহত্যাগের কথা প্রাণে তোলাপাড়া করিতে
গাগিলেন, ততই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, বলি বলি করিয়া
সে হৃদয়-বিদাবক কথা যেন বলিতে সাহস করিলেন না । তিনি পতিপদ
বোলে লইয়া, কাঁদিয়া শয্যাতেল ভাসাইতে লাগিলেন ।

নিমাই অভিমানিণী পত্নীর শোকাবেগ সাস্থনা করিবার ছলে বলিলেন
—“তুমি এখনও কাঁদছো, তবে কি হাসিমুখে কথা কবে না ?”

বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে অশ্রু আব ধরিল না, অবিরল ধারে গণ্ডে গড়াইয়া
পড়িল । তিনি ধরা গলায়, ভবা আওয়াজে বলিলেন—“শুনছি তুমি
নাকি আমাদেব ছেড়ে যাবে ?”

“আমি কখন কাহাকেও ছাড়ি না ; কেহ একান্ত ছাড়িলেও, আমি^১
তাহাব সহিত একেবারে ছাড়াছাড়ি হই না ; গুপ্তভাবে কাছে কাছে
থাকিয়া তাহাকে অনবরত চক্ষে চক্ষে রাখি । তবে তুমি অমন কথা কেন
বলছো বিষ্ণুপ্রিয়া ?”

“আমি অনেকব মুখে শুনে বাপের বাড়ী থেকে দৌড়ে আসছি ;
আমাকে কেন বঞ্চনা ক’রছো প্রভু ? আমি চিরদিন ঐ পদে দাসী হ’য়ে

নদের নিমাই ।

থাকিবার বাসনা ক'রে—আমাব জীবনের যাবতীয় কর্তব্য তোমাতে
বিসর্জন দিয়েছি । এখন তুমি বিকপ হ'লে দাসীব গতি কি হবে নাথ !”

শক্তি চঞ্চল হ'লে দেহ-মন-প্রাণ সচঞ্চল হইয়াই থাকে । নিমাই
প্রণয়িনীকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে রোদন কবিত্তে দেখিয়া বলিলেন—“বিস্মৃপ্রিয়া,
প্রাণেশ্বরী—লক্ষ্মীস্বরূপিণী । সমস্তই কি ভুলিয়া যাইতেছ, মোহবশে এত
আচ্ছন্ন কেন ? আমি যে জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তর তোমার অমুচ্চ
প্রেম-স্বপ্নে আবদ্ধ । তোমার প্রেম-স্বপ্ন শুধিবাব দ্রুত—দাসথতের উন্মূল
দিবার জন্তই ত আজ আমায় এই যুগাবতাব গ্রহণ কবিত্তে হইয়াছে ।
লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া প্রেম-ধন বিতরণ কবতঃ তোমার স্বপ্ন
পরিশোধ করাই ত এ অবতাবের কার্য্য । সে কার্য্য যে আরম্ভ কবিত্তে
হইয়াছে, আর যে বিলম্ব করিত্তে পারি না ?”

সংসার বড় ভীষণ স্থান, এ স্থানের মায়ায় মুগ্ধ হইলে দেবদেবীরও
চৈতন্ত থাকে না ; ব্রহ্মা বিষ্ণুই যখন অচৈতন্য—তখন জীবের কথা
কোন ছার ! বিষ্ণুপ্রিয়া মোহাভিভূতা সামান্য রমণীব মত নিমাইয়ের
নিগুঢ় রহস্ত-তত্ত্ব তলাইয়া না বুঝিয়া বলিলেন—“তুমি সত্য সত্যই যদি
সন্ন্যাসী হও, তাহ'লে আমাদের দশা কি হবে ?”

নিমাই আরও ভাল কবিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন—“প্রেমময়ি !
আমি চিরদিনই ত প্রেমের-সন্ন্যাসী রূপে ভক্তের প্রেমাধীন হ'য়ে, প্রেমের
বোঝা শীঘ্র লয়ে সংসারে যাতায়াত করি । প্রেম বিনা আমি কিছুই
ভালবাসি না, প্রেমই আমার সর্ব্বস্ব । প্রেমই আমার জীবন—প্রেমেই
আমার জাগরণ ; প্রেম পেলে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তে পারি । প্রেম
পেলে, যোগী-গৃহী কি বেলো—আমি চণ্ডালেরও দাসত্ব কর্ত্তে স্বীকৃত হই ।

নদের নিমাই ।

প্রমিষ্টের দেওয়া বিষণ্ণ আমি অমৃত বলে ভক্ষণ কন্তে পারি, এইজন্য সকলে আমাকে হৃদবিস্ফাবী প্রেমের হবি বলে ডাকে। প্রাণেশ্বরী। তুমি ত চিরদিন আমার প্রেম-ডোবে বেঁধে বেঁধেছো, পালাবার উপায় বোধায়? একবার ভাল ক'বে ভেবে দেখ দেখি—কে তুমি, কে আমি।”

তবুও বিষ্ণুপ্রিয়াব মোহ টুটিল না—ভাব-বিপর্যয় হইল না। তবে এবার যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—“প্রভু তুমি, দাসী আমি, বাহা ভাল বুঝ তাহাই কব।” স্তম্ভময় অতিবাহিত হয় দেখিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ হস্ত-বচিত ফুলের মালাগুলি স্বামীব কমণীয় কণ্ঠে ছুলাইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া বহিলেন। যেন কোন অজানা যুগস্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইল, যেন কোনও অপবিনীত বিশ্বাস-বিশ্বাসিতর অগাধ সলিলে নির্মল্লিত মনোময় পবিত্র ভাব তাঁহার মনে উকী মারিতে লাগিল। তিনি যেন কতবার এইরূপ আনন্দ ফুলহাব প্রিয় গলে পরাইয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়াছেন। প্রাণেশ্বরী এই প্রাণের বস্ত্র যেন তাঁহাকে কতবার ফাঁকী দিয়া, এইরূপ নাগব বেশে অন্য নাগরীর মন যোগাইয়াছেন এবং তিনিও মানভরে প্রভূত মানের দায়ে দাসত্ব লিখাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। আজ সেই সকল বিশ্বাস-স্মৃতি স্মৃতিপথে সমারুঢ় হইলে, তিনি বিভোর হইয়া স্বামীব পদতলে লুটাইতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর মোহঘুম ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিমাই বহুক্ষণ প্রিয়ার সেই অতুলনীয়, ত্রি-জগতের তুলনাতীত স্তম্ভর আনন্দ পলকবিহীন-নেত্রে নিরীক্ষণ কবিতো লাগিলেন। তারপর তুলসী চন্দনে সে স্তম্ভব বববপু সাজাঠিয়া, একবার প্রেমের চুষন দান করিয়া

নদের নিমাই-

জন্মের শোধ উঠিয়া বলিলেন—“এ জন্মে যা হবার হ’ল ; প্রেম-ঋণ সব পরিশোধ হ’ল না। জগজ্জীবের দুর্গতি দেখে, তোমায় ছেড়ে যেতে হ’লো, কিন্তু মনে জেনো তোমাতে আমাতে অভেদ ; বিচ্ছেদ কখন হবে না—হইবারও নয়।” ইহাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিমাই হৃদয়ের বলে প্রিয়াব প্রিয়-বন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহিবে আসিলেন। বিশ্বপ্রেমিক সিদ্ধার্থ যেমন সন্তপ্রসূতা গোপাব প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিপুল বাঈজেশ্বরের ভোগ-লালসায় জলাঞ্জলি দিয়া, পিতামাতাব স্নেহপাশ ছেদন করিয়া—জীবের জরামৃত্যু-ভয় নাশের জন্ত, জীবকে অহিংসা পরমধর্ম শিক্ষা দিয়া মুক্তি-পথের পথিক করিবার জন্ত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—আজ প্রেমাবতার নিমাই—ভক্তিতে গদগদচিত্ত নদের নিমাই—শচী-জগন্নাথের আনন্দবর্দ্ধন, সতী-শিবোমণি বিষ্ণুপ্রিয়াব প্রাণধন গৌরাক্ষ হৃন্দব, নবদ্বীপের অকলঙ্ক জ্যোতিষ্ক ভাস্কর বিশ্বস্তব—প্রিয়াব প্রেমালিঙ্গন ছিন্ন করিয়া, মাতার অমিয়মধুব স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয় স্বজনব বিবহদীর্ণ হৃদয়ে শোকশেল হানিয়া—প্রেমময় হবিনাম বিতরণে জীবের মুক্তিপথ প্রশস্ত করিবার জন্ত, অনন্ত পৃথিবীর অনন্ত আকাশতলে প্রেমমুগ্ধ হইয়া, ভিখারীর বেশে লোকেব দ্বাবে দ্বাবে অধম-তাবণ হবিনাম বিলাইবাব জন্ত গৃহত্যাগ করিলেন। এত বাধা, এত বিঘ্ন, এত হাহতাশ—তাঁহাকে বাঁধিয়া বাঁধিবার জন্ত এত চেষ্টা—কছুই নিমাইকে আটকাইয়া রাখিতে পাবিল না। যথার্থ ত্যাগ মাল্লকে এইরূপই দিশাহারা—পাগল পারা করিয়া তুলে। বিশ্বহিতে যাহার হৃদয় একবার মজিয়া উঠে, অকাতবে ভোগ-ত্যাগ তাঁহার এইরূপ বিশ্বয়কর, চমকপ্রদই হইয়া থাকে !

নদের নিমাই ।

বিষ্ণুপ্রিয়া জানিলেন না—বুঝিলেন না যে, চকিতের মধ্যে তাঁহার বরুণ ভাগ্য-বিপর্যয় হইয়া গেল এবং কি ভীষণ অশনি তাঁহার শীরে নিপতিত হইল। তিনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—তাহার মত সৌভাগ্যবতী জগতে আর কে আছে। কে এমন জগৎ-দুঃখ স্বামীর পদে আত্মবিক্রয় করিতে পারিয়াছে ?

হৃদয়ের মধ্যে স্বামীর সেই দুর্লভরূপ দেখিতে দেখিতে যেন হঠাৎ বিরক্ত হইয়া গেল, কে যেন সেই সুন্দর চাঁচর চিকু-মণ্ডিত মস্তক নুগুন করিয়া দিল। বিষ্ণুপ্রিয়া কাদিয়া জাগিয়া উঠিলেন, হাতড়াইয়া দাঁখলেন—প্রাণপতি পার্শ্বে নাই। আলো ক্ষীণ হইয়াছিল, উজ্জল কবিতা এদিক ওদিক দেখিলেন, তারপব প্রাণফটা হুঃখে বলিলেন—“কাল নিদে ! কেন তুমি পাপিনার চক্ষে আসিয়া, স্বামীর অদর্শন যাতনা ভাগ কবাইলে ? এই অদর্শনই কি চির-যজ্ঞদায়ক হইয়া অভাগিনীকে দগ্ধ কবিতা মারিবে ?” সতী ভীত-চকিত নেত্রে, আলুথালু বেশে শাস্ত্রভীত গৃহদ্বারে গিয়া দ্বারে আঘাত করতঃ বলিলেন—“মা ! মা ! উঃ, সর্বনাশ হইয়াছে।”

শচীদেবীর নিদ্রা নাই, কখন অদৃষ্ট ভাঙিবে—পৃথিবী অন্ধকার হইবে, তাহাই ভাবিতে ছিলেন ; এক্ষণে বধুমাতার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া দখিলেন—বজ্রপাত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—“নিমাই ! নিমাই !” প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রাণের ডাকে ডাক ছাড়িয়া ডাকিলেন—“নিমাই ! ও নিমাই !” কিন্তু সকলই বৃথা হইল, কেবল প্রতিধ্বনি সাড়া দিল—“নাই—নাই—নাই !”

শচীদেবীর প্রাণপণ ডাকে প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাগিয়া

নদের নিমাই ।

উঠিল । তাহারাও জনরব শুনিয়া মর্ম্মদুঃখপূরিত প্রাণে কেবল ভগবানেব
নিকট নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা প্রদানের প্রার্থনা কবিতৈছিল ,
তাহারাও উৎকর্ণ হইয়া শুইয়াছিল—একণ্ঠে নিমাই কখন কি কবে ।
শচীদেবীর মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিয়া সকলে বুঝিল—নিমাই সকলকে
কঁাদাইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে । বিশাল নবদ্বীপ নগরীর মধ্যে হাহাকার
উঠিল—আনন্দময় নদীয়াব প্রতি গৃহ ক্রন্দন-রোলে ভবিয়া গেল ।
নিমাইয়ের বিবহে সেদিন কোন গৃহে কেহ প্রাণ ভরিয়া আহার কবিতৈ
পাবিল না, কাহাবও চক্ষে নিদ্রা আসিল না । শোকের দারুণ ঝঙ্কাবাতৈ
নবদ্বীপ অন্ধকারময় হইল ; গ্রামবাসীরা সমস্তদিন ইতস্ততঃ নিমাইয়েব
অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে নৈরাশ্রের অন্ধকাবৈ ডুবিয়া
পড়িল ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

সন্ন্যাস গ্রহণ ।

জননীর ক্রন্দন—প্রিয়বাদিনী পত্নীৰ বিরহদৌৰ্ণ দীৰ্ঘনিশ্বাস—
বন্ধুবর্গের প্রবোধ বচন—কিছুতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নিমাইকে নিরস্ত করিতে
পাবিল না। তিনি সেইদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ
কাটোয়ার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিমাই ঠিক পাগল—প্রেম-
বিহ্বল ভাবে চলিয়াছেন; প্রেম পবিপূর্ণ তনু, নয়নে প্রেমনীর, অঙ্গ
প্রেম-পুলকিত, মুখে মধুময় প্রেম-হাসি। আজ নিমাইয়ের সেই রূপ যে
দেখিল—সেই দ্ব্য হইল। নিমাই ক্রমশঃ কেশব ভারতীর বাটীর
সম্মুখীন হইলেন। ভারতী মহাশয় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, মায়া-মোহের
অতীত; তথাপি আজ নিমাইয়ের রূপ দেখিয়া—প্রেমপূরিত এই লাবণ্য
দেখিয়া চমকিত হইলেন! ইতিপূর্বে তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন,
কিন্তু আজিকার এ ভাব দেখিয়া ভারতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল।
তিনি শশব্যস্তে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন—“নিমাই! এ কি
কবিয়াছ? এ নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া এতদূর আসিয়াছ, তোমার
জননীর এবং পত্নীর দশা কি হইবে?”

নিমাই বলিলেন—“সকলের কর্তা ভগবান, যাহা হইবে—তাহা
হইতে তিনিই তাহাদের রক্ষা করিবেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া
এই ভবার্ণব নিস্তারের উপায় আমাকে বলিয়া দিন। জীবকে নিস্তার

নদের নিমাই ।

কবিতা, কিকপে নিজে নিস্তাব হইব—তাহাবই পদ্ম প্রদর্শন ককন ।
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কবিতা, যাহতে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আমাব মতি হয়—
সেহরূপ দীক্ষা দান কবিতা আমায় বন্য ককন ।”

কেশব বলিলেন—“বৎস । আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী । সন্ন্যাসী হইয়া
গৃহীকে দীক্ষাদান কবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ । তুমি অত্ৰ কাহাবও নিকট
দীক্ষা গ্রহণ কব ।”

নিমাই বলিলেন—“প্রভু । শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে আমি উদাসী হব—আজ
হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিব, আপনি আমাকে দীক্ষা দান ককন ।”

“বৎস । এ বড় কঠিন আশ্রম, সংসাবেব যাবতীয মাযাপাশ ছিন্ন
কবিতা—সকল প্রকার ভেদজ্ঞান বিরহিত হইয়া, সেবা ব্রত বাবণ কবতঃ
এ জীবন কাটাইতে পাবিলে—তবে সন্ন্যাসী হওয়া যায় । সন্ন্যাস-আশ্রম
সকল আশ্রমেব শ্রেষ্ঠ এব° ত্যাগই এই আশ্রমেব প্রধান অবলম্বন ।
বৎস । তুমি কি সেকপ ত্যাগ স্বীকাব কবিতো পারিবে ?”

“প্রভু । যেরূপ বলিবেন—আমি সেইকপই কবিব । আজীবন ত্যাগ-
মন্ত্ৰেই দীক্ষিত হইয়াছি, সংসারী হইয়াও সংসার-বিরাগ আমাকে এতদূব
অগ্রসব কবিতাছে, এক্ষণে আব অগ্রসব হইতে পাবিতেছি না । দীক্ষা
বিনা জগতে যে কোন কায সিদ্ধ হয় না প্রভু । এক্ষণে আপনি কৃপা না
কবিলে—বৃদ্ধি আমাব এতদিনেব মহাব্রত ভঙ্গ হয় ।”

“বৎস । পাছে তোমাব জননী ও পত্নীর অন্তবে দাকণ বেদনা হয়,
একমাত্র পুল্লশোকে পাছে বৃদ্ধা শচীদেবী পাগলিনী হইয়া পড়েন—এই
জন্ত ভয় হয় । কি কবিতো কি কবিতা, শেষে কি সতী-বোধানলে
আমার সৰ্ব্বস্ব নষ্ট হইবে ? সে বোষ যে বড় ভীষণ ।

নদের নিমাই :

“প্রভু ! চিন্তা করিবেন না, আমি তাঁহাদের সকলকে একরূপ বুঝাইবা গৃহত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে দীক্ষা দান করিয়া আমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন।”

“নিমাই ! তোমাব কোশল বুঝিয়াছি। আমাব সাধ্য কি যে তোমায় শিষ্য করি, আমি তোমাব গুরু হইব—এমন সাধ্য আমাব কাথ্য ? জগদগুরু তুমি, তবে লোকশিক্ষা দিবাব জ্ঞাত্বে এবং এ দীনের শোশোভাগ্য বাডাবাব জ্ঞাত্বে তোমাব এই চলনা। আজ আমি বৃত্ত ! জগতের লোক দেখুক—দীন কেশব ভাবতী আজ জগদগুরুব গুরু হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিতেছে।”

নিমাইয়ের আগ্রহাতিশয়ে কেশব ভাবতী অস্তরোপ এড়াহতে না পারিয়া দীক্ষা দানের আয়োজন করিলেন। একজন গোবর্দ্ধনকে মানাইয়া নিমাইয়ের সেই চাঁচব চিকুব মণ্ডিত মস্তক মুগুন করিয়া দেওয়া হইল। তাবপব সন্ন্যাসীব বেশ ধারণ করাইয়া—শ্রীঅঙ্গে অরুণ বসন পরিধান করাইয়া—কণ্ঠে তুলসীর মালা পবাইয়া যোগী সাজাইলেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ অপকৃপ অঙ্গে কোষেয় বসন পরিধান করিয়া, গোবর্দ্ধনদেব দেব-প্রভায় উদ্ভাসিত হইলেন। এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া ভারতী মহাশয় মুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন।

নিমাইয়ের বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ, যৌবন-তেজে সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ। তাহার উপর এই তেজোময়—এই ধর্মময় সাজসজ্জায় গোবর্দ্ধন অঙ্গে স্বর্গের স্তম্ভমা খেলা করিতে লাগিল। সেদিন ১৫০২ খ্রষ্টাব্দের উত্তরাষাঢ় সংক্রান্তিবে শুভবাসর সমাগত, কেশব ভাবতী এই মহামহেন্দ্রক্ষেণে অতি সন্তোষচিত্তে শ্রীগোবর্দ্ধনদেবকে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ

নদের নিমাই।

করাইলেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া বন্য হইলেন।
সিদ্ধার্থ যেমন সন্ন্যাস গ্রহণেব পর “বৃদ্ধনাম” গ্রহণ কবিয়া, জ্ঞানের
প্রভাজাল মণ্ডিত হইয়া জগৎ উদ্ভাবিত কবিয়াছিলেন, আজ দীক্ষা গ্রহণের
পর, কেশব ভারতীও নিমাইকে “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য” নাম প্রদান কবিয়া,
তাঁহার সাংসারিক যাবতীয় মোহপাশ ছেদন করিলেন।

মহাপ্রভু এইবার হরিনামে পাগল হইয়া, চারিদিকে ঘুরিতে
লাগিলেন। লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবিয়া কেবল বলিতে
লাগিলেন—“কলিয জীব। এস, ঝাগ-ঘজ্জ, বার-ব্রত কিছুই পালন
কবিতে হইবে না, প্রাণ ভরিয়া কেবল “হরিনাম” উচ্চারণ কব,
তাহা হইলে আর কোন পাতক থাকিবে না, তোমরা অবহেলায়
হাসিতে হাসিতে ভবেব এই দুস্তর সাগর পাব হইয়া, স্বর্গবাজ্যে
উপস্থিত হইতে পারিবে। জীব। ভয় নাই, ভব-ভয়হারীর এই মহামন্ত্র
গ্রহণ কর—প্রাণ ভরিয়া এই নামসুধা একবার পান কর, তোমাদের
ত্রিতাপ-জালা দূর হইবে, ভবের কোনও ভাবনা থাকিবে না।
এস পাণী—এস তাপী—এস পণ্ডিত—এস অধম জীব। প্রাণভরে বল
হরি হরিবোল।”

জগতের সুবিখ্যাত অষ্টমীয় পণ্ডিত “নদের নিমাই” আজ প্রেমের
পাগল হইয়া, জীবের দুঃখ দুঃব করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে
লাগিলেন। প্রেমাত্ম-জলে ভাসিয়া আচণ্ডালকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া
বলিতে লাগিলেন—“কে আছ ভাই পাণী-তাপী—এস, আমাকে ধন্য
কব, বদনভাবে হরি হরি বল—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। দিন ব’য়ে যাহ্ন—
নাম-সুধারস পান করিয়া জীবন সার্থক কর।”

নদের নিমাই :

যে শ্রীচৈতন্যেব্, ঐ প্রেমোন্মাদ ভাব দেখিল—সেই বিহ্বল প্রাণে
তাহার চরণে পড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব
অবতাব রূপে তাঁহাদের কৃপা করিলেন। সকলেই মহাপ্রভুব পদস্পর্শে
আময়-পবিত্র, স্বধার আধার হরিনাম বলে উন্মাদ হইয়া, তাঁহার অঙ্গসংগ
কবিল লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুনবাগমন ।

দেশ মাতিয়া উঠিল, ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভুব হবি নাম প্রচাবে দেশে ধম্মেব বান ডাকিল । এ নাম গ্রহণে জাতি বিচাব নাই—পণ্ডিত মূর্থ নাই—অধিকারী-অনাধিকারী নাই—ক্ষমবান-অক্ষম নাই । যে যেকপ অবস্থার লোক এবং যতই পাতকী হউক না কেন, এ নাম গ্রহণে নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে । ত্রীচৈতন্য ডাক দিয়া বলিলেন—“কাহাবও চিন্তা কবিবার কিছু নাই, সকলে আইস, হবি নাম কব । একবাব হরিনাম করিলে জীবের যত পাপ হরণ হয়—জীবন ভবিয়া জীব তত পাপ কবিতে সক্ষম হয় না । কলিযুগে আর বৃথা সময় নষ্ট কবিও না, নাম-সাগরে ঝাঁপ দাও । সালক্য, সায়ুজ্য, সাকপ্য, নিকীর্ণ—যে যেরূপ মুক্তির অভিলাষী হও, এই সুধামাখা নামে—প্রেমময় ত্রীহবিনাম কীন্তনে, তাহাকে নেইকপ অভাষ্ট ফল প্রদান কবিবে । হবি হইতেও হবিনামেব মাহাত্ম্য বেশী ।”

মহাপ্রভু ত্রীচৈতন্যদেব এইরূপে পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গ্রাম, নগর, হরিনাম বসে ভাসাইয়া আর একবাব স্বদেশে আগমন কবিলেন । যেদিন নিজ ভক্তজনকে ফাঁকি দিয়া, গভীর রজনীতে একাকী গৃহত্যাগ করিলেন—কাহাকেও না জানাইয়া প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন, তখন ভক্তগণ প্রভু-বিবাহে একান্ত কাতর হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি

নদের নিমাই !

কবিতাে নাগল। প্রাণ যাক্ আব থাক, তথাপি প্রভুকে অব্বেষণ করিয়া বাহিব করিব, শচীমাতা ও প্রভু-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াব শোকাপনোদন করিব।

শচীদেবী সমস্ত জানেন—সমস্ত দৈববাণী তিনি শুনিয়াছিলেন। তথাপি সেইদিন হইতে গৃহবাস ত্যাগ কবিয়া কেবল “হা নিমাই—শা ব’স” বালয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে নাগিলেন, ভক্তগণ পথে বহিয়া নানা প্রকাে আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্নজন ত্যাগ কবিয়াছেন, আব বক্ষে কবাঘাত কবিয়া কেবলই বলিতেছেন—“সেদিনকাব কাল-নিদ্রাই আমাব কাল হইল। হতভাগিনী আমি, যদি ঘুমাউয়া না পড়িতাম—তাহা হইলে প্রভু কি দাসীবে গমন কবিয়া ফাঁকি দিয়া যাইতেন পাবিতেন? যদিও যাইতেন—তাহা হইলে আমি কি তাঁব সঙ্গ ত্যাগ কবিতাম? হায়, এখন আমি বি কবি, সে আবাধ্য-মূর্ত্তি না দেখিয়া যে আমার জীবন ভাব বেধ হইতেছে, কেমন কবিয়া এজীবন ধারণ কবিব?” সতী কখন ধূণ্যবলুণ্ঠিতা হইতেছেন, কখনও বক্ষে কবাঘাত কবিয়া বলিতেছেন—“হা প্রভু। হা দয়িত। দাসী কি দোষে দোষী হইল—পদসেবায় বঞ্চিত হইল কেন? তুমি যে বলিতে—বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকে ছাড়িয়া আমি একতিলও থাকিতে পারি না। প্রাণেশ্বর। এই কি তার নিদর্শন?”

শোকের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি এই বিবশা-রমণীষ্যকে প্রতিবেশী সকলে সাহস না দিতেছেন, আশা দিয়া বলিতেছেন—“আমরা নিমাইকে পুনরায় কিবাইয়া আনিব।” কিন্তু প্রাণে প্রাণে সকলেই হতাশ হইয়া, মনে মনে বলিতেছে—“নিমাই কি সেই নিমাই, চোর স্বভাব যে তার চিরকাল।”

নদের নিমাই ।

ভক্তের নিকট ভগবান কতদিন গোপন থাকিতে পাবেন ? প্রাণের ডাক ছাড়িয়া কাদিলে—আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে—তিনি ভক্তকে দেখা না দিয়া থাকিতে পাবেন না । যেদিন প্রভু গৃহত্যাগী হইলেন, সেইদিনই গদাধর, চন্দ্রশেখর, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণেব আবেগে জীবনপণ করিয়া চাবিদিকে ছুটিল । নিত্যানন্দ প্রভুব অপকট ভক্ত, চৈতন্য অবতাবে তাঁহার মত ভক্ত কেহ ছিল না, প্রভু বলিয়াছিলেন—নিত্যানন্দ । তুমি ও আমি অভেদ আত্মা । নিত্যানন্দ কাদিতে কাদিতে হতস্তম্ভঃ ছুটাছুটি কবিয়া, শেষে কাটোয়ায় গমন করিলেন এবং প্রভুব সম্মাস গ্রহণের পব সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে শাস্তিপুবে পরমভক্ত অদ্বৈত্যেব ভবনে আনয়ন করিলেন । ভক্তগণ বহুদিনের পর আবাব তাহাদেব আবাদ্য দেবকে দেখিয়া, ভক্তিগদগদ চিত্তে প্রেমপুলকে পুলকিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল ।

শ্রীচৈতন্য আজ প্রকট হইলেন । সকলেই বুঝিল—ইনি আব কেহ নহেন, জগদারাধ্য ভগবান । এতদিন দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে সখ্যতা কবতঃ কেবল ভক্তবৎসল নামের মথ্যাদা বাড়াইতেছেন । সম্মাসীর স্ব-ভবনে আসা এবং প্রণয়িনী দর্শন করা নিষিদ্ধ ; তাই প্রভু চৈতন্যদেব অদ্বৈতাবাসে অবস্থান কবিয়া, জননীৰ দর্শন জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । জনক-জননীৰ দর্শন দেব-দর্শন, কোন আশ্রমেই বাধা নাই, নিত্যানন্দ আসিয়া শচীদেবীকে সংবাদ দিলেন । শচীদেবী আনন্দে বিহ্বল হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়ায় যাওয়া নিষেধ, কারণ শ্রী-দর্শন সম্মাস আশ্রম বিরুদ্ধ—তখনই একটু

নদের নিমাই ।

ম্লিয়মানা হইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—“মা আমাব ! এমন ভাগ্যও তুই কবে এসেছিলি ?”

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন তন্ময়, সে বিষাদ ভাব তাঁহাব তিবোহিত হইয়াছে । তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে সেই প্রিয়মূর্ত্তি দর্শন কবিয়া, প্রাণে সাস্বনা লাভ কবিতেছেন । প্রভু তাঁর জীব-দুঃখ দূরীকরণেব জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান রূপে সকলের নিকট পূজিত হইতেছেন—তিনি সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । পতিপ্রাণা সধবিন্দিনী সতী নিজ দয়িতের এইরূপ উন্নতি—এরূপ সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দ বিভোর, এখন আর তাঁহাব অস্তব সেরূপ শোক দহনে দহিয়া থাক হইতেছে না । তিনি অকাতরে শাস্ত্রভীকে বলিলেন—“মা ! আমি চিবকাল কাঁদিতে আসিয়াছি—কাঁদিয়াই জীবন কাটাইব । তুমি যাও, আমাব জন্য চিন্তা কবিও না । কি জানি—পাগল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তিনি গোমাকেও আবার দেখা না দেন । মা, প্রভু আমায় কাঁদাইবার জন্যই ঠাঁকি দিয়ে চলে গেছেন, আমি আজীবন কাঁদিতেই থাকিব ; তবে আমার জন্ত তুমি এ শুভ মূর্ত্তি কেন নষ্ট কর মা ! তুমি এখনি যাও ।”

“মা ! বিধাতা তোমার কপালে এত কষ্টও লিখেছেন—” বলিয়া বুড়ি বাদিতে কাঁদিতে নিতাইয়ের সহিত পুত্র দর্শনে গমন কবিলেন ।

বিষ্ণুপ্রিয়া কপালে কবাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন—“হায় ! যদি আমি পত্নী না হইয়া প্রভুর সেবিকা-দাসী হইতাম, তাহা হইলে তিনি কখনই চরণে ঠেলিতে পারিতেন না ।”

বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার সেই বিষাদ-জড়িত মূর্ত্তি দেখিলে, বাস্তবিকই প্রাণ ফাটিয়া যায় । একজন সঙ্গিনী তাঁহার দুঃখ দেখিতে না পারিয়া

নদের নিমাই ।

বলিল—“প্রভু যখন এত কাছে আসিয়াছেন, তখন আমি কিছুতেই ছাড়িব না; একবাব তাঁহাব সহিত দেখা করিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াব একটা বিহিত করিবই করিব। আহা! অভাগিনী আজীবন কেমন করিয়া এই অসহ বিরহ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?” এই বলিয়া সেও শাস্তিপূৰ্ব্বাভিমুখে রওনা হইল। সকলে কত নিষেধ কবিল—কিন্তু সে কাহাবও কথা শুনিল না।

অদ্বৈত প্রভূতি ভক্তগণ বলিতেছেন—“প্রভু! পৃথিবীকে প্রেমময় কবিবাব জগ, আ-চণ্ডালে হরিভক্ত কবিবাব জন্ম তোমার জন্ম। কিন্তু প্রভু! এ কি ব’রলে? নিবস জ্ঞান-পথের পথিক হইয়া, কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ কবিলে, তোমার প্রেমময় নামে যে কলঙ্ক হবে ঠাকুর।”

শ্রীচৈতন্য সকলকে সাস্তুনা দিয়া বলিতেছেন—“ভক্তগণ! কোন চিন্তা করিও না। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছি বলিয়া, ক্রম-প্রেম বিতরণে অবহেলা করিব না, আর এই সন্ন্যাস-ব্রতই আমাকে সে পন্থা অনুসরণে বিশেষ সাহায্য কবিবে। এস—আজ সবলে প্রাণ ভরিয়া হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন করি।” উন্নত নিমাই প্রেমভাবে অতি দীনহীন বেশে সংকীৰ্ত্তন আৰম্ভ কবিলেন। তাঁহাব ঐ ডোর-কৌপিন পরা ভিক্ষুকের বেশ দেখিয়া, সকলে আকুল প্রাণে গাহিলেন :—

“কাব ভাবে নদে এসে, কান্দাল বেশে, হরি হ’য়ে ব’লছ হবি।

ওবে ব্রজের মাখন চোব, তুমি কাব ভাবে প’বেছ কৌপিন-ডোর ॥”

শ্রীচৈতন্য যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ও শ্রীকৃষ্ণের অবতাব, এখনকার এই ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। তিনি যে

নদের নিমাই ।

১০৭ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাব প্রেম-ঋণ শুধিবার জন্ত—তাঁহাব নিকট দাসখতের
উল্লস দিবাব জন্তই বে আজ গৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন,
•নি যে সখীভাবে সাধনা করিয়া শ্রীবাধার প্রেম-ঋণ পরিশোধ করিতে
কৃষ্ণদাস হইয়া, এত দীনহীন বেশে লোকেব দুয়াবে দুয়ারে যাইয়া
শ্রীরাধাব প্রাণেব বন হরিনাম বিলাইতেছেন—ইহাতে আব কেহ সন্দেহ
নবিত্তে পাবিল না। পবমাপ্রকৃতি, শ্রীশক্তি রাধামন্ত্রে শক্তিমন্ত হইয়া
শ্রীচৈতন্য যে ভূ-ভাব হবণ করিতে আসিয়াছেন—তাঁহার কার্য্যাকারণ
নেথিয়া সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই। যে সকল আসক্তি মাক্ষুষ হইয়া
কখন ছাড়িতে পাবা যায় না, শ্রীচৈতন্য জীবাব মঙ্গলার্থে তৎসমস্তই
ঐক্যভাবে পরিত্যাগ করিয়া সম্যাস গ্রহণ করিলেন। দেবভাবে
ভাবত—দেবতাব অবতাব ভিন্ন একরূপ ত্যাগ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

শচীমা ভক্তগণেব সহিত অদ্বৈত-ভবনে আসিয়া দেখিলেন—নিমাই
উন্নত হইয়াছে, ঠিক ভিক্ষকেব মত বেশ ধারণ করিয়া হরিনাম করিবার
জন্ত সকলেব পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে। সকলকেই বলিতেছে—
‘তাই সকল! কৃষ্ণপ্রেমে আমি যোগী সাজিয়াছি, তোমরা আমার প্রতি
কৃপা কবিয়া কৃষ্ণ-ভক্ত হও—প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কর।’ শ্রীচৈতন্যের
কথায় আর কেহ দ্বিষ্ণু করিতে পারিতেছে না, সকলেই সমস্তে
“হবি হরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিতেছে।

প্রাণেরকুমার—সোণার বরণ গৌরাঙ্গ, আজ ডোর-কোপিন পরিয়া
দণ্ডকমণ্ডলু ধরিয়া ভিখারী হইয়াছে দেখিয়া, শচীমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন।
১০৮ হইয়া সম্তানেব একরূপ ভাব কি কেহ দেখিতে পারে? শ্রীচৈতন্য
জননীকে দেখিয়া শশব্যস্তে তাঁহার চরণে পড়িয়া কমা ভিক্ষা করতঃ

নদের নিমাই ।

বলিলেন—“দেবি আমার, সাধনা আমার, সিদ্ধি আমার, পুণ্যবতী মা আমার—তোমারই রূপায় আমি জগতেব হিতে ব্রতী হইয়াছি । সেবক না হইলে সাধক হওয়া যায় না, আর্ন্তেব সেবা, জীবে দয়া এবং তৃণ হইতেও হীন স্বভাবই বৈষ্ণবের লক্ষণ । মা । আশীর্বাদ ককন, ধেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয় ।”

শচীদেবী কাদিতে কাদিতে প্রাণপুত্রকে বুকে ধরিয়া বলিলেন—“বাবা । শ্রীকৃষ্ণ তোব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ককন । তুই যে সেই কৃষ্ণ—এ কথা কত লোকে এখন ঘোষণা করে । কিন্তু যে যাই বলুক, আমি কিন্তু দেখি—তুইত আমার সেই হৃদয়ের গোপাল নিমাই ভিন্ন আর কেহ ন’সু ।”

জননীৰ কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন—“মা, আমি তোমার অকৃতি সন্তান, আমার দ্বারা তুমি জীবনে কোন সুখ পেলে না ব’লে দুঃখিতা হইও না, তুমি দুঃখিতা হ’লে আমাব সব ব্রত পণ্ড হবে । সন্তানের পক্ষে জনক-জননী সকল আরাধ্য-দেবতা অপেক্ষাও বড় । তাই বলি মা, কু-পুত্র অনেক হয়—কু-মাতা কখন হয় না, মাতা কখনও সন্তানের দোষ দেখেন না । মা । যদিও আমি সম্যাস গ্রহণ কবিয়াছি, তথাপি বাড়ী ছাড়া আমাকে তুমি যেখানে থাকিতে অনুমতি করিবে আমি সেইখানে থাকিব, তবে সম্যাসী-জীবনে জীব মুখ দর্শন করিতে আমায় অন্নরোধ করিও না । এখন বল, কোন্ স্থানে থাকা তোমার অভিপ্রেত ? আমি কিন্তু বৃন্দাবনবাসী হব বলে ইচ্ছা ক’রেছি ।”

শচীদেবী বলিলেন—“না বাবা, আমি তোমায় বৃন্দাবনবাসী হ’তে দিব না, তাহ’লে তুমি আর কখন দেশে আসবে না, সেইখানেই উন্নত হ’য়ে প’ড়বে ।”

নদের নিমাই ।

ভক্তগণও প্রভু বৃন্দাবনবাসের কথা শুনিয়া হায় হায় কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাহারও ইচ্ছা নহে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনবাসী হয়েন ; তবে একবার তথায় যাইতে পারেন, কিন্তু সেখানে বাস করা কাহারও ইচ্ছা নহে। শ্রীচৈতন্য তাহাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবেন না, তাই ভক্তগণেব মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—“আপনাবা অমুমতি বরুন, আমি কোন্ স্থানে অবস্থান করিব ?”

সুতরে শচীদেবী বলিলেন—“আমার ইচ্ছা তুমি পুরুষোত্তম যাত্রা কর, সেখানেও ত ভগবান আছেন ? নীলাচলে থাকিলে আমি সময়ে সময়ে তোমাব সংবাদ পাব।”

ভক্তগণ ইহাতে দ্বিকাক্তি কবিলেন না। নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া বলিলেন—“কে কোথায় পতিত, ভীত, বিপদগ্ৰস্ত আছ—এস সকলে, আজ প্রভু তোমাদের উদ্ধাবকর্তারূপে আসিয়াছেন ! এমন সুদিন আর হইবে না, দয়াল হরি আজ নিজে হরিনাম বিলাইতে—পাপীকে উদ্ধার বরিতে, সকলেব দ্বারস্থ হইয়াছেন। যদি ভবাবর্ণবে উদ্ধার হইতে চাও, যদি পাপতাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা কর—এস, দীনেব সখা প্রভু আজ তোমাদের আহ্বান করিতেছেন।”

হরিদাস আসিয়া বলিলেন—“প্রভু ! আমি যবন—তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই আমি ভবাবর্ণবে ডুবিয়াছি—সমাজ হারাইয়াছি। তুমি ভিন্ন আব আমার কেহ নাই, এ দীনহীনের গতি কি হবে প্রভু ?”

শ্রীচৈতন্যদেব আকুল প্রাণে বলিলেন—“ভক্তপ্রধান হরিদাস ! আমি সেখানে—তুমিও সেইখানে ; তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারি না। আমার ইচ্ছা, তুমিও রূপা করিয়া আমার সঙ্গে চল।”

নদের নিমাই ।

হরিদাস যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গী হইলেন । প্রভু জননীর অন্তমতি লইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নীলাচলে গমন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । এমন সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন—“প্রভু ! আপনি দীনের ঠাকুর, সকলের সন্তাপ হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে আপনার জনের দুর্গতির একশেষ হইতেছে । তাঁহার প্রতি রূপা না করিলে আপনার অকলঙ্ক নামে যে কলঙ্ক হইবে, দাসীর প্রতি কি প্রসন্ন হইবেন না ?”

শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন—“আমিও তাঁহার মত চিরদুঃখী, তাঁহার দুঃখ ও আমার দুঃখ এ জীবনের সাথী । একরূপ অবস্থায় আর অন্য উপায় নাই, তবে আমার এই পাছুকা লইয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন কর ।”

সঙ্গিনী প্রভুর পাছুকা লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রদান করিল । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবতার পাছুকা মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহার পূজা করতঃ জীবনের শেষ দিনগুলি একরূপ মনের আনন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলাচলে প্রভু।

পুরুষোত্তম তীর্থ নীলগিরির অন্তরবর্তী বলিয়া ইহাকে নীলাচল নামে অভিহিত করা হয়। প্রভু জননীর অন্তর্মতে লইয়া সান্নিধ্যপাশ সজে নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বড় আশা—প্রভু কলির দেবতা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দেহ ভক্তিভাবে পুলকিত হইতে লাগিল, প্রেমপুলকে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কতকক্ষণে পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবেন, তাহার জন্য বিষম আগ্রহে ছুটিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না, প্রভু এমনি ত্বরিত গমনে চলিয়াছেন। প্রাণে আগ্রহ যখন বাড়ে, একটা অপূর্ণ সামগ্রী দেখিবার জন্য মনের যখন চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়—তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, যেমন করিয়া এবং যেদিক দিয়া হউক ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই হইল।

বহু পরিশ্রমের পর সকলে পুরুষোত্তমের নিকট শ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভবানীপতির লিঙ্গমূর্তি দর্শন করিয়া ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন। পূর্বে ভুবনেশ্বরবাসী সকলেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ণ প্রেমময়-মূর্তির দর্শন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ পাণ্ডাবর্গ সাক্ষাৎ যুগাবতার প্রভুর মূর্তি সন্দর্শন করতঃ তাঁহার পদধূলি

নদের নিমাই ।

গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ; সকলে সেদিন প্রভুকে তথায় অবস্থান করিতে বলিলেন । দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তবৃন্দের কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না ; সাক্ষোপাঙ্গ সহ সেদিন শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবেব প্রসাদ লাভ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন ।

পরদিন প্রভু সহচরগণ সমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । জগন্নাথ দেবেব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে তাঁহার আগ্রহ এত বাড়িয়াছিল যে, তিনি এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন । যথা সময়ে ভগবান চৈতন্যদেব শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অল্পবাগ-আবেগে অধৈর্য্য হইলেন এবং ঐ মূর্ত্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করিবার জন্ত কয়েক পদ অগ্রসব হইয়া, ভাবাবেশে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তাঁহার ধর্ম্মবজ্জগণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য হবিধ্বনি করিতে লাগিলেন । এই সময়ে পুর্বীরাজ প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্কভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি পূর্বে যখন চৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন, তখন ইনি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর আজ একি ! এ যে ভক্তিভরা প্রেমমূর্ত্তি ! মরি মরি, এমন সোণার অঙ্কে ভিখারীর বেশ কে পরাইল রে ! হায় হায় ! শচীদেবীর কি ছুরদণ্ড— এমন সোণার চাঁদ ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছে ? তিনি শশব্যস্তে কাছে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য সম্পাদন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । সকলের গগনভেদী হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে ক্রমে শ্রীচৈতন্যের মূৰ্ছাপনোদন হইল । তিনি চেতনা লাভ করিয়া সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্কভৌমকে নিকটে দেখিয়া শ্রীতি-প্রফুল্ল মনে অভিবাদন করিলেন ।

নদের নিমাই ।

সার্কভোম তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন এবং ভক্তিভরে
কাঁহার সেবায় রত হইলেন। তিনি চৈতন্যের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া
মহাপুরুষ জানে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বিষম
পাণ্ডিত্যাভিমান তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি জানিতেন—
কাঁহার মত পণ্ডিত জগতীতলে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীচৈতন্য ধর্মবিষয়ে
উন্নত হইতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যে নয়। এইজন্য তিনি একদিন
নিজেব পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য সশিষ্য চৈতন্যদেবকে চৈতন্য-ভাগবত
শুনাইতে ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি
দেখাইবার জন্য—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রূহা অপ্যাক্রমে ।
কুর্কৃত্যহৈতুকীং ভক্তিং মিথং ভূতগুণোহরি ॥

এই শ্লোকটির নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। দর্পহারী কখনও
কাঁহার দর্প রাখেন না। বাস্তবদেব জানেন না যে, এ কাঁহার নিকট
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে ঐ শ্লোকটির অষ্টাদশ
প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সার্কভোম শ্রীচৈতন্যের অগাধ
পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পড়িলেন এবং
কবযোড়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তিনি গুরুকে আদরে গৃহে রাখিয়া তাঁহার নিকট
ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সার্কভোম বুঝিলেন—পুস্তক
পড়িয়া যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, তাহার জয়-পরাজয় আছে। কিন্তু
ভিতরে দেখিয়া-শুনিয়া, বুঝিয়া-পড়িয়া, সাধনায় সিজি লাভ করিয়া

নদের নিমাই ।

যাহা শিক্ষা ক'বা যায়—তাহা একেবারে অভ্রান্ত , তাহাকে তর্ক-বিতর্কে
হাবাইবার ক্ষমতা এ জগতে কাহারও থাকে না ।

শ্রীচৈতন্য সকলকেই সমান ভাবে দেখিতেন । তাঁহার নিকট
ছোট-বড়, বনৌ-নিধন, জ্ঞানী-অজ্ঞানী কিছুই ভেদাভেদ ছিল না ,
নীচ-উচ্চ জাতিভেদ তিনি কবিতেন না । তাই বলিতেন :—

“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হবিভাক্তপবায়ণঃ ।

হবিভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥”

তুণেব ন্যায় স্ত্র-নীচ হইয়া তিনি সকলকেই আলিঙ্গন দান করিয়া
কৃতার্থ করিতেন এবং নিজে কৃতার্থ হইতেন । মবি মবি, এমন দয়াব
ঠাকুর, পতিতেব বন্ধু বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মাইয়াছে কি ?

শ্রীচৈতন্য একদিন ভাবাবেশে বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, সঙ্গে কেইট
নাই , সেই সময় একজন মুসলমান দর্জি বাজা কদ্রপ্রতাপেব আদেশে
সার্কর্ভোম মহাশয়কে ডাকিতে আসিল । জানি না কোন্ সৌভাগ্য
বলে সে সার্কর্ভোমেব সঙ্কানে আসিয়া প্রভুব দর্শন পাইল । শুধু কি
তাই—প্রভু তখন ষড়ভুজ মূর্তি ধরিয়া বিহার কবিতেছিলেন । যে রূপ
দর্শন প্রভুর কোনও ভক্তের ভাগ্যে ঘটে নাই, সামান্য দর্জি আজ তাহার
সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া চমকিত হইল । সে অতি দীনভাবে প্রভুর
পদতলে আসিয়া উপবেশন করিয়া করঘোড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিল ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু প্রকৃতিস্থ হইয়া রূপ সম্বরণ করিলেন
এবং সম্মুখে মুসলমান দর্জিকে দেখিয়া বলিলেন—“মোল্লা সাহেব !
পূর্ব জন্মের স্মৃতিব ফলে তুমি আজ আমাব দেবমূর্তি দর্শন করিলে ।

নদের নিমাই ।

অতঃপর তুমি মহা সাধু হইলে ; হরিনাম করিতে কখনও ভুলিও না—
হবিনামেই তোমার মুক্তি হইবে ।”

দজ্জি পণ্ডিতকে বাড়ীতে দেখিতে না পাঠিয়া বাজাকে গিয়া
সংবাদ দিল । সে আরও বলিল—“পণ্ডিতেব বাড়ী একটী মহাপুরুষ
আসিয়াছেন—তিনি স্বর্গের দেবতা, তাঁহার ষড়ভুজ মুষ্টি দেখিয়া আমি
সব ভুলিয়া গিয়াছি । মহারাজ ! আর আমি সামান্য রাজদরবারে
চাকুরী করিব না , এক্ষণে আমি সেই রাজাব-রাজার দাগত্ব করিতে
চলিলাম । আপনি আমার স্থানে অন্য লোক বাহাল করুন ।” এই
বলিয়া দজ্জি সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ কবিয়া ফকিবেব বেশে মহাপ্রভুর
শরণাপন্ন হইয়া জীবনের পথ মুক্ত করিতে লাগিল ।

তখন মুসলমানগণের প্রতাপ চারিদিকেই অপ্রতিহত, কেহ তাহাদের
সমকক্ষ হইতে পারে না । হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য তাহারা
প্রাণপণ করিতেছে, হিন্দুর মধ্যে মুসলমান-ধর্ম চালাইবার জন্য উঠিয়া
পড়িয়া লাগিয়াছে । হিন্দুগণ ধর্মভয়ে ভীত হইয়া গৃহে গৃহে “সত্যপীরের”
পূজা আরম্ভ করিয়াছে ; নারায়ণের পূজা করিয়া “সত্যপীরের সীরণী,
ব্রত-কথা পাঠ” প্রভৃতি করিয়া মুসলমানগণের তুষ্টি সাধন করিতেছে ।
এই সময় হইতেই সত্যপীরের পূজা-ভাণ করিয়া শ্রীনারায়ণের পূজা
এবং মানসৌক ব্রতকথা আরম্ভ হইয়া এতদিন হিন্দুসমাজে চলিয়া
আসিতেছে ।

তখন কোন হিন্দু-রাজাই মুসলমানগণের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষুণ্ণ
করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্রিয়-বীর রাজা প্রতাপরুদ্র অনেক সময়ে
মুসলমান-সেনাপতি ও কাজীগণকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া হিন্দু-সমাজের ও

নদের নিমাই ।

হিন্দু ধর্মের মাঠায়া অক্ষর রাখতে পাবিয়াছিলেন । প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীগঙ্গাথ দেবের মহাভক্ত, প্রতি পুণ্যতিথিতে তিনি পুরী-মন্দিরে আসিয়া দেবতার পূজা ও ভোগ প্রদান করিতেন । ধর্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল ।

নবদ্বীপে যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ কথা প্রতাপরুদ্র শুনিয়া ছিলেন, দেখিবাব সাধ কবিয়া বাজকাষ্যে ব্যস্ততা হেতু দর্শন করিতে পারেন নাই, আজ যাইব—কাল যাইব বলিয়া দিন কাটিয়া যাইতে ছিল । আজ দর্জিব মুখে এই অপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া তান সন্তিত হইলেন, বুঝিলেন—প্রভু নিশ্চয়ই পুৰীধাম পবিত্র করিতে আসিয়াছেন, নতুবা সামান্য মানুষ কখন ষড়ভুজমূর্তি ধরিতে পারে না । আব পণ্ডিত মহাশয়ের মুখেও শুনিয়াছি—প্রভু জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভু আসিতেছেন । প্রভু দাক্ষ্যম মূর্তি—আব ইনি সজীব মূর্তি । কত দিনে তাঁব দর্শন পাইব ?

প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । অল্প সময় হইলে সার্বভৌম হয়ত নিজের অভিমানে মস্ত হইয়া প্রভুর মহত্ব বাজ-সমীপে প্রকাশ করিতেন না । কিন্তু এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের পদে তিনি মস্তক অবনত কবিয়াছেন—ভগবান চৈতন্যদেব তাঁহার সকল দর্শ চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে যথার্থ চৈতন্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন । পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যভিমান ঘুচিয়া গিয়া অন্তব বিশ্বন্ধ প্রেমভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাই তিনিও রাজ্যব নিকট মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণনা করিবার সময় অশ্বেষণ করিতেছিলেন । এক্ষণে রাজ্যব মনোভাব বুঝিয়া অপার আনন্দে সমস্ত প্রকাশ করিলেন । বাজা প্রভুকে নিজ ভবনে আনিবাব জন্য ভক্তিভাবে তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন । শ্রীচৈতন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

নদের নিমাই ।

এরিতে রাজভবনে পদার্পণ করিলেন । রাজা ধন্য হইয়া সপারিষদ মহাপ্রভুর সহিত সংকীৰ্ত্তন-রসে মাতিয়া উঠিলেন । প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে বেশী বিলম্ব করিলেন না ।

অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচলে আপনার বাসস্থান স্থির করিয়া, প্রাণের নিত্যানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন । জননী ও পত্নীব সেবার ভার গ্রাহ্য উপর ন্যস্ত করিয়া চারিদিকে হরিনাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করিলেন । নিত্যানন্দ দেশে আসিয়া শচীদেবীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন । নিমাই-নিতাই অপ্রভেদ, এক আত্মা—এক প্রাণ । বুদ্ধা শচীদেবী নিতাইকে পাইয়া এবং তাঁহার মুখে নিজ পুত্রের স্নসংবাদ এবং নীলাচলে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া, এক প্রকার জীবন্ত হইয়া শেষে কয়টা দিন কাটাইতে লাগিলেন ।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর পাতৃকা লইয়া পূজা করিয়া তন্ময়ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন । প্রথম প্রথম প্রাণফাটা মর্ষ-যাতনায় অভিভূত হইয়া, পিতৃগৃহে যাইবার জন্য শান্তডীর নিকট অহুযোগ করিতেন, কিন্তু প্রভুর পাতৃকা পূজার ভার পাইয়া অবধি আর তাঁহার কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই । এখন কেহ সে কথা তুলিলে বলেন—“স্বামীৰ গৃহ জ্ঞা-জাতির নিকট সকল তীর্থের সার এবং স্বৰ্গ হইতেও পবিত্রতম স্থান । ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু আমার হৃদয়-দেবতার পদরজে পরম পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে ; ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতা তাঁহার রূপের স্বরূপ প্রদান করিতেছে । আমি এমন পবিত্র মনোরম স্থান ছাড়িয়া স্নহ হইতে আর কোথায় যাইব ? বিশেষতঃ তাঁহার আরাধ্যা জননী, তাঁহার সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইতেন—আমি সেই সৰ্ব্বমঙ্গলময়ী দেবীকে

নদের নিমাই ।

ছাড়িয়া আব কোথাও যাইব না। এখন এই মাটীতে হাড় ক'খানা
বাখিতে পাবিলেই আমি ক্লান্তত্যাগ হইব।

ভাগবত হবিদাস প্রভুব কাছে কাছে থাকেন। কোনও যাত্রী
বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলে, তাহাদেব দ্বাৰা প্রভুব সংবাদ—
তাহাব জননা, পত্নী ও নিতাইকে প্রেরণ কবিতেন। নিতাই জননীসমা
শচীদেবী ও প্রভুপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াব নিকট দাসভাবে অবস্থান করিয়া, প্রভুব
আদেশে গ্রামে গ্রামে হবিদাস প্রচাব কবিতে লাগিলেন।

এখন হবিদাস প্রভুব অন্তবঙ্গ মহাভক্ত, প্রভু তাঁহাকে নয়নেব
অন্তবাল করিতে পাবেন না। হবিদাস প্রভুব অগ্রে দেহত্যাগ করিবাব
জন্য ক্লতসংকল্প হইয়া, কিছুদিন হইল সামান্য জব ভোগ কবিতেছেন।
প্রভু অনন্যকৰ্ম্ম হইয়া ভক্তেব সেবায় প্রাণপাত কবিতেছেন। কিন্তু
হবিদাস এত সেবা-শুশ্রূষায়ও আবোগ্য লাভ কবিতে পাবিলেন না,
দিনে দিনে দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল এবং একদিন প্রাতঃকালে
মহাপ্রভুব পদতলে তিনি চির-নিৰ্ব্বাণ লাভ করিলেন। ভগবান
চৈতন্যদেব অতি সাদবে এই পবিত্র দেহ বুকে কবিয়া তাহাব শেষ
সংকাব কবিলেন।

ভক্তবিযোগে হৃদয়ে দাক্ষ্য আঘাত পাইয়া, শ্রীচৈতন্যদেব কাশী,
বৃন্দাবন প্রভৃতি সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের নানা স্থানে
বৈষ্ণবধর্ম প্রচাব কবিতে বাহির হইয়া, তিনি সকলের নিকট পূজিত
হইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান সময়ে কপ-সনাতনেব
সহিত তাঁহাব মিলন হইল। তিনি ভক্তেব ভক্তিভাবে আবদ্ধ হইয়া
কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেব স্বরূপ দর্শন কবিয়া—“হা কৃষ্ণ,

নদের নিমাই ।

হা কৃষ্ণ” বলিয়া কঁাদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। যমুনা-জলে—
বংশীবটতলে শ্রীকৃষ্ণের মুখুর বংশীধ্বনি শুনিয়া কত ছুটাছুটা করিয়া-
ছিলেন। তারপর রাধাকৃষ্ণে আসিয়া রাধাভারে বিভোর হইয়া, স্বামী
সহবাস-সুখে সুখী হইবার জন্য কিছুদিন স্ত্রীভাবে তথায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী নর-নারী এই আত্মভোলা ভিক্ষুককে দেগিয়া, তাঁহার
ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভাবে পূজা করিয়া ধন্য
হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দেবতার কৃপালাভ তাঁহাদের ভাগ্যে বেশী
দিন ঘটে নাই। জননীর নিকট অঙ্গীকার স্বরণ করিয়া প্রভু শীঘ্র শীঘ্র
তথা হইতে পুনরায় দেশে আসিলেন। অদ্বৈতবাসে কিছুদিন অবস্থান
করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

চৈতন্যের ধর্ম ।

প্রেম ধর্মই মহাপ্রভুব ধর্ম । ভক্তির চরম প্রেম, প্রেমই চরম গাব । এই ভাবে বিভোর হইয়া নাম গান কাবতে পাবিলেই, জীব সমস্ত পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তিমে ভগবানেব চরণে নীন হইতে পাবে ।

আসক্তিসম্পন্ন কলির জীবের জন্য ভগবান মহাদেব তাত্ত্বিক সাধনা প্রচাৰ কবিয়াছিলেন । ইহাতে আপামব সাধাবণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি মাৰ্গে আসিয়া সাত্ত্বিকভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ কবিতে পাবিবে । কিন্তু ইহাতে অনেক অন্তষ্ঠানের আবশ্যক । আজ মহাপ্রভু চৈতন্য যে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন—কলিব জীবের জন্ত যে নাম-মাহাত্ম্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে উদযোগ অন্তষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । কেবল ঈ দয়া কাদিয়া—উদ্ধ্বাহ হইয়া নাম সংকীৰ্ত্তন কবিতে পাবিলেই জীব সংসারের সকল মায়াজাল মুক্ত হইয়া জীবমুক্তি লাভ করিবে । এই নামেব মধ্যে ভগবান মূর্তি পবিগ্রহ করিয়া বিরাজ কবিতেছেন ; তাঁহাব অনন্ত নামে অনন্ত শক্তি বিবাজিত । ভগবান চৈতন্যদেব বলিয়া গিয়াছেন :—

১. নামামবারি বহুধা নিজ সৰ্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভবগন্যমপি দুর্দৈবমিদৃশমিহাজনি নাহুবাগঃ ॥

নদের নিমাই ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমুখপদ্মাবনির্গত উপযুক্ত শ্লোকে বলিতেছেন—
ভগবান আপনার নামের মধ্যে বহু প্রকাষে নিজের যাবতীয় শক্তি
নিহিত রাখিয়াছেন । আর তাঁহার নাম শ্রবণের কোন বিশেষ নিয়ম
বা কালাকাল নাই । হায় ! দয়ার ঠাকুর—তোমাব এতাদৃশ মহিমাময়
নাম পাইয়াও আমার এমন মন্দ ভাগ্য যে, তাহা স্বৰ্গে আমাব অন্তরাগ
করিতেছে না ।” হরিনাম ভিন্ন জগতে এমন আর কোন নাম নাই
যাহাতে সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্তা সৰ্বশক্তিমান ভগবান উদ্দীপনা হয় ।
নামকে কেবল অক্ষর বলিয়া বিবেচনা করিলে হইবে না, নামই ব্রহ্ম ।
শ্রীকপ গোস্বামী “কৃষ্ণ” এই বর্ণ দুইটির কত মাহাত্ম্য—ইহাতে কত
অমৃত পবিপূরিত বহিয়াছে—তাহা এক মুখে বলিতে পারেন নাই ।
নবদ্বীপে প্রভুব আদেশে শ্রীমদ্বিত্যানন্দ ও নীলাচলে ব্রহ্ম হরিদাস
জীবের মঙ্গলের জন্ত বাড়ী বাড়ী গিয়া এইকপ ভিক্ষা করিয়া-
ছিলেন যে:—

হরিদাস, নিত্যানন্দ বলে এই ভিক্ষা ।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥

ব্রহ্ম হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ জপ করিয়া নাম সাধনায় অসিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্বে বিবৃত করিয়াছি । এইজন্য
বহু কুলীন-ব্রাহ্মণ আজও তাঁহার সাধন-পীঠে সমাগত হইয়া ধূল্য
পাডয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকেন এবং রাজসভাদিতেও তাঁহার সমাদরের
ক্রীড়া হয় না । আর মহাপ্রভু এই হরিদাসের মৃতদেহ স্বক্ষে করিয়া
নিজে ধন্য হইয়াছিলেন । এইজন্য ভক্তও যে ভগবানের আরাধ্য বস্তু,

নদের নিমাই ।

তাহাতে আব সন্দেহ কবিবাব কিছু নাই । নামই ব্রহ্ম, মন্ত মহাশয়
বালরাছেন :—“এবাম্ববং পবব্রহ্ম ।” ত্রীচৈতন্য-চবিতামতে মহাপ্রভু
বাব বাব বলিয়াছেন :—

হৃদে প্রভু কহে শুন স্বরূপ বাম বাষ ।
নাম সংকীৰ্ত্তন কলৌ পবম উপায় ॥
সংকীৰ্ত্তন-ষজ্জে কবে কৃষ্ণ আবাবন ।
সেইত স্তমেবা পায় কৃষ্ণেব চরণ ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বৰূপ, তিন একরূপ ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
কলিয়ুগে নাম রূপে কৃষ্ণেব অবতাব ।
নাম হৈতে হয় সৰ্ব জীবের নিস্তার ॥

কেবলমাত্র নাম জপেই জীব সৰ্ব সিদ্ধি লাভ কবে—জপাং
সিদ্ধিজ্জপাং সিদ্ধিজ্জপাং সিদ্ধিনসংশয়ঃ । এই নামে সকল দুৰ্ভাগ্য নষ্ট
হয় এবং সকল ভয়ে অভয় প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই নাম ধন্য
প্রচাবোদ্দেশেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছিলেন । শান্তিপুর হইতে
পুকষোত্তম এবং তথা হইতে দাক্ষিণাত্য এবং পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ
করিয়া প্রভু এই মহামহিমাম্বিত নাম-মাহাত্ম্য প্রচাব কবিয়া জীবকে
জীবমুক্ত কবিয়াছিলেন । প্রেমোন্মাদ প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন
কবিয়াছেন, সেইখানকাব লোকসমূহ তাঁহাব অপৰূপ রূপলাবণ্য দৰ্শনে,
তাঁহাৰ ত্রীমুখের মধুব হবিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কাতবভাবে তাঁহাৰ
নিকটস্থ হইলে চৈতন্যদেব তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া শক্তি সঞ্চাৰ

নদের নিমাই ।

যতঃ সংকীৰ্তন কবিতাে অল্পমতি দিলেন । তাহাবা নিজে বীৰ্ত্তনানন্দে
মতিয়া গ্রামে গ্রামে এই সংকীৰ্ত্তন-মন্ত্ৰ ছড়াইয়া কত পাণী তাপীকে যে
দৰ্শন কবিতাে লাগিল—তাহাব ইয়ত্তা কে করে ?

মহাপ্ৰভু শ্ৰীচৈতন্যদেব যখন পৃথিবীৰ নানা স্থানে প্ৰেম-দম্ব প্ৰচাব
পায়া গোদাবরী তীবে স্নান সমাপন কৰতঃ কৃষ্ণনাম জপ কাঁবতেছিলেন,
সেই সময় কায়স্থ-নরপতি বামানন্দ বায় তথায় উপস্থিত হইলেন ।
বামানন্দ চৈতন্য অবতাবেব কথা শুনিয়াছিলেন—ধৰি বৰি বৰিয়া এত
দিন ধৰা পান নাই । আজ অপৰূপ সৌন্দৰ্য্য বিভাষিত এই পদ্মাসী-মুন্দি
দেখিয়া তাহার আৰ চিনিতে বাকি বহিল না, বাজা তাঁহাব পদতলে
পড়গেন । প্ৰভু তাঁহাকে উঠাইয়া কৃষ্ণনাম কবিতাে বলিলেন এবং
তাঁহাব পৰিচয় লহবাব জন্য জিজ্ঞাসা কবিলেন—“তুমিই কি বায়
বামানন্দ ?”

বাজা অতি বিনীত হইয়া কৰযোডে বলিলেন—“আজ্ঞে, আমিই
দাসাত্মদাস হীনমতি ভক্তাধম ।”

চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দান কৰিয়া বলিলেন—“সাক্ষীভোমেৰ
মুখে তোমাব কথা শুনিয়া তোমাব সহিত দেখা কৰিবাব ইচ্ছা
হইয়াছিল ।”

বামানন্দ বায় একজন ভাগবতোত্তম ঈশ্বৰ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি । চৈতন্যদেব
তাঁহাব নিকট ভক্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক নানাবিধ তত্ত্ব শ্ৰবণেচ্ছু হইয়া প্ৰশ্ন
কবিলেন । বায় বামানন্দ বলিলেন—“প্ৰভু স্বয়ং যখন ভক্তিরস রসিক
প্ৰেমাৱতাব, তখন আপনাব আমি নিকট কি তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰিব ?
আমাব কি ক্ষমতা যে, আপনাব চিত্ত-স্থখকর বিষয়সকল বিবৃত কৰি ।”

নদের নিমাই ।

প্রভু বলিলেন—“ভক্তিব নিকট ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ কবিত্তে আমাব বড সাব । জগতে জীবের প্রার্থনীয় বস্তু কি, তুমি তাহা প্রবা কবিয়া বল ।”

বামানন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন—“প্রভু । বিষ্ণুভক্তিই জীবের প্রার্থনীয় এব স্বধ্মে থাকিলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে ।”

প্রভু বলিলেন—“উহা বাহিরেব উপায় , উহা অপেক্ষা আরও কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ কব ।”

বামানন্দ বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণে সকল প্রকার কন্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

“যৎ কবোষি যদম্মাষি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎপশ্যন্তি কোন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥”

প্রভু বলিলেন—“উহাও বাহ্য, আরও কিছু উৎকৃষ্টতর উপায় বল ।”

বামানন্দ গীতাব সেই সার কথা বলিলেন :—

“সৰ্বধৰ্ম্মান্ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”

প্রভু বলিলেন—“আবও কিছু উচ্চে উঠিত্তে পাব কি ?”

বামানন্দ ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত । তিনি বলিলেন—“জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সার । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন সাধকগণ ভগবান অচ্যুতের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পূজা করেন, অথচ সকল বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন কবিয়া থাকেন—ইহাই সাব তত্ত্ব ।”

নদের নিমাই ।

চৈতন্য বলিলেন—“আরও কিছু উচ্চ বলিতে পার কি ?”

বায় বলিলেন—“জ্ঞানশূন্য ভক্তি তবে সর্বশ্রেষ্ঠ ।”

প্রভু বলিলেন—“ইহা কতকটা বটে, তবে আরও বেশী যদি উপলব্ধি
বিদ্যা থাক, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল ।”

বায় বামানন্দ বলিলেন—“তবে প্রেমভক্তিই মূলধার, ইহাব তুল্য
কিছু নাই । যে সকল নিষ্কামী ভক্ত প্রেমভক্তির দ্বারা ভগবানে
দায়-সমর্পণ করিয়া পবমানন্দ লাভ কবেন, তাহাদের সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ
বং ইহাই গোপীদের শাস্ত্যভাব ।”

প্রভু বলিলেন—“ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী কিছু নাই ?”

বায় বলিলেন—“তবে দাস্ত প্রেমই সকলের সার ! তিনি প্রভু,
নিমি দাস—এই ভাব ভক্তের প্রাণে উদয় হইলে আর তাহার অভাব
কি সেবা ? প্রভু ! ছলনা পরিত্যাগ করুন, বলিয়া দিন—কবে আমি
তাহার সেবায় নিঃশূল হৃদয় হইয়া তোমাতে মজিয়া থাকিব ?”

মহাপ্রভু বামানন্দের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া
বলিলেন—“বামানন্দ, আরও বল ।”

বামানন্দ বলিলেন—“তবে সখ্যভাবে সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই
ভাবেই ভগবান অর্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে
ঈশ্বরের উচ্ছিন্ন ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন ।
এই প্রেমই অতি দুর্লভ নয় কি ?”

শ্রীচৈতন্য যেন তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না দেখিয়া, বামানন্দ
বলিলেন—“বাৎসল্যভাব তবে সকলের শ্রেষ্ঠ ! মা যশোদা যে ভাবে
ভগবানের ভজনা করিতেন ?”

নদের নিমাই ।

প্রভু বলিলেন—“ইহা উত্তম বটে, তবে ইহাব উপবে আব কিছু আছে কি ?”

রামানন্দ বলিলেন—“তবে মধুর ভাব । এই মধুব ভাবে ব্রজ-গোপীগণ তোমাকে বাদিয়াছেন । ব্রজগোপীদের মত অহিতুকী প্রেম আর কাহারও নাই, নিজের সুখবাঞ্ছা বা কোন কামনা নাই, ভগবানকে সুখী করিবার জন্যই তাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন প্রেম সাধনা আর কোথাও নাই ।”

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে ব্রজ-গোপীগণের প্রেমের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । প্রভুর তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—“প্রভো ! নারায়ণ যেমন ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আমার চিত্তে নিজ শক্তির প্রেরণ করিয়া বাধাক্ষয় তত্ত্ব শ্রবণ করিলে । এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাব প্রতি প্রসন্ন হও ।”

প্রভু বলিলেন—“তুমি ভাগবত, সকল বস্তুতেই ইষ্টদর্শন করিয়া থাক । তোমার অজানিত কি আছে রামানন্দ !”

রামানন্দ বলিলেন—“প্রভো ! আর কেন, মায়া ছাড় । তুমি যেক, তাহা আমি চিনিয়াছি ; এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা কর ।”

তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তশ্রেষ্ঠ রামানন্দ রায়ের হৃদয়-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিতে দর্শন দান করিলেন । ভক্তপ্রধান রামানন্দ ইষ্টমূর্তি দেখিয়া চরণে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । ভক্তগণ সকলে প্রাণ তরিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ।

এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেশকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন ।

নদের নিমাই।

বাহা চায়—বাহা পাইলে হৃদয় সন্তুষ্ট হয়—অকর্মামী মহাপ্রভু
শ্রীচৈতন্য তাহাকে তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। মুসলমান বাজাব
প্রবল প্রতাপে, হিন্দুধর্মের তথা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েব দুর্গতিব দিনে
পেওবা আয়ুহাবা মানবকে তিনি ভক্তিপথেব পথিক কবিয়া, সমস্ত
ভাৱতে ভক্তিব বাণ ডাকাইবা দিয়াছেন। তাহার ধর্মের প্রধান
কর্মব্য ছিল :—

তৃণাদপি স্ননীচেন তরোবিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানবেন, কীৰ্ত্তনোয় সদা হবিঃ ॥

তৃণেব মত স্ননীচ হইয়া আর্ন্তের সেবা, জীবৈ দয়া প্রদর্শন না করিলে—
স্বিনামে কচি হয় না। যেখানে অহঙ্কার—সেইখানেই কার্যহানী।
অহঙ্কারীব ধর্ম হয় না—তাহাবা কখন মুক্তিলাভ করিতে পারে না।
যেখানে দীনতা—সহিষ্ণুতা, সেইখানেই দম্ব বিবাজমান। এইজন্য
পাণ্ডব-জননী কুন্তিদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দীনতাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
এই দীনতা-হীনতা এবং দরিদ্রতা থাকিলে, সদাই ভগবানকে মনে
পড়িবে। তাই ধর্ম উপার্জনে অহংভাব পবিত্যাগ কবিয়া দীনতার
আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

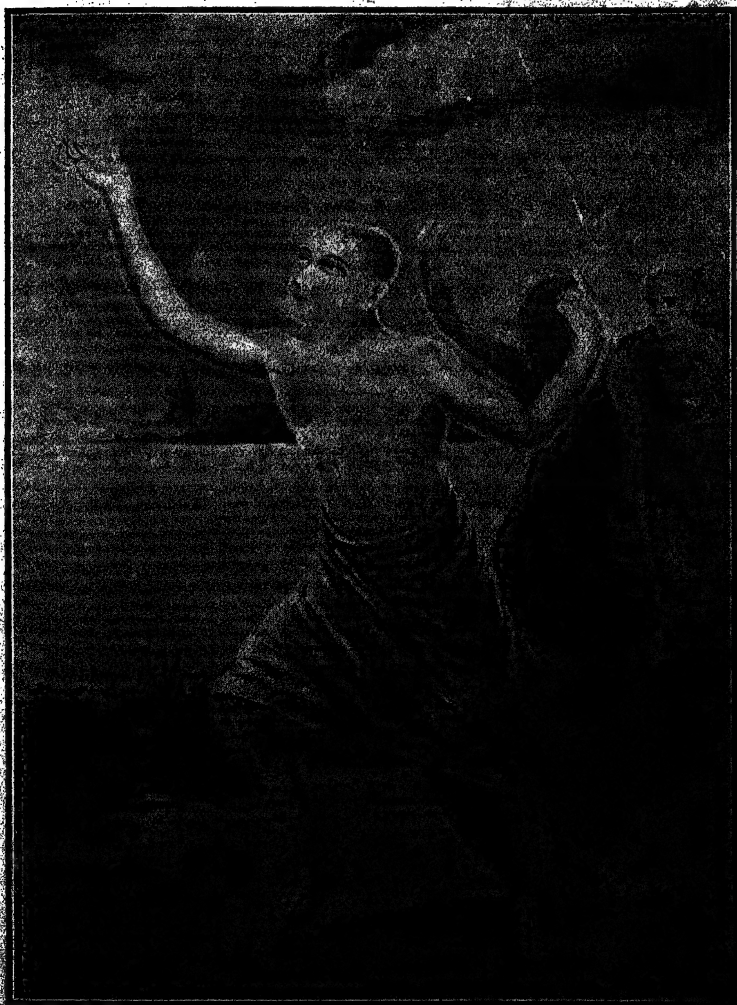
অহঙ্কারী রাজা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের মুক্তি নাই; তাহারা মুক্তি-
পথেব পথিক হইতে পারে না। রাজা ধনের অহঙ্কারে মত্ত, ব্রাহ্মণ
ধর্মের অহঙ্কারে মত্ত এবং পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মত্ত বলিয়া
তাহাবা অস্তিমে উত্তমাগতি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু মুক্তিলাভ
কবিতে পারে না। এইজন্য শাক্যসিংহ রাজপুত্র হইয়াও জীব-সেবার
জন্য—তাহাদের হৃৎকষ্ট মোচনের জন্য রাজভোগ ত্যাগ করিয়া সম্যাসী

নদের নিমাই ।

হইয়াছিলেন । তিনি ইচ্ছা কবিলে সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য কবতলগত কবিনে পাবিতেন, কিন্তু ধর্ম্মেব জ্ঞাত এমন উৎকট বৈরাগ্য যে, এই সকল বিষয়ে একেবাবে জলাঞ্জলী দিয়া তিনি ভিখারী সাজিয়াছিলেন ।

শ্রীচৈতন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য—জগতেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইচ্ছা কবিনে কি না কবিতে পাবিতেন? ভোগ-বিলাসে, জাগতিক উন্নতিব পথে তিনি মনে কবিলে সকলেব শ্রেষ্ঠ স্থান অবিকার কবিতে পারিতেন কিন্তু মর্ত্ত্যবাসী জীবের জ্ঞাত তাঁহাব প্রাণ এমন কাঁদিয়া উঠিল—হৃদয় এমন শোকাবেগে আকুল হইয়া উঠিল যে, এত মান-সম্মত—এত বিলাস-আয়াস—এমন লক্ষ্মীস্বরূপা সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী ভার্য্যা—এমন স্নেহময়ী জননী—এমন শাস্তিময় আবাস-ভবন ছাড়িয়া তিনি ভিখারীবেশে লোকের দ্বাবে দ্বারে ঘুরিয়া, ভূবনপাবন হরিনাম বিতরণ কবত জীবের পরকাল নিস্তারের উপায় বিধান করিতে লাগিলেন । স্বয়ং শ্রীহরিব অবতার হইয়া হরিনামে পাগল হইলেন ; অশান্তি-গবলে অমৃতের স্নিগ্ধ-সিঞ্চন প্রদান করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গের মধুরতায় পূর্ণ করিয়া দিলেন । ভক্তগণ অকুলে কুল পাইয়া ধন্য হইল ।

ভাবোন্মাদ ।



পাপনের গরি। গোর। কোথা দৃষ্টি নহে।
নিশাংকর। হস্তে ছুরি। সমস্তের মঙ্গল।

ত্রিশ পরিচ্ছেদ ।

হরিনাম ।

হবিনামামৃত-সিক্ত মন্তন করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্য নামেব তরণী
লইয়া ডাকিলেন—“আয় পাপী, তাপী, ব্যথিত, মগ্নাহত জীব—বে
বোথায় আছিস্ আয় ; আমি হরিনামেব তবী আনিয়াছি, অবহেলায়
বে ভবাকী পারে যাবি আয় !” পাগলপারা শ্রীচৈতন্য দিশাহারা
হইয়া নীলাচলে সমুদ্রের তীরে কেবল ডাকিয়া বেড়াইতেছেন আব
লোকেব হাতে ধরিয়া—বুকে কবিয়া অঙ্গবুকে কাঁদিয়া বলিতেছেন—
‘বল ভাই ! হবি হরি বোল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল । জীব ! এ তরণী আরোহণ
কবিয়া পাবে যাঁহাতে হইলে কড়ি দিতে হয় না, মুখে কেবল হরিনাম
কবিলেই এই নাম-তরণী তোমাকে অবহেলায় বৈকুণ্ঠের দ্বারে লইয়া
যাইবে । কলির মানব ! ভবের মায়াতে ভুলিয়া এমন সুযোগ-সৌভাগ্য
ত্যাগ করিও না ; এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া হরিনাম করিতে
অবহেলা করিও না । ভাই ! মধুব হরিনাম নিজের কর, পরকে করিতে
বল , অবিরল এই হরিনাম করিয়া হরিময় জগৎ দেখ । ভাই !
হীরক-ফটীক প্রভৃতি বহুমূল্য ধনরত্ন যত্ন করিয়া রাখিয়া কি হইবে ?
তাহা ত পরকালে তোমার সঙ্গে যাইবে না ; সেই দুর্গম পথে ইহারা
তোমাব কোন প্রকার সাহায্য করিবে না । সেই পরমরতন নিত্যধন
হরিনাম বরং হৃদয়-মন্দিরে যত্নে তুলিয়া রাখ, যাহা তোমার ইহ-পরকালে,

নদের নিমাই ।

সম্পদে ও বিপদে সমান ঈষ্টকাবক হইবে। নামী হইতেও নামেব
মাশায়া বেশী, তাই প্রভু শ্রীচৈতন্য আজ নিজে হবিনাম কবিয়া পাগল
হইয়াছেন, অহঙ্কাব মাংসয্য ত্যাগ কবিয়া, নীলাচলেব সকল স্থানে—
সকলেব নিকট কীর্ত্তন কবিয়া বেড়াইতেছেন। ছোট বড়, ব্রহ্ম-অভ্রহ্ম,
দীন দুঃখী তাঁহাব জ্ঞান নাই, যেখানেই হবিনাম—শ্রীচৈতন্য সেইখানেই
‘গমন কবিয়া নত্যা বত হইতেন। সকলেই তাঁহাকে বেড়িয়া আকুল
কণ্ঠে বলিতেছেন—“নাচেবে গোবান্দ নাচে সংকীর্ত্তনেব মাঝে।’ প্রভু
নাচিতেছেন, সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া অচৈতন্য হইয়া
পড়িতেছেন, চক্ষুেব পলক নাই, কিন্তু অধবোষ্ঠ মুহু মুহু নড়িতেছে
নামগানে যেন তাহাদেব বিবতি নাই। এমনি কবিয়া নাম না করিলে
কি সাধনা হয় ?

যেখানে সংকীর্ত্তন হইতেছে, সেখানেই জীবের চৈতন্যোদয় হইতেছে,
তাই তাহাবা নামে উন্নত হইয়াছে। তাহাব উপর স্বয়ং চৈতন্যদেব
জগতের যাবতীয় সজীবতা লইয়া যখন সংকীর্ত্তনেব প্রাণরূপে তথায়
আত্মাহারা হইয়া নামরসে গলিয়া যাইতেছেন, তখন সেই প্রেমেব শ্রোতে
যে পড়িতেছে—হাজাব কঠিন হৃদয় হইলেও সে না গলিয়া থাকিতে
পাবে কি ? জগতেব আত্মা—প্রাণরূপী স্বয়ং মহাপ্রভু দ্রব হইলে শিথিলগণ
যে দ্রব হইবে, তাহাব আর বিচিত্র কি ?

ভগবান নিজের নামে নিজেই গলিয়া যান। একদিন বৈকুণ্ঠে
ভগবান মহাদেব সিদ্ধিদাতা গণপতিব সহিত খোল কবতাল সংযোগে
প্রাণারাম কীর্ত্তন কবিয়া প্রভুকে এমনি গলাইয়াছিলেন—এমন ভাবে
মৃগ কবিয়াছিলেন যে, আজও তাহাব কীর্ত্তি জগতীতলে অতুল ।

নদের নিমাই ।

দেবাদিদেবের মুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রীহরি এমন বিগলিত হইয়াছিলেন
৭, তাহাতেই পতিতোক্কাবিণী জীব-নিষ্ঠাবিণী মা জাহ্নবীর উৎপত্তি
হইয়া আজও পতিত-জীবের গতিমুক্তি প্রদান করিতেছেন। যেখানে
হরিনাম হয়, সেখানেই যে চৈতন্যময় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরি স্বয়ং উপস্থিত
যা কেন ; তিনি হরিভক্ত নারদকেও তাই প্রাণ খুলিয়া অভয় দান করিয়া
বলিয়াছিলেন—“নারদ ! কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাদের ছাড়া নই।”

নাহং তিষ্ঠামী বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ ।

মদভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামী নারদ ॥

ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই প্রতিজ্ঞা-বাণীর কি কখনও অন্যথা
হয় ? তাই প্রভু চৈতন্য অবতারে স্বয়ং সংকীৰ্ত্তনের মাঝে “হরিবোলে
আমার গৌর নাচে—নাচেরে গৌরাজ নাচে” বলিয়া তাঁথৈ তাঁথৈ ভাবে
নাচিয়া ধরাতল কম্পিত করিতেছেন।

একদিন ভক্তবার রাজা প্রতাপরুদ্রের চৈতন্য মন্দিরে সংকীৰ্ত্তনের
আয়োজন হইয়াছে। ভক্তবর প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণব্রহ্ম ইষ্ট-
দেবতা জ্ঞানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মন্দিরে স্থাপন
করিয়াছেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ হইতে বহু ভক্ত আসিয়া সময়ে সময়ে
প্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তির পূজা করেন এবং ভোগ দিয়া প্রসাদ
পান ; আর রাজা স্বয়ং ত সমস্ত বিষয়কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ঐ পথের পথিক
হইয়াছেন। মুক্তিকামী রাজা মুক্তির জন্ত অতি দীন-হীনের মত দরিদ্রের
সেবা করিতেছেন, যাবতীয় বৈষ্ণব-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মহাপ্রভুর
পূজায় রতিমতি স্থির করিয়াছেন। আজ এই ভক্ত-সন্মিলনীতে মহাপ্রভুর

নদের নিমাই ।

পদাপণ হইবে, তাই সকলেই কবখোডে দণ্ডায়মান , প্রভু ভাবে গদগদ হইয়া আপন বাসগৃহ হইতে হেলিতে ছলিতে বাহিব হইয়াছেন ।

এমন সময় দেখা গেল যে একটা চণ্ডাল লণ্ড লইয়া একটা কুকুবেল পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাবমান হইতেছে , অস্পর্শীয় কুকুবে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চৈতন্যদেবের পদতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল । সে কথা কহিতে জানে না, তথাপি তাহাও ভীত চকিত নয়ন—তাহার আকুলি-বিকুলি পদলেহন দেখিবা, ভগবান শ্রীচৈতন্য তাহার মনের ভাব, প্রাণের ভাব বেদনা বঝিতে পাবিয়া তাহাকে বুকে আববিয়া ধরিলেন , অভয় দিয়া তাহার গাত্রে কোমল হস্তপদ্ম বুলাইয়া শীতল কবিত্তে লাগিলেন । জীব-জীবন প্রভু চৈতন্যের প্রাণ আজ নিকট জীব কুকুবেল দুঃখে গলিয়া গেল ।

ইত্যবসরে চণ্ডাল লাঠী হস্তে চৈতন্যের নিকট আসিয়া বলিল—
“এ সাধু ! তুমি সাধু হইয়া বিষ্ঠাভোজী কুকুরকে স্পর্শ কবিয়াছ ? ছাড়িয়া দাও, আমি উহাকে মারিয়া ফেলিব । ও আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়াছে, আমাব বাডা ভাতে ছাই দিয়াছে—সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে । এই মধ্যাহ্ন সময়ে আব আমার উপায় নাই, তুমি ছাড—আমি উহাকে দেখিব ।”

কুকুরটা সেই লণ্ড হস্তে যমসম ঘাতুককে দেখিয়া থর থর কাঁপিয়া আবও দৃঢ়ভাবে চৈতন্যের কোলে লুকাইতে লাগিল । প্রভু বলিলেন—
“ঘাতুক । এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সকল জীবেরই ক্ষুধার উজ্জেক হয় । তুমি অন্ন রাখিয়াছিলে—ও বুদ্ধিহীন জীব, না বুঝিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে , আহা ত উহারও দরকার ? তবে তোমাব আহা হই

নদের নিমাই ।

নাই । আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে চল—তোমায়
ব্যব চূষ-লেহ-পেয় দিয়া আহাব কবাইব ।”

চণ্ডাল মনে কবিল—চৈতন্য বুঝি সামান্য ভিখারী, বাজবাবাডাতে
ভিক্ষা কবিয়া আমায় খাওয়াইবে । সেই কোথায় খায় তাব ঠিক নাই,
শাব উপব আবাব আমায় খাওয়াইবে । চণ্ডাল বাগত স্ববে বলিল—
“আব বৃজককৌ কণ্ঠে ০বে না, তুমি ছাড—আমি ওব প্রতিশোধ লইব ।”

ংগবান শ্রীচৈতন্য বলিলেন—“না ভাই, ও তখন আমাব শবণাপন্ন
হইয়াছে, তখন আমি উহাকে কিছুতেই ছাড়িব না । যদি এতই আক্রোশ
হইয়া থাকে, তবে উহার প্রাণ বিনিময়ে আমাব প্রাণ গ্রহণ কব ।”

চণ্ডাল তখন ক্ষুৎপিপাসায় অন্ধ হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিল না
যে, আন্তেব সহায়—হীন কুকুবেব বন্ধু এই মহাপ্রাণ মানবটীকে ।
আর চণ্ডালেব এমন স্মৃতিই বা কোথায় । সে রাগান্বিত হইয়া সজোবে
প্রভুব দেহেই আঘাত কবিল, শ্রীচৈতন্যেব সোণাব দেহ ফাটিয়া
বক্তশ্রোত বহিতে লাগিল । তথাপি নিরভিমান—সহিষ্ণুতাব প্রত্যক্ষ
অবতাব প্রভুব মনে বাগেব কিছুমাত্র আবির্ভাব হইল না । রক্তধারা
বহিতেছে, তথাপি প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“ভাই ষাতুক ।
প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে ত, এইবার জীবটীকে ক্ষমা কর । উহাকে
উহার গন্তব্য স্থানে যাইতে দাও—আব হিংসা করিও না ।”

প্রভুর মলিনতা হীন হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া চণ্ডাল স্তম্ভিত হইল, জীব-
নিস্তারণ প্রভুর আকর্ষণী শক্তি এবার চণ্ডালের কঠিন প্রাণ আকৃষ্ট করিল ।
সকলেরই একটা সীমা আছে, পাষণ্ড হৃদয় চণ্ডালের বাগ হইয়াছিল,
কিন্তু জীবের প্রতি প্রভুর অপরিসীম দয়া দেখিয়া সে আর থাকিতে

নদের নিমাই ।

পাবিল না—তাঁহাব ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘ্রাবয়া গেল । পে প্রভুব চরণতলে
পড়িয়া বলিল—‘কে তুমি দয়াময় । মামুষ্যত নয়, নিশ্চয়ই দেবতা ।
নতুবা বিনা অপবাধে এত নির্যাতন কি কেহ সহিতে পাবে ? প্রভু ।
আমার মোহ ঘুচিয়াছে , কোন মহাপুরুষ তুমি, জগতেব হিতেব জ্ঞ
এমন নাধুকপে অবতীর্ণ হইয়াছ । আমাব অজ্ঞান অন্ধকাবময় জীবনেব
পথে এমন জ্ঞানালোক ছড়াইতে কে তুমি আসিয়াছ প্রভু । পায়ে পড়ি
ক্ষমা বব, আমি অতি অক্লান্ত—অবম—হীন চণ্ডালজাতি । কিসে
পবিত্রাণ পাবো—কিসে তোমাব মত হবো, আমাকে বলো দাও প্রভু ।”

শ্রীচৈতন্যেব উদাব হৃদয়ে প্রেমের উৎস উৎসারিত হইল, তিনি
পদে পতিত চণ্ডালকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—“বৎস । আজ
তোদেব জন্য দানহীন আমি মুক্তির সম্বল হবিনাম আনিয়াছি, পবিত্রাণের
ভাবনা কি বাপ । বদন ভরে বল, হরি হরি বোল—ভুবন মঙ্গল
হরি বোল ।”

ঘাতুক শ্রীভগবান চৈতন্যেব বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া, অগাধ
প্রেমভরে দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল—“কে কোথা আছি
দেখ, আজ গোলকের হবি ভুলোকে এসে, তোদেব জন্য হরিনাম
বিলইতেছে । আয়—নেচে এসে বল, প্রেমে গলে বল—হরিবোল ।”

নিভ্যানন্দ বাজবাটীতে বিবাট সংকীৰ্ত্তনের আয়োজন শুনিয়া
আজ নীলচলে আসিয়াছিলেন । সেদিন যে দরজী প্রভুব ষড়ভুজ মূর্তি
দেখিয়াছিল, সেও আজ সংকীৰ্ত্তনে যোগদান করিয়া প্রভুর মহিমা
কীৰ্ত্তন করিতে আসিয়াছে । নিতাই ও দরজী প্রভুর আগমনে বিলম্ব
দেখিয়া আগবাড়াইয়া তাঁহাকে লইতে আসিতেছেন । এমন সময় পথে

নদের নিমাই ।

প্রভুব প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন—“চৈতন্য অবতাবে জীবোদ্ধাবের জন্ত নির্যাতন সহ্য কবাই ব্রহ্মা বিশিষ্টতা ? জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় , আজ প্রভু জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় আবণ্ড একজন মনোপাপী অধম চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়া নিজের মহা-মহা পবিত্রিত করিলেন । দত্ত ! বন্য দযাব ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ ।”

প্রভু চণ্ডালকে বাহুসভায় সংকীর্ণনে ঘোষণা করিতে অন্তর্মুগ্ধ বালিলেন । বাহুবলীতে যাইতে চণ্ডালের সাহসে কুলায় না , সে যাইবাব জন্য পা বাড়াইতে পারিল না , কারণ সে জানিত যে , প্রভুব প্রতি তাহার তাড়নাব কথা জানিতে পারিলে তাহার আব নিস্তার থাকিব না , তাই সে যাইতে অস্বীকার করিল । প্রভু বলিলেন—“ভাই ! চণ্ডালে কোল দেওয়া—তাহাব সহিত মিত্রতা ববা , আজ আমাব নৃতন নয় . ত্রেতাযত্নে গৃহক চণ্ডালই আমাব প্রধান বন্ধু ছিল । ভাই চণ্ডাল ! তুমি আমাব মিতার স্বজাতি , তবে আবাব পর হইতেছ কেন ?”

চণ্ডালের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে তাহার নয়নে দরবিগলিত প্রেমবারা বহিতে লাগিল , অন্ততাপ-অশ্রুজলের প্রবল প্রবাহে সে অভিষিক্ত হইল । প্রভু তাহাকে পতিতপাবন হরিনামের পবিত্র প্রেমজলে ধোত করিয়া নিষ্পাপ করতঃ সভাব মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন । বাজা , বাজ-সভাপণ্ডিত প্রভৃতি মহা মহা রথীগণ প্রভুর এই মহাভক্তকে আলিঙ্গন দান কবিয়া হরিনাম সংকীর্ণনের বিরাট আয়োজন কবিতে লাগিলেন ।

বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল । আজ এ বিরাট সংকীর্ণন কবিতে লোকবিচার নাই ; অধিকারী-অনধিকারী ভেদ নাই । হরিনাম সাধনে

নদের নিমাই ।

সকলেরই সমান অধিকার । তুমি পাষণ্ড, তুমি পাতকী, জ্ঞান-যোগাদির অধিকার তোমার নাই বলিয়া নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই । পাষণ্ড-দলন, পাণী-নিস্তারণ এই নাম—প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ কর—দেখিবে, দেবদুর্লভ-আনন্দ-নিকেতন স্বর্গরাজ্য তোমার নিকট হইয়া আসিবে । তুমি অবহেলা করিয়া অথবা অশ্রদ্ধার সহিত যদি “হরি” এই দ্ব্যক্ষর যুক্ত নামটি অল্পক্ষণ উচ্চারণ কর—তাহা হইলে তোমার সমস্ত পাপ তাপ নষ্ট হইবে । তুমি জন্মজন্মান্তরের বহুতর দুষ্কৃতি ভারে কাতর হইলেও, এই নাম সেই সমস্ত কাতরতা নষ্ট করিয়া তোমায় অসীম শাস্তি সলিলে অবগাহন করাইবে । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের এমন মহামহৌষধ আর নাই । নদীয়াবতার শ্রীচৈতন্য জীবের মুক্তির জন্য এই আয়াসলভ্য সরল পথ আবিষ্কার করিয়া, জীবকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছেন । প্রভু নিজে নামী হইয়া নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন । কলির মানব ! তুমি আজ ধন্য হইলে !

পূর্বে স্বর্গে-মর্ত্তে হরিনাম-কীর্তন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এমন রসভরা নগর-কীর্তন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই দেশে প্রচারিত হইয়াছে । সদলবলে নগরে নগরে গমন করিয়া প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন—দেশের আধিব্যাধি বিনাশ করিতেন—লোকের প্রাণে শাস্তি সুধাধারা ছড়াইয়া দিতেন বলিয়া তাঁহার কীর্তন নগর-কীর্তন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রভু নিজে এই দলের নেতা হইয়া অতি দীনহীনের মত নগরে নগরে ফিরিয়া, অযাচিত ভাবে এই অমূল্য হরিনাম বিলাইয়া আসিতেছেন । রাজা, মহারাজা হইতে অতি দীন-দরিদ্রের

নদের নিমাই ।

কুটীব পর্য্যন্ত প্রভু পদব্রজে নামগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন। পূর্বে আমাদের ধর্ম্ম-প্রচার কাষ্য ঘূবিয়া ফিবিয়া নগবে নগবে কবিবাব প্রথা ছিল না, বৈদিক যুগে নৈমিষাবণ্য প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে ঋষিগণ সমবেত হইয়া স্তুত গোস্বামীর মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতেন। তাবপব বেদিতে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেন এবং বথকতা কবিয়াও অনেক পণ্ডিত ধর্ম্মকথা প্রচার কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতাদি দ্বাৰা প্রচার-কাষ্য বা কীর্ত্তনানন্দ দ্বাৰা মুগ্ধ করিয়া নামে কচি আনয়ন করা কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বিশেষরূপে সংসাধিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যই বঙ্গভাষাকে পরিমার্জিত করিয়া-ছিলেন। তাহার পব হইতে এদেশে বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও কবি জন্মগ্রহণ করতঃ, ভাষা-জননীর সেবায় প্রাণপাত করিয়া আজ তাঁহাকে সমগ্রদেশে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

প্রভু হরিনামে যে অমোঘশক্তি প্রদান কবিয়া উদ্বোধিত কবিয়া গিয়াছিলেন, পববস্তী কালে অনেক বৈষ্ণব-কবি তাঁহাদের কাব্যে সেই অমিয় মধুর নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন—দেশকে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য নগর কীর্ত্তনে অবতীর্ণ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া নামগান করিতেন। প্রভুর মুখে সে নাম যে শুনিত, সেই আত্মাহারা হইয়া নামবসে মজিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত, গৃহ-সংসার ছাড়িয়া পাগলের মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। ভবভয়ে ভীত, দুঃখ-সন্তাপ-সন্তপ্ত জীব কিসে নিস্তার পাইবে—দুস্তর ভব-জলধী উত্তীর্ণ হইবে, তাহার

নদের নিমাই ।

চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইত। চৈতন্য-চরণে পড়িয়া যখন তাহার উদ্ধারেঃ উপায় জিজ্ঞাসা করিত, তখন তান নাচিয়া গাহিয়া বলিতেন—“ভাই । ভয় কিসের ? ভবজলধি গোপ্পাদের ন্যায় উত্তীর্ণ হইবে—একবার প্রাণ ভরিয়া নাচিয়া গাহিয়া বল—হরি হরিবোল ।”

শ্রীগৌরঙ্গ যখন সন্ন্যাসীর বেশে কটীতটে নামাবলী বাঁধিয়া—গলায় হরিনামের মালা পবিয়া প্রেমচকিত নয়নে উচ্চ সংকীৰ্ত্তন করিতেন, তখন সকলে দেখিত যে, প্রেমের গৌরঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জীবের উদ্ধার সাধন করিতে মর্ত্তে অবতীর্ণ। তাঁহার এ নাম—বাস্তবিক ভবারণ্য উদ্ধারের তরলী ; তান কর্ণবার রূপে দাড়াইয়া জাবকে অবহেলায়—এই ভীষণ আবর্ত্ত-সঙ্কুল মহাসাগর উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছেন।

মহাপ্রভু দলবল লইয়া নানাস্থানে নাম প্রচাব করিয়া দেশ উন্নত করিয়া তুলিলেন ; হরিনামের স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মের যেমন গ্রানি উপস্থিত হইয়াছিল—মানব যেমন ধর্ম্মভাব পরিত্যাগ করিয়া অধার্ম্মিক পশুরূপে পরিণত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর রূপায় সেই দেশ, সেই দেশের মানুষ আবার তেমনি ধর্ম্মে মাতিয়া উঠিল। উন্নত হইয়া সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল নামগান করিতে লাগিল। মুসলমানগণ আর তাহাদের এ প্রবল শক্তিকে বাধা দিতে পারিল না। শাক্ত-বৈষ্ণব যখন একভাবে বিভোর—তখন বাধা দেয় কার সাধ্য ? ধর্ম্মভাবে। একতা সাধন হইলে তাহা আর বাধা পাইবার নয়। স্বকার্য্য সাধন করিয়া, মহাপ্রভু এইবার নীলাচলে স্থির হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার শক্তি-সঞ্চালিত ভক্তগণ কার্য্য করিতে লাগিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

মহাপ্রয়াণ ।

পঁচিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রাণ চৈতন্তদেব সন্ন্যাস ত্রত গ্রহণ করিয়া দেশের কাছে ত্রতী হইয়াছিলেন। প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ কাল অনন্তকর্ম্ম হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নাম প্রচার করিলেন।

এইবার প্রভু দেশান্তর হইতে নীলাচলে পুনরাগমন করিয়া শিষ্যদের প্রতি প্রচার-কার্য্যের ভার দিয়া স্থস্থিব হইলেন ; অহরহঃ ভাব-বিভোর হইতে লাগিলেন। চৈতন্তের কখন চৈতন্ত থাকে, কখনও চৈতন্ত থাকে না। সকলেই বুঝিল—প্রভুর দিবোন্মাদ অবস্থা, এই অবস্থাই লীলার চরমাবস্থা ! যখন চৈতন্য থাকে না—তখন প্রাণহীনের মত পড়িয়া থাকেন, যখন সমাধি ভঙ্গ হয়, চৈতন্যের সঞ্চার হয়—তখন প্রলাপ বকিতে থাকেন। কখন “রাধা রাধা” বলিয়া চীৎকার করেন, কখনও বা কৃষ্ণ বিরহে একান্ত কাতর হইয়া “হা প্রভু—হা প্রাণনাথ” বলিয়া কাদিয়া আকুল হন। এ বিরহ রমণীর পতি-বিরহ অপেক্ষাও ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। ভক্তগণ সে যন্ত্রণা দেখিয়া এবং প্রভুর সেই প্রাণফাটা রোদন শুনিয়া কত সাহসনা প্রদান করেন ; কিন্তু সে বিরহ-বেদনা কি কথার সাহসনায় মোচন হয় ?

এক একদিন উন্মাদ অবস্থায় ভক্তদের অলক্ষিতে প্রভু কোথায় চলিয়া যান ; ভক্তগণ বহু অন্বেষণ করিয়া আবার ধরিয়া আনেন—গৃহাবন্ধ

নদের নিমাই ।

করিয়া রাখিয়া দেন । কিন্তু কতক্ষণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই প্রভু আর গৃহে নাই । প্রভু এতদিন দেশান্তরে ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় নীলাচলে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, নদীয়া হইতে ভক্তগণ তাঁহার দর্শনে আসিলেন । নিত্যানন্দ, মুরারী, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া প্রভু চরণ সমীপে উপস্থিত হইল ; সমস্ত শ্রীপাট হইতে দলে দলে ভক্তগণ প্রভু দর্শনে সমুপস্থিত । কিন্তু কি জানি কেন—আজ তাহাদের প্রাণ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, যেন তাহারা আনন্দের মধ্যে কি এক বিষাদের ছায়া দর্শন করিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছেন । প্রভু আজ কোথায় গিয়াছেন তাহার সন্ধান নাই !

কিছুদিন হইল চৈতন্যের জননী শচীদেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তডীর মৃত্যুর পর, জীলোকের আরাধ্য ধন স্বামীর পাছকা-পূজায় তন্ময় হইয়াছেন ; আহার নিদ্রা তাঁহার এক প্রকার ঘুচিয়া গিয়াছে । স্বামীর মূর্তি গড়িয়া পাছকা দুখানি সম্মুখে রাখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দিবারাত্র মনেপ্রাণে তাঁহারই উপাসনা-ভজনা করিতেছেন । তিনি যে আর বেশী দিন ধরাধামে থাকিবেন না—হই স্বিন্ন জানিয়াছেন ; তাই দেবতাসমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন—প্রভু ! তুমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই যেন আমি ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে পারি । সধবা হইয়া সীমন্তে সিন্দূর লইয়া—তোমার স্বরূপ-মূর্তি হৃদয়ে চিত্তা করিতে করিতে আমার জীবাত্মা যেন তোমার ত্রীচরণে লীন হয় । প্রভু ! রূপায়ন, দাসীর এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিও ।”

ভক্ত বাহ্যাকল্পতরু ভক্তের মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন না ; তাই

নদের নিমাই ।

এক বিষ্ণুপ্রিয়া শবীর ভাবিয়া ভাবিয়া ককালসার হইয়াছে । তথাপি
সে আনন্দময়ী মূর্তি দেখিলে—তাঁহার বদনেব সে প্রফুল্লতা দেখিলে,
ক বলিবে—তাহার শবীর অস্বস্থ হইয়াছে । কে বলিবে—দেবী আজ
দ্রগৎ আধার করিয়া এত শীঘ্র অনন্ত-শয়ন করিবেন ? সেদিন সঙ্গিনীগণ
অনেক বাস্ত্রি অবধি তাঁহার নিকট বসিয়া কত গল্প-গুজব করিল ; দেবীও
সহাস্ত বদনে সকলেব প্রীতি সম্পাদন করিলেন । তারপর তাহারা সকলে
স্ব স্ব গৃহে গমন করিল । অপর গৃহে কেবল একজন মাত্র দাসী নিদ্রিত
বহিল । বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন সময়ে কাহাকেও কাছে লইয়া শুইতেন না ।
পবপুরুষেব মুখদর্শন ত তিনি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন
কেবলমাত্র নিতাইকে পুত্রের মত দেখিতেন । নিতাইও আজ কয়েক
দিন গৃহে নাই , সেও ত পাগল—পাগলের শিষ্য পাগল হইবে না ত কি ?

কোন জ্বীলোককেও তিনি কাছে রাখিতেন না, কারণ তিনিও
অনেক সময় ভাবে বিভোব থাকিতেন । পাছে সে ভাব দেখিয়া ব্যাধির
লক্ষণ ভাবিয়া সঙ্গিনীগণ আকুল হয়—এইজন্য বজনীযোগে শয়নের সময়
তিনি একাকিনীই থাকিতেন । দেবী গৃহে শয়ন করিয়াছেন—তাঁহার
প্রাণ আজ পুলকিত এবং মন পবমানন্দিত । তিনি শয়ন করিয়া স্বামীর
শ্রীচরণ ধ্যানে তন্ময় হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—“প্রভু ! তোমার বিরহ-
বেদনা আর সহ করিতে পারি না, দাসীকে চরণে স্থান দাও—আর কষ্ট
দিও না ।”

প্রাণের ডাক প্রাণের দেবতার কাণে পৌছিল । কষ্টহারী শ্রীমধুসূদন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব-দেহে বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহে উদয় হইয়া বলিলেন—
উঁ, উঠ, প্রাণপ্রিয়া—উঠ চন্দ্রাননি ! শ্রীকৃষ্ণ অবতারে শ্রীরাধারূপে তুমি

নদের নিমাই।

আমার লীলারসে রসময়ী হইয়াছিলে, এ গৌর অবতাবেও তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেই রসে রসিত হইয়া আমার নবদ্বীপ লীলার চবমোংকধ দেখাইলে। দেবী! লীলাবসানের সময় হইয়াছে, তুমি মহাপ্রয়াণ কৰ আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। রজনীযোগে শেষ সন্মিলনে সন্মিলিতা হইয়া সতী অনন্তধামে গমন করিলেন। পরদিন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলে হায় হায় কবিতে লাগিল।

জননী, পত্নী চলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু ব্যথিত অন্তরে শ্রীকৃষ্ণাব-হৃতে পুরীবামে কাশী মিশ্রের বাটীতে আসিলেন। সে সময় বধাকাল, নবদ্বীপের ভক্তগণ আসিয়া প্রভুকে দর্শন কবিল এবং জননীও ও পত্নীও মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। প্রভু “যথা পূৰ্ণং তথা পবং” এই সকল সংবাদ তিনি ইতিপূর্বে মনে প্রাণে জানিয়াছেন, কাজেই সামান্য মগ্নত্বের মত অধীর না হইয়া কিয়ৎক্ষণ সংকীর্ণন কবিলেন, তাবপব দীঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভুব ভাব দেখিয়া ভক্তগণ মনে মনে কোন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু শ্রীমন্দিবে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন, ভক্তগণ ভ্রান্তভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মহাপ্রভু একেবারে মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া উকী খুঁকী মারিতে লাগিলেন। আশা মিটাইয়া যেন শ্রীজগন্নাথদেবের বদন দেখিতে পাইতেছেন না, এইজন্য মন্দিবাস্তব্ধে প্রবেশ কবিবার ইচ্ছা। ইহার পূর্বে কতবার প্রভু জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছেন, কিন্তু কখন মন্দিবে প্রবেশ করেন নাই। আজ প্রভুকে আগ্রহ সহকারে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যাব্বিত চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া প্রভু গল্পডুস্তস্ত কখনও পার হন না,

নদের নিমাই ।

একান্ত আবশ্যক হইলে ঐ স্তম্ভের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয়া চলিয়া যান । আজ প্রভু জগন্নাথের সম্মুখে যাইবার জন্ত ব্যগ্র কেন ? সঙ্গীগণ অন্তরে বিষ্ময় এবং হৃদয়ে উদ্বেগ লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন । প্রভু অগ্রে, ভক্তগণ পশ্চাতে ; প্রভু যেমন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখীন হইয়াছেন, অমনি কি জানি কোন্ দৈবমায়া বলে, সহসা দ্বার আপনি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল । ভক্তগণ আরও বিস্মিতচিত্তে অবাক হইয়া বহির্দিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

সেদিন রবিবার সপ্তমি তিথি—বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর হইয়াছে । চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কলির দেবতা দারুমূর্তি জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি করিতেছেন — ভক্তগণ তাহা দেখিতে পাইতেছেন না । কারণ ইতিমধ্যে দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; বহু চেষ্টায়ও তাহা খোলা যায় নাই । এমন সময় মন্দির মধ্যে অত্যন্ত কলরব হইতে লাগিল, বাহিরে ভক্তগণ মহাবিভ্রত হইয়া পড়িলেন । তবে কি ভিতরে প্রভুর কোনও বিপদ হইল ?

গুপ্তবাড়ীতে একজন পাণ্ডা অবাক হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছিল । প্রভু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সম্মুখে কাতর হৃদয়ে নিবেদন করিতে লাগিলেন । শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে তাঁহার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

সত্য জ্ঞেতা ঘাপর কলিয়ুগ আর ।

বিশেষতঃ কলিয়ুগে সংকীৰ্ত্তন সার ।

কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন ।

কলিয়ুগ আইল এই দেহ ত অরণ ।

নদের নিমাই :

মরি মরি ! অধমতারণ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিতে যাইতেছেন, তথাপি তিনি মর্ত্যবাসীর হৃৎথের কথা ভুলিতে পারেন নাই । পাণ্ডা দেখিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সেই দারুণ পবিত্র মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিলেন । পুরীধাম সকল তীর্থের সার , আজকাল কলের গাড়ী হইয়া সকলেই তথায় গায় বটে, কিন্তু পুরীতীর্থ শেষ তীর্থ । ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মানব না হইলে, এ তীর্থে যথার্থ ফললাভ করিতে পারে না । পুরীতে কিনা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে—ভগবানকে তন্ময়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতে লীন হইতে হইবে । এ মূর্তি শুধু চক্ষে দেখিয়া আসিয়া আবার গৃহে ফিরিয়া যাহারা পুনরায় পাপ কক্ষে মত্ত হয়—তাহাদের পক্ষে পুরী যাওয়া না যাওয়া দুই-ই গমান । ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্তির মধ্যে লীন হইয়া গেলেন । পাণ্ডাঠাকুর প্রভুকে চিনিয়াছিলেন, হটাৎ দুই মূর্তি এক হইয়া যাওয়ায়, তিনি ভীষণ ভাবে গোলমাল করিয়া উঠিলেন—চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । এরূপ অপূর্ব ব্যাপার তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই : কি সৌভাগ্যবলে যে তাঁহার আজ এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে মানব-চক্ষের সার্থকতা লাভ হইল—তাহা ভগবানই জানেন । তিনি আবেগভরে চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ।

ভক্তগণ এতক্ষণ বাহিরেই ছিলেন, কিন্তু মন্দির মধ্যে কলরব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন । পাণ্ডা দ্বার খুলিয়া দিলে, ভক্তগণ তাহাদের হৃদয়ের দেবতা—প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে মন্দির মধ্যে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“প্রভু কোথায় গেলেন ?”

নদের নিমাই ।

পাণ্ডা যথাযথ বর্ণনা করিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। ভক্তগণ আশ্চর্য্যভাবে শ্রীমূর্তিপানে চাহিয়া দেখিলেন—যেন জগন্নাথদেব চৈতন্ত-সম্মিলনে মাধুর্য্যময়, অপূৰ্ণ-অব্যক্ত ভাবময় এবং অপৰূপ লাবণ্যময় হইয়া মুহু মুহু হাস্য করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর লীলা সম্বরণের ব্যাপার দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল, কেহ চৈতন্ত-বিরহে অচৈতন্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন কোন ভক্তের আর চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল না, তাঁহারা চৈতন্তের সহগামী হইয়া মর্ত্যের মায়া-মমতা কাটাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন। যাহাদের কিছুক্ষণ পরে চৈতন্ত সঞ্চার হইল—তাঁহারা শোকদুঃখে হাহাকার করতঃ সেইদিন নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে গমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে নিতাই, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। নবদ্বীপে আর কেহ নাই; প্রভুর জননী এবং পত্নী পূৰ্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, প্রভুও সকলকে কাঁকী দিয়া চলিয়া গেলেন; তবে আর কিসেব জন্ত গৃহবাস? এখন প্রভুর নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তাঁহারা প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

“ভজ গোরাক্ষ, কহ গোরাক্ষ, লহ গোরাক্ষের নাম।

যে ভজে গোরাক্ষ চক্রে সেই আমার প্রাণ।”

এই বলিয়া প্রেমময় গৌর-হরির মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহাদের হৃদয়ের ধনকে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্ত ভারতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫০৩ খ্রষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ-লীলা সম্বরণ করেন।

নদের নিমাই ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য লীলা-মাধুর্য্য সম্যকরূপে প্রকাশ করা আমার মত সংসারাসক্ত অজ্ঞ লেখকের পক্ষে অসাধ্য ত বটেই, উপবৃত্ত বথার্থ ভক্ত হইলেও সেই লীলারস প্রকাশ কবিত্তে যাইয়া ভাবাবেশে এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, বলিতে বলিতে জড়জিহ্বা জড়াইয়া যায়, ভাবেব উচ্চাসে কণ্ঠ অবশ হইয়া পড়ে । সুতরাং তাঁহার পক্ষেও এ মধুব লীলা প্রকাশ করা অসম্ভব । সাক্ষাৎ গোলোকেব ত্রি চৈতন্যরূপ ধরিয়া প্রেম-ভক্তির আধার, অমিয়-মধুব হবিনাম আনিয়া ধবে ঘরে—নগরে নগরে বিলাইয়া গিয়াছেন । সেই হৃদয়োন্মাদকব, কলিকলুষ-নাশন নাম রসনায় উচ্চারণ করিলে, মনেপ্রাণে শান্তির সুধাধারা বর্ষিত হয় । ক্ষণকালের জন্ত সমস্ত ভয়-ভাবনা, বিষয়-বেদনা ভুলিয়া চিত্ত শান্তি-সাগরে অবগাহন করে, সর্কাদে এক অপূর্ব তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া অসীম ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান করে । তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—তাঁহার সমগ্র উপদেশ সম্যকভাবে উপলব্ধি কবিত্তে পারিলে, মাহুখ নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিতে পারে । হরিনামেব মাহাত্ম্য যে কিরূপ এবং সংখ্যায় কত, তাহা বলিবার সাধ্য কাহাবও নাই । এক হরিনামের মাহাত্ম্যই যখন অসংখ্য, চতুরানন চতুশ্মুখে, পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণনা করিতে অক্ষম, তখন বহু সংখ্যক নামেব মাহাত্ম্য আমরা কলির নারকী-জীব হইয়া কি বলিব ? তবে তিনি নাম গানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন । যখন আমরা বিষয়-বিষে জঞ্জরিত হইয়া—পাপের যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া, দুঃখ-দারিদ্র্যে মগ্নহত হইয়া একেবারে হুতমান হইয়া পড়ি, তখন মহাপ্রভুই শান্তির আশ্বাস বাণী দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—“নাম গান করিও, তবে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না ;

নদের নিমাই ।

ইহা সংসারের সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভের মহা মহৌষধ !”
এস ভাই । আমরা হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মনপ্রাণ নিঃশল করিয়া বলি—
হরি হরিবোল ; বদন ভরিয়া বলি—হরি হারিবোল, প্রেমে বিগলিত
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি—ভুবন মঙ্গল হবিবোল । ভক্তের কাতর ক্রন্দন
এককটাহ ভেদ করিয়া ভক্তাধীনের চরণতলে পৌছিলে, ভবের কোনও
ভাবনা—কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে না । পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ ভাণ্ডারে
ভক্তের জগ্ন সকলই পূর্ণভাবে অবাস্থত ; বাহ্যকল্পতক তোমাদের
সকল সাধ পূর্ণ করিয়া শাস্ত শান্তি প্রদান করিবেন । এস,
ভাব-বিভোর চিন্তে বলি :—

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদঃ পূর্ণাং পূর্ণ মুদচ্যতে ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিত্যতে ॥

অনেকে বলেন—মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা
করিয়াছিলেন । তিনি যে কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া “হা কৃষ্ণ,
হা প্রাণকান্ত” বলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; নীলাম্বু দেখিয়া যে প্রভুর
নীলকান্তকে মনে পড়িয়াছিল এবং সেই অনন্ত পয়োদী মধ্যে তিনি
যে তাঁহার হৃদয়-দেবতার অস্তিত্ব দেখিয়া অজ্ঞানের মত—“পশামীদেবাং
তব দেবদেহে—” বলিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন—সে কথা কেহ বুঝে না ;
তাই তাহারা সমুদ্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া নিবৃত্ত করেন । কিন্তু
তাহা সত্য নহে ; জগন্নাথে লীন হইয়া যাওয়াই শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কথা ।
সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জীবকে তিনি দেখাইলেন যে, কৃষ্ণ-বিরহে এইরূপ
আত্মহার্য হইতে না পারিলে, প্রাণেশ্বরের জন্য জীবনকে এইরূপ তুচ্ছ
করিতে না শিখিলে—শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ অসম্ভব !

নদের নিমাই ।

সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার কয়েক দণ্ড পরে তাঁহার মৃতবৎ অচেতন্য দেহ গাঁববেব জালে উঠিয়াছিল । ভক্তগণ তাঁহার অচেতনতাবস্থা কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন করিয়া অপনোদন কাব্যাছিলেন ।

হাতপূর্বে একদিন কোনও এক সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম— কোন এক অভক্ত-পাষণ্ড শাস্ত্র পাঠ না কবিয়া, প্রভুকে “Insane পাগল” এবং তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল, কাজেই “চেতন্ত আবার অবতাব ‘কসে’ বলিয়া ভুবনপাশ্বন শচীনন্দনকে বৃথা আক্রমণ করিয়া আপনার নিকরুজ্জিতাব পবিচয় দিয়াছে । আচ্ছা, প্রভু যদি জলে ডুবিয়াই মরিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবতার অথবা মহাপুরুষ হইতে পাবেন না কেন—তাহার কারণ কি ? আমরা সংসারের ক্রিম-কীট, মৃত্যুর তাল-মন্দ আমাদেরই দবকার, কারণ তাহা না হইলে মৃত্যুব পব লোকে টিটিকাবী মাৰিখা বলিবে—“দেখেছ, বেটা কি অধার্মিকই ছিল, মৃত্যুর সময় কত যত্নপা পাইয়া মবিল ।” এইজন্তু কথায় কথায় আমবা বলিয়া থাকি—“জপতপ কব কি, ম’রতে জানলে হয় ।” মৃত্যুব তাল-মন্দ আমাদেরই দবকাব, কিন্তু ষাঁহাবা জীবন বা মৃত্যু বলিয়া কোমও অবস্থাকেই ভয় কবেন না—জীবন বা মৃত্যুকে ষাঁহাবা অবস্থান্তর বলিয়া মনে কবেন, ষাঁহাবা জানেন—আত্মা অজব-অমর, তাঁহারা এই পঞ্চভৌতিক দেহ নাশের জন্ত এত ভাবনা করিবে কেন ? ইহা ত যেক্সপে হউক পঞ্চভূতে মিশিবেই । আচ্ছা, যদি শ্রীচেতন্যের মৃত্যু ঐক্সপেই হইয়া থাকে এবং তাহা যদি অপঘাতই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণেব মৃত্যুকে আমরা কি বলিব ? তিনি ত জরা ব্যাধ কর্তৃক বাণবিক হইয়া প্রভাসতীর্থের তীরে লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন,

নদের নিমাই :

তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুও ত পরম অপঘাত এবং তাঁহাকেও তাহা হইলে “শ্রীকৃষ্ণ ভগবানস্বয়ং” এই আখ্যা না দিয়া, অবতারত্ব হইতে খাবিজ করিয়া দিতে হয়। এই ত গেল শ্রীকৃষ্ণেব মৃত্যুর কথা।

যেদিন দক্ষিণেশ্ববেব কালীবাড়ীতে ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব Cancer হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছিলেন ? আধুনিক যুগে অমন মহাপুরুষ আর কেহ জন্মায় নাই, মৃত্যুব প্রাকালে ভক্তগণ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঠাকুর! আপনাব একপ কষ্টদায়ক মৃত্যু কেন হইতেছে ?”

তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—“বষ্ট কিসেব বাবা! আমি ত ব্রহ্মময়ীৰ কোলে শুইয়া আছি, এ চিবশাস্তিময় কোলে যন্ত্রণা কোথায় ? তোমরা নাকি জগতেব লোক, যন্ত্রণা-আরামেব একত্ব বুঝ না, তাই দেখিতেছ—আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। কিন্তু বাবা, মৃত্যুজনিত আমার কোন যন্ত্রণা নাই।”

আমরা অনেক মহাপুরুষেব এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং অপমৃত্যুর কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের যায় আসে কি ? তাঁহারা ত জাগতিক লোকের স্নানাম-দুর্গাম, কেহ ভার্ণ বলিবে কি মন্দ বলিবে, ইত্যাদির ভয় করেন না, তবে আমাদের কথায় তাঁহাদের যায় আসে কি ? কিন্তু সামান্য লোকের মুখে মহাপ্রভুর নিন্দাসূচক এই সকল অযাচিত গালাগালির বিষয় পাঠ করিয়া প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণে তাহার কথার দুই একটী প্রতিবাদ করিলাম মাত্র। নরকের কীট হইয়া অবতার-চরিত্রের দোষ দর্শন করা নিতান্ত অর্কচাচিনতার কার্য; মহতের সকলি মহৎ জ্ঞান

নদের নিমাই।

করিয়া তাঁহার মহত্বের অনুসরণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যাহা জানি না
বা বুঝি না, তাহার আন্দোলন না করিলে আর কোন দোষ
পাইতে হয় না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অবতারে সন্দেহ ।

ভগবানের দশ অবতাবেষ মধ্যে শ্রীচৈতন্যের নাম নাই বলিয়া অনেকে তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ করেন, বলেন—“শ্রীচৈতন্য অবতার নহেন, একজন মহাভক্ত ।” দশ অবতারের মধ্যে মহাপ্রভুর নাম নাই বলিয়া যে তাঁহাকে অবতার বলিয়া ধরা হইবে না, ইহার কোন কারণ দেখি না । এখানে প্রমাণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতাবে নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি ভক্তশিরোমণী শ্রীরাধার প্রেমঞ্জন পরিশোধ করিবার জন্য, নব বৃন্দাবন নদীয়ায় নব অবতার গৌরাক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । একাধারে রাধাশ্যাম রূপ ধরিয়া কলির জীবের উদ্ধার জন্য হরিনাম বিতরণ করিবেন । নিমজ্জমান বৈষ্ণবধর্মকে প্রবল করিয়া সরল মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন—ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী ; আমরা নানা পুরাণ ও সংহিতায় দেখিতে পাই । তারপর “অবতারাঙ্কসংখ্যয়া” শ্রীভাগবৎ হইতেও আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতার না হইলে সাধারণ জীবের বা মহাপুরুষের এত শক্তি কখন থাকিতে পারে না । একজন দেহধারী সামান্য মানব সমগ্র দেশকে তথা পৃথিবীকে এমন করিয়া মাতাইতে পারে না ।

শ্রীশ্রীগৌরাক্ষ প্রভু যখন প্রকটাবস্থায় সশরীরে বর্তমান, সেই সময়

নদের নিমাই ।

হইতেই তাঁহাব শ্রীমূর্তি বিগ্রহরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে । উ'ডগ্ৰা প্রভৃতি দেশে গোবাক্ষ বিগ্রহের পুজার বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হয় । আব হসিং পুবাণ, ভবিষ্য পুবাণ, কুর্খ, দেবী, বামন, শিব প্রভৃতি পুবাণে শ্রীগোবাক্ষের অবতার সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়, অথর্ববেদেও মহাপ্রভুব অবতার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে । কুলার্ণব, বদ্র্যামল, বিশ্বাসাব প্রভৃতি তন্ত্রও বহু প্রমাণে ভগবান শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করিতেছেন । এই সকল শাস্ত্রে তাঁহাব ধ্যান, মন্ত্র, স্তব ও কবচ পাঠ করিয়া কে বলিতে সাহস করিবে যে শ্রীমন্নৃসিংহ প্রভু অবতার নহেন ? ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া যাহা কবিতা থাকেন—যে কার্যোদ্ধারের জন্য নারায়ণের অবতার গ্রহণ হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যে তাহার কিছুই অপ্রতুলতা নাই । সাধুগণের পবিত্রাণ, দুৰুতি নাশ, ধর্ম সংস্থাপন প্রভৃতি অবতার গ্রহণেব যাহা উদ্দেশ্য—শ্রীচৈতন্য অবতাবে তাহাব কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণ অবতাবেব সহিত গৌরাক্ষ অবতারেব অনেক সাদৃশ্য বর্তমান । তিনি মুসলমানের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন । সাধু ভক্তগণেব উদ্ধার সাধন করিয়া জগাই-মাধাই প্রভৃতি পাশুগণকে প্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়া ধর্মের পথে আনয়ন করিয়া যে মহত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যকে অবতার না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না । তিনি যে শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার, সে বিষয়ে সন্দেহ কবিতাব কিছুই নাই ।

ভাবতের তখন কি ছদ্দিন । হিন্দু-বাক্ষত্বের অবসান—কালের কুটিল চক্রে জীব সমুদয় শ্রীভগবানের মধুর তত্ত্ব ভুলিয়া দারুণ দুঃখসাগরে নিমজ্জমান ! ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, জীব পথহারা

নদের নিমাই !

পথিকের মত দিগভ্রান্ত, তর্কেব শুষ্ক জঞ্জালজালে আবদ্ধ হইয়া মানব-
তখন উচ্ছ্বল, বিকৃত মস্তিষ্ক দেশবাসীর প্রতি মুসলমানগণের প্রবল
আকর্ষণ, যবন-ধর্মী করিবার জন্য কাজীর ভীষণ আক্রমণে হিন্দু-সমাজ
যবন ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতেছিল, ধর্মভীরু হিন্দুগণ যখন দিশহারা, কিংকর্তব্য-
বিমুঢ় হইয়া দুঃখ-সাগরের অতল জলে পড়িয়া তলাইয়া যাইবার উপক্রম
করিতেছিল—ঠিক সেই দারুণ দুর্গতির অবস্থায় বেদপ্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-
ধর্মের সাধন-ভজন জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিবার জন্য, করুণাময়
শ্রীভগবান শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর
অভয় আশ্বাস-বাণী শুনিয়া কাতর-প্রাণ জীবসকল নবজীবনে নববলে
বলীয়ান হইয়া, এককালে সমস্ত কষ্ট-কঠোরতা বিস্মৃত হইয়া আনন্দে
মাতিয়া উঠিল। সকল জালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া তাঁহারই ছায়া শীতল, অমল
ধবল পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জুড়াইল, ওষ্ঠাগত তাপিত প্রাণ শীতল
কবিল। পতিতপাবন দীনতারণ গোরবরণ গৌরাদ্বেদ ভক্তগণকে বুকে
ধরিয়া প্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়া বাললেন—“জীব ! তোমাদিগকে যোগ-যোগ,
ধ্যান-ধারণা, ব্রত-উপাসনা প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না ; কৃচ্ছ্র-সাধ্য
কোন তপস্যার আবশ্যক নাই, কেবল প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া
উচ্চৈঃস্বরে বল—হরি হরি বোল ! আমি তোমাদের সকল কষ্ট নষ্ট
করিবার জন্য—মর্ত্যভুবনে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য,
এই ভুবনমঙ্গল হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। নামে জাতিভেদ নাই,
পণ্ডিত-মুর্থ নাই, পাণী-তাপী নাই, সক্ষম-অক্ষম নাই, ধনী-দরিদ্র বিচার
করিতে হইবে না। সকলেই আইস—এই পবিত্র প্রেম-নীরে অবগাহন
করিয়া পবিত্র হৃদয়ে একবার নামগান কর, মনের সমস্ত ময়লা মাটি

নদের নিমাই ।

বিধোত হইবে—তোমাদিগকে নিম্পাপ কবিয়া মুক্তি-পথের পথিক কবিয়া দিবে । ভগবানেব এই অভয় বাণী শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে তাঁহার চরণ সরোজে আশ্রয় লইয়া ধন্য হইল । হবিনামেব বিজয় রোলে নদীয়ার গগন-পবন মুখবিত করিয়া আপনি উদ্ধার হইল এবং যাহাকে দেখিল—তাহাকেই সেই জীবনসঞ্চল হরিশ্ৰবনি করিতে বলিয়া নিম্পাপ হইবাব পন্থা দেখাইয়া দিল ।

শ্রীগোরাঙ্গ গোড়ের নিজস্ব অবতার ; শ্রীগোবাক্ষ অবতারের জন্য বাঙ্গালা দেশ ধন্য ও ববেণ্য হইয়া গিয়াছে । অন্যান্য অবতার হিন্দুর নিজস্ব হইলেও, ইষ্ট-ঈশ্বর অবতারেব জন্য বঙ্গ দেশ যত গৌরব করিতে পাবিবে—তত আর কোন অবতারের জন্য পাবিবে না । শ্রীচৈতন্যেব অবতারে—তাই বাঙ্গালাব বঙ্গ এত পবিত্র এবং বাঙ্গালী এত বুদ্ধিজীবী ও মেধা সম্পন্ন । তাঁহারাই পদাঙ্ক অনুসরণ কবিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাধনে এত ধনবান—গীক্ষাশুণে এত গুণবান , এইজন্য বাঙ্গালী বিদ্যা-বিভবে এত বৈভবশালী ! আয্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত-মেধাবী-মনীষী বুলি বাঙ্গালাব মত অধুনা আর কোথাও জন্মে নাই ।

শ্রীচৈতন্য যে অবতাব—ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় । তাহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা বলিয়া সে বিষয়ে ক্লাম্ব রহিলাম । ভগবান শ্রীচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন—কলির জীবের পক্ষে ক্লম্ব-সাধ্য সাধনার আবশ্যক নাই ; কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তনই ভব-বন্ধন মুক্তির প্রধান উপায় !

সময় থাক আর নাই থাক, ওচি হও আর নাই হও, যখন তখন

নদের নিমাই ।

হেলায় বা অশ্রুধারও নাম করিও । নামের একটা মাহাত্ম্য আছে—
একটা পবিত্রকারিণী, জীবনিস্তারিণী শক্তি আছে ; নাম করিতে করিতে,
রসনায় এই মধুর হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবের এমন একটা
অবস্থা আপনাপনি আসিবে—যখন বিষয় বিষ বোধ হইবে—অহঙ্কার-
অভিমান দূরে পালাইবে, সর্বজীবে সমজ্ঞান হইয়া হৃদয়ে ব্রহ্মভাবের
উদয় হইয়া আপন-পর ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইবে । তখন কৃষ্ণময় অগৎ
দেখিয়া জীব “শিবোহং শিবোহং” বলিয়া ভাবে বিভোর হইয়া
আত্মানন্দ উপভোগ করিবে !

হরিনাম সাধকের প্রধান কর্তব্য । নামে রুচি, জীবে দয়া এবং
সাধুসঙ্গ করিতে পারিলেই, পরকাল-নিস্তারের আর কোনও ভাবনা
থাকিবে না । তাই প্রভু আপনা ভুলিয়া দিশাহারা হইয়া পাগলের মত
নামগানে বিভোর হইতেন ; জাতীয়তা ভুলিয়া সর্বজীবে কোল দিতেন
—সকলের সন্তাপ নাশের জন্ত প্রাণপণ করিতেও ছাড়িতেন না ।
আব সাধুসঙ্গ ত তাঁহার নিত্যকন্ম ছিল ; প্রতিদিন শ্রীবাস, অশ্বৈত
শ্রুতিবির আদ্বিনায় সাধুগণ সঙ্গে নানারঙ্গে কীর্তন করিয়া মূচ্ছিত হইয়া
পড়িতেন এবং নাম যে নামী অপেক্ষাও মহৎ—তাই দেখাইবার জন্ত
আবার নাম শুনিয়াই চৈতন্য লাভ করিতেন । প্রভুর এমন মধুর চরিত্র,
তাঁহার এমন পরকীয়া প্রেম—তাঁহার আপনাবাবা হইয়া এমন নাম
সংকীর্তন—বাক্যলী ! তুমি মনেপ্রাণে অঙ্কিত কর—তাহা হইলে আর
জীবনে কোন ভয়-ভাবনা থাকিবে না , অবহেলায় ভবের ভাবনা
এড়াইয়া অস্ত্রে ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদে লীন হইয়া জীবনের সকল
আলা জুড়াইবে ।

নদের নিম্নাই :

ভক্তগণ তাই এখনও ডাকিয়া ডাকিয়া গাহিয়া থাকেন :—

কীর্তন ।

ওকে পাগলের পারা হ'য়ে দিশে হারা
সুবধনী কুল দিয়ে যায় ।

আয় আয় বলি দিয়ে করতালি
বলে—যত বোঝা আছে নিয়ে আয় ॥

কৈদে কৈদে বুঝি আঁখি রাক্ষা রাক্ষা,
ডেকে ডেকে বুঝি গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
গোরা গোরা বলে নাচে বাহ তুলে
ক্ষণেকে চেতন ক্ষণে হারায় ।

ধূলি মাখা গায় খেই খেই নাচে,
হাসে কভু কভু বৈদে প্রেম যাচে,
বলে—ভয় নাই এল রে কানাই
বলাইয়ের সাথে নদীয়ায় ॥

সুধাব না কাবেও জাতি নাম ধাম,
লব পাপ তাপ দিব হরিনাম,
গোলকেব ধন তোদেরই কারণ
বিলাতে এনেছি নদীয়ায় ।

আয় আয় তোরা চোখে দেখিবি বে,
জগন্নাথ আজ ফেবে ছারে ছারে,
আয় হরি ব'লে ফেরাবি রে তাঁবে
হরি হবি হরি বল সবাই ॥

পরিশিষ্ট ।

আমাদের পুস্তক শেষ হইল। ত্রীচৈতন্যের জীবনের কথা শেষ করিবার পূর্বে আমাদের দুই একটা কথা বলিবার আছে। আজকাল গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ শিব ও শক্তির প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ যত বিদ্বেষী, শাক্তগণ তত নহেন। শক্তির প্রতি বিদ্বেষ করিয়া অনেকানেক বৈষ্ণব মহাপ্রভু “কাটা” না বলিয়া “বনান” বলেন, কারণ শক্তির নিকট পশু ছেদন হয় বলিয়া তাহারা বিদ্বেষ ভাবে ঐ কথা বলিয়া থাকেন। এক্ষণে ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শক্তি ও শিব-বিদ্বেষী ছিলেন না, তদ্বিশেষে কয়েকটা প্রমাণ দেখাইয়া আমরা এই পুস্তকের উপসংহার করিব।

শাক্তেরা বৈষ্ণবের প্রতি তত ঘেঁষ করেন না, যত বৈষ্ণবেরা শাক্তের প্রতি করিয়া থাকেন। উপরে একথা বলা হইয়াছে। সকল দ্বিজ-জাতিই সংস্কারানুসারে শাক্ত হইয়াও বিষ্ণুপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। যে দ্বিজ বিষ্ণুপূজায় বিরত, সে দ্বিজ নামের অযোগ্য; কারণ, বিষ্ণুপূজাই দ্বিজত্বের লক্ষণ। অনেক শাক্ত-সাধক প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন :—“মন ক’র না ঘেঁষাঘেঁষী, যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।” কিন্তু বৈষ্ণবগণের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ-বিহীন সঙ্গীত একটাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা যতদূর অল্পসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শক্তি ও শিব-বিদ্বেষী ছিলেন না; পরন্তু তিনি বিশিষ্টরূপে

নদের নিমাই ।

তাহাদের ভক্ত ছিলেন । চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার , যিনি পূর্ণ তাহাতে বিদ্বৎভাব থাকিতে পাবে না । তিনি শ্রীরাধার জন্যই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তারপর জীৱ, পুংস্ব প্রত্যেক জীবেরই বর্তমান , নতুবা জীবদেহ গঠিতই হইতে পাবে না । এমত অবস্থায় শচীনন্দন চৈতন্যদেব যে শক্তি মানিতেন না, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আগে জননী—তাবপব জনক , আগে জননীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমে জীব জীবিত ও পবিত্রীকৃত হয়—তারপর পিতার আদব-ভালবাসায় পবিত্রীকৃত লাভ করে । এ অবস্থায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শক্তি মানিতেন না—তাহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । শ্রীগোরাঙ্গদেবের লীলা ও চরিত্র সম্বলিত যেসকল পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ কবিত্বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহা পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যদেবকে কখনই শিব ও শক্তিদেবী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না । শ্রীগোরাঙ্গের দেহে সকল দেবতারই আবির্ভাব হইত ; রাধাভাব ত ক্ষণে ক্ষণেই হইত, কিন্তু তাহাতে যে মাতৃভাবেরও আবেশ হইত—চৈতন্যভাগবতে তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । একদিন প্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্নের গৃহে তাঁহার দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল । সেই বিষয় চৈতন্যভাগবত গাহিতেছেন :—

জগৎ জননীভাবে নাচে বিম্বস্তর ।

সময় উচিত গীত গায় অম্বুচর ।

আম্বাশক্তিবশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ ।

স্বখে দেখে তাঁর যত চরণের ভঙ্গ ॥

নদের নিমাই ।

প্রভু আজ আত্মশক্তি মহামায়া রূপে সিংহাসনে সমাসীন ; আর ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রভুব আত্মশক্তি জগজ্জননী রূপেব নিকট করখোড়ে দণ্ডায়মান । ইহাতে প্রভুকে আমবা শক্তিদেবী বলিব—না, শাক্ত-ভক্ত বলিব ? তাবপব তাঁহার শিবভক্তিব প্রমাণ এই :—প্রভু যখন ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে গমন কবিয়াছিলেন—পথে শ্রীভুবনেশ্বর দেবেব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভগবান ৩তনাতকে ভুলুষ্ঠিত হইয়া প্রণাম কবিয়াছিলেন :—

নিপত্য ভূমৌ প্রণমাম দেবঃ শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ম্ ।

পরাদিন প্রভু ভগবান সদাশিবের স্তব পাঠ করিয়া পূজা করিলেন , ৩বনেশ্বরেব সেবাইতগণ তাঁহাকে গন্ধমালা দ্বারা স্ত্রশোভিত করিলেন । প্রভু বিন্দু-সবোবরে স্নান করিয়া মনে মনে মহাদেবেব মহাপ্রসাদ ভোজনের চিন্তা কবিবামাত্র, পাণ্ডাগণ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া দিলেন । চৈতন্যদেব সেই অমৃতময় মহাপ্রসাদ সহচরগণের সহিত ভোজন করিলেন । ইহাতে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিব বা শক্তির বিদেষী ছিলেন না ।

“ভক্ত হ’তে হ’লে আগে শাক্ত হ’তে হয় ।” তবে শাক্ত মানে—, কেবল মন্ত-মাংসের প্রিয় অনাচারী শাক্ত নহে ; আর জাতি হারাইয়া যে কোন জাতীয় একটা বৈষ্ণবী সঙ্গী করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না । যে প্রকৃত ভক্ত—সেই শাক্ত । শক্তি না পাইলে ভক্তিতে হৃদয় ভরিবে কোথা হইতে ? মা যে বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন, এইজন্য তাঁহার নাম—“বিষ্ণুভক্তিপ্রদা” । আর বৈষ্ণব-ভাব সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ ।

নদের নিমাই ।

যে কোন উপাসক হউন না কেন—নদী যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া একমাত্র সাগবেই আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ সকল উপাসকই শেষে নিকাম ব্রহ্মভাবে ভাবক হইয়া বৈষ্ণব ভাবযুক্ত না হইলে, সাত্ত্বিক ভাবে অনুপ্রানিত হইয়া জগৎ ব্রহ্মময় না দেখিলে মুক্তি-পথের পথিক হইতে পাবে না। তুমি শাক্তই হও, বৈষ্ণবই হও আর শৈব গানপত্যই হও—জীবের শেষ ভাব বৈষ্ণবভাব। শেষে এই ভাব সাধক মাঝেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন বা এই ভাবের ভাবক হইয়া থাকেন, নতুবা মুক্তিব অস্ত্র উপায় নাই। যে শাক্ত—সেই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব—সেই শাক্ত। শিবের গুরু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণের গুরু—শিব।

ভগবান চৈতন্যদেব সৰ্ব্বভ্যাগী সন্ন্যাসী, সতত ভক্তিতাবেই বিভোর থাকিতেন, এইজন্য সকল বিধিনিষেধের অতীত হইয়া তিনি কখন কি করিতেন, তাহাব স্থিরতা ছিল না। তিনি সমাজ বহির্ভূত অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাই বলিয়া সকল বৈষ্ণবই যে তাঁহার কার্যের অনুকরণ করিবেন—তাহা হইতে পারে না। ভগবান অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহা করিবেন, আর একজন সামান্য অধিকারীও তাহা কবিবে—ইহা কখনও সম্ভব নহে। এইজন্য স্বর্গ রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান শিষ্য হইলেও সমাজ-বন্ধনের জন্য তিনি সেই সময় হইতে বহু স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। যাহা অস্ত্রাবধি আমাদের সমাজে প্রচলিত হইয়া সমাজ-বন্ধন অটুট রাখিয়াছে।

আজ চৈতন্যদেব নাই, তিনি দেশকে প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া লীলাবসান কবিয়াছেন। আছে তাঁহার তত্ত্ব প্রেমোমস্ত বৈষ্ণবগণ, আছে তাঁহার সাধের লীলাক্ষেত্র গোড়দেশ; যাহার প্রত্যেক

নদের নিমাই ।

খলিকণা তাঁহার পবিত্র পদরঞ্জে পবিত্রীকৃত হইয়া স্বর্গের স্বমুখামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে । বৈষ্ণবগণ এখনও তাঁহার স্বমুখামণ্ডিত প্রেমময় হবিনাম গাহিয়া তাঁহারাই প্রেমভাবে উন্নত হইয়া সংকীৰ্ত্তনান্দে দেশ মাতাইতেছেন । গোরাঙ্গের প্রচারিত সে নামগান প্রকৃত ভক্তের কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া যখন পানী-তাপীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়—যখনই সেই মধুর নাম শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তকস্পর্শ করে, তখনই জীব কি এক সু-মনন উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক কবে—কি এক তীব্র প্রেমভরঞ্জে স্নাত হইয়া প্রাণ মন পবিত্র করে, তাহা লেখনী দ্বারা বিবৃত করা অসম্ভব ।

আমরা কয়েকজন সাধক-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর মুখে প্রভুর লীলা-রহস্য, তাঁহার অবতার তত্ত্ব ও প্রাণমন বিমোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাহার প্রকৃত মুক্ত-পুরুষ ; প্রকৃত বৈষ্ণবতাব তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন । বৈষ্ণবতাব যে জীবের তুরীয় অবস্থা এবং মুক্তির উপায়—তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব তাহার সেবা-ধর্মের অহুরাগী এবং ত্যাগী ; তাঁহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান নাই । আর যাহারা কেবল কথায় বৈষ্ণব—জাতিতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, তাহারাই সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর ।

ঐচ্ছৈতন্য লীলা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শিখিয়াইয়া গিয়াছেন—জীব মাঝেই শিব, সকলেই এক অভেদাত্মা ; কাহারও মধ্যে কিছু পার্থক্য নাই । আত্মাশক্তি জগতের মাতা এবং আমিই ব্রহ্মপরাংপর জগতের পিতা । লীলা বিস্তারের জন্য—জীবের উদ্ধারের জন্য, সময়ে সময়ে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । আমি ছাড়া

নদের নিমাই ।

জগতে কিছু নাই ; এই মায়ীক জগতে শক্তির রূপে আমারই বিকাশ ।
অতএব—

সৰ্বধন্য পৰিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষায়াম্যমি মা শুচঃ ॥

ভাই সকল ! ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব কলীর জীবের মুক্তির জন্য—
অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভের
জন্য বলিয়া গিয়াছেন—“জীব ! কোন চিন্তা করিও না, পবকালের সম্বল
হরিশ্রবণ করিয়া আনন্দে মত্ত হও—সাত্বিকভাবে কেবল হরিনামে প্রাণ
মোহিত কর, তাহা হইলে উদ্ধারের জন্য কোন ভাবনা করিতে হইবে
না । কলির জীব । অক্ষম অল্লস্য বলিয়া তোমাদের ভাবনার কোন
কারণ নাই । যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বা ব্যয় সাপেক্ষ
কোন অক্লান্তানের আবশ্যক নাই ; কেবল নাম কর—কেবল নামগানে
চিন্তা সংযোগ কর । একমাত্র নামই তোমাদিগকে সকল পাপ-তাপ বন্ধন,
হইতে পরিমুক্ত করিয়া, তোমাদের অভিপ্সিত মোক্ষধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া
গিয়া সকল কুণ্ঠাব হস্ত হস্তে মুক্ত দান করিবে । প্রভু আমাদিগকে
প্রাণেব আবেগে নাম গান কবিত্তে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—ইহা ঘেন
আমরা কখনও বিস্মৃত না হই । ও শান্তি, ও শান্তি, শান্তিরেব শান্তি ।

ও যদক্ষব পরিল্লষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ ।

পূর্ণং ভবতু তৎসৰ্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

সমাপ্ত ।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উপাদেয় গ্রন্থসমূহ ।

১।	উপক্ৰাস গ্রন্থাবলী (একত্রে ৮ খানি বৃহৎ পুস্তক)	-	২৥০
২।	মোহিনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	১৥০
৩।	বানাক্ষেপা (তৃতীয় সংস্করণ)	-	২১
৪।	দরাক-খাঁ	-	১৥০
৫।	বামপ্রসাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	২১
৬।	তুলসীদাস	-	৩১
৭।	বর্ণাশ্রম (চতুর্থ সংস্করণ)	-	২১
৮।	সংসার-চক্র	-	২১
৯।	সতীকাহিনী	-	১৥০
১০।	মেয়েলী-বাবব্রত	-	৮০
১১।	বন্ধন-মুক্তি	-	১৥০
১২।	পীরেব-আস্তানা	-	১৥০
১৩।	পঞ্চরত্ন	-	১৥০
১৪।	নষ্টচরিত্র	-	২১
১৫।	সতীব-চিতা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	১৫০
১৬।	অভাগিনী	-	১১
১৭।	শক্তি-সাধনা	-	২৥০
১৮।	মায়াব-খেলা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	-	১৥০

প্রাপ্তিস্থান—দুর্গাদাস লাইব্রেরী ।

১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ।

জনপ্রিয় স্নলেখক

শ্রীমোহিত গোপাল লাহিড়ী প্রণীত

দুইখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস ।

লোকারণ্য - ১৥০

লোকারণ্য—দ্বিতীয় সংস্করণ, স্তব্ধ ৭৭ গ্রন্থ ।

কুল-লক্ষ্মী - ২৥০

কুল-লক্ষ্মী—বঙ্গনারীর লক্ষ্মীমূর্তি, গৃহে গৃহে রাখিবার

উৎকৃষ্ট জিনিষ । প্রায় ফুরাইয়া আসিল ।

দুইখানি পুস্তক একত্রে মূল্য তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী ।

১০৫ নং পঞ্চাননভলা রোড, হাওড়া ।

বসুমতী সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত

তুযানল - - - - ১৥০

বিধুরা - - - - ৥০

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত

চিতোর গৌরব - - - ৥০

নদের পাগল (নাটক) - - ৥০

শ্রীব্রজ মোহন দাস প্রণীত

বেইমান - - - - ৥০

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, প্রণীত

আসমানের ফুল - - - ৥০

ডাক্তার সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(হোমিওপ্যাথিক শিকার চূড়ান্ত পুস্তক (দুই খণ্ড একত্রে)

হোমিও গীতি - - - ৥০

আমার অশ্রুমালা (সচিত্র কাব্য) - ৥০

প্রাপ্তিস্থান—জুর্গাদাস লাইব্রেরী ।

১০৫ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ।

